আইনের দুনিয়া

বিনোদচন্দ্র সেন এম. এ. বি. এল.
এডভোকেট, অবসরপ্রাপ্ত পাবলিক প্রসিকিউটার, কলিকাতা

মিত্রালয়
১২, বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ১৯৬১

সাড়ে চার টাকা

মিত্রালয়, ১২, বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে জি. ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত ও লিওনার্ড কার্ড-বোর্ড বক্স ফ্যাক্টরী প্রাইভেট লিমিটেড, ১।১, গ্যালিফ স্ট্রীট, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত।

অবতরণিকা

আমার এ বইখানা যদি কোন দিন পাঠকমহলের হাতে আসে তা হলে দেখা যাবে যে বিবৃত ঘটনাগুলির মধ্যে আমার নিজের সম্বন্ধেও কিছু কিছু বলা হয়ে গেছে। বিষয়গুলি ঠিকভাবে বোঝাতে হলে কি ভাবে যে আমি সেই সব ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়লাম, সেটা বলা প্রয়োজন। ঐ ঘটনাগুলো কেন প্রকাশ করছি, তার কৈফিয়ৎ অবশ্য আমি পরে দিচ্ছি। কিন্তু তার আগে আমি কি ভাবে ঐ সব ব্যাপারে জড়িয়ে পড়লাম, সেটা বোঝাতে হলে আমার ব্যবহারিক জীবন সম্বন্ধে দু-চারটে কথা বলা দরকার। কেউ যেন না ভাবেন যে প্রকারান্তরে আমি আমার 'আত্মচরিত' লিখছি। যে শ্রেণীর লোক 'আত্মচরিত' বা 'আত্মকথা' লিখতে পারেন, সে পর্যায়ে উঠবার দুরাশা আমি কোন দিন মনে স্থান দিই নি, এ কথা তাই প্রথমেই জানিয়ে রাখলাম।

ইংরেজী ১৯২০ সালে আমার কর্মজীবন আরম্ভ হয়। সে বছর জানুয়ারী মাসেই শিক্ষানবীশ হিসেবে বিখ্যাত এ্যাটর্নি আফিস "Orr Dignam" কোম্পানীতে প্রবেশ করি। সেই সময় থেকে প্রায় প্রতি দিনই কার্য-সূত্রে হাইকোর্টে ও অন্যান্য কোর্টে যাতায়াত করতে হত। ১৯২৯ সালের ২রা জানুয়ারী তারিখে আমি কলকাতার "Junior Public Prosecutor" নিযুক্ত হই। তখন কলকাতার Public Prosecutor ছিলেন স্বনামধন্য রায় তারকনাথ সাধু বাহাদুর C. I. E. তাঁর সহকারী হিসেবে আমি ফৌজদারী কার্য আরম্ভ করি। ১৯৪৩ সালে আমি নিজেই Public Prosecutor হয়েছিলাম। ১৯২৯ থেকে ১৯৪৩—এই ১৪ বছরের মধ্যে যখনই Public Prosecutor ছুটি নিতেন, তখনই তাঁর কাজ আমাকেই করতে হত। ১৯৫১ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখে আমি সরকারী কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করি। ভেবেছিলাম যে একেবারেই অবসর নিয়ে আইন-আদালতের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দেব। কিন্তু বিধি বাম; 'হাম ত কম্বলীকো ছোড়তা, লেকেন কম্বলী হামকো নেই ছোড়তা'-গোছের এখনও এমন জড়িয়ে আছি

যে আজও বলতে পারি না যে আমি ওকালতির কবল থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পেরেছি।

গত ৪২ বৎসর ধরে আদালতে ঘোরাফেরার ফলে এত প্রকারের মোকদ্দমা দেখেছি, এত রকমের মনুষ্য-চরিত্র ও মনোবৃত্তির পরিচয় পেয়েছি যে, যে কোনও মোটামুটি রকমের সাহিত্যিকের হাতে পড়লে সেগুলো থেকে অপূর্ব রসের সৃষ্টি হতে পারত এবং বাঙলা সাহিত্যের সমৃদ্ধি বেড়ে যেত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত: আমি সাহিত্যিকও নই, সৌন্দর্য-স্রষ্টাও নই—যাকে বলে একেবারে matter of fact,—অর্থাৎ নিতান্তই বাস্তব জগতের। কিন্তু সরকারী কাজ থেকে অবসর গ্রহণের থেকেই কাজের চাপের ফাঁকে ফাঁকে নিজের অবসরের মাত্রা বেড়ে গেছে। এই অবসর নিয়ে কি করা যায় সে বিষয়ে আমাকে অনেকে অনেক রকম পরামর্শ দিয়েছেন। খেলাধুলোর বাতিক নেই, Fine Arts-এ taste-এরও বালাই নাই। সিনেমা, রেডিও বা সংগীত কোন কিছুতেই অনুরাগ নেই, রাজনীতি বুঝি না, বাড়ীর ছাদে টবে ফুলগাছ করাও ধাতে সয় না। তাই—

"তাম্রকূটং মহাদ্রব্যং শ্রদ্ধয়া পীয়তে যদি,
অশ্বমেধসমং পুণ্যং টানে টানে ভবিষ্যতি।"

—এই মহাজন-বাক্য স্মরণ করে একলা বসে সিগারেট হাতে সারা জীবনের ঘটনাবলী 'চর্বিত-চর্বন' করে আনন্দ পেয়েছি এবং অনেক কম খরচে এই পূর্ণ কলিযুগে বহু অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল-লাভের চেষ্টা করেছি। যেসব ঘটনাবলী 'রোমন্থন' করতাম, সেগুলির মোটামুটি কথাগুলি সংক্ষেপে লিখে রাখতাম, এবং বন্ধুবান্ধব-মহলে ও ছেলেমেয়েদের অবসর-সময়ে বা খেতে বসে সে-সব গল্প তাদের কাছে করতাম।

সেই সব কাহিনী কেন আমি বিস্তারিতভাবে লিখে সমাজের সামনে তুলে ধরি না—এ নিয়ে অনেক অনুযোগ আমাকে অন্তরঙ্গ-মহলে শুনতে হয়েছে। কিন্তু আমার অসুবিধা হচ্ছে এই যে আমি বলে যেতে পারি বা লিখে যেতে পারি, কিন্তু সেগুলো নির্ভুল করে ছাপিয়ে শিক্ষিত-সমাজে প্রকাশ করবার সামর্থ্য আমার নেই। আরও অন্তরায় অনেকগুলি, যথা—অনেক সময় আমার নিজের হাতের লেখা আমি নিজেই পরে পড়তে পারি না; পরের লেখার ভুল ধরতে আমি বিশেষ পটু, কিন্তু নিজের দোষ একেবারেই আমার নজরে পড়ে না—ইত্যাদি। সবচেয়ে বড় অন্তরায় হল "proof

correct" করা। শেষের কাজটি আমার কাছে হয় 'সাগর-লঙ্ঘন' নয় 'গন্ধমাদন-উত্তোলন'-এর সামিল। যেটা "মহাবীরের" কাজ বলে মনে করি, সেটা করতে আমি কোনমতেই রাজী নই।

ক্রমে ধীরে ধীরে আমার ছেলেমেয়েরা এবং বন্ধু দু-একজন এগিয়ে এলেন। তাঁদের সাহায্য নিয়ে যেটি সম্পূর্ণ আমার নিজের অবসর বিনোদনের জিনিষ ছিল, সেটিকে লোক-সমাজে পরিবেষণ করবার চেষ্টা করছি। এ কাজে আমার প্রধান সহায় হলেন আমার নিজের ছোট ভাইয়ের মত বন্ধুবর শ্রীকমলকৃষ্ণ নাগ, এম. এ, বি. এল। তিনি নিজে একজন বিচক্ষণ আইনজীবী, সাহিত্যিক ও সুরসিক। তাঁর সহায়তা না পেলে এই দুস্তর সাগর-লঙ্ঘনের চেষ্টা আমি করতাম না।

গত কয়েকমাস ধরে রবিবারের যুগান্তর-সাময়িকীতে 'আইনের দুনিয়া'-শীর্ষক যে রচনাবলী ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলি এই মূল গ্রন্থে বর্ণিত কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা মাত্র।

পাঠকগণের কাছে আমার অনুরোধ যে তাঁরা যেন মনে রাখেন যে আমি সাহিত্যিক নই—কবি ত নইই। হয়ত আমার রচনায় তাঁরা ব্যাকরণের ও বানানের শুদ্ধির মাত্রা থেকে অশুদ্ধির মাত্রাই বেশী পাবেন; 'গুরু-চণ্ডাল' দোষও যথেষ্ট পাবেন এ আশঙ্কা আমার আছে। ঘটনাগুলির বৈচিত্র্য ছাড়া অন্য কোন বৈশিষ্ট্য সদ্গুণ যেন তাঁরা এই রচনায় আশা না করেন। তাঁরা এই গ্রন্থ-বিচারের সময় যা পাবেন, তা কবির ভাষাতেই বলি—

"গণইতে দোষ গুণলেশ ন পাওবি
যব তুঁহু করবি বিচার।"

১৫ই আগষ্ট, ১৯৬১। গ্রন্থকার।

॥ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিদেশীয়দের অবদান ॥

আজ ভারত স্বাধীন হয়েছে। এই স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্যে বহু লোক বহু রকমের কাজ করেছিলেন। সেই সমস্ত কাজকর্মগুলিকে তখনকার সরকার আইনের কবলে কবলিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যেহেতু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে 'চাওয়া' ও 'পাওয়া'র মধ্যে একটা ব্যবধান থেকে যায়, সম্ভবতঃ সেই কারণেই সেই সব কাজের সবগুলিকেই আইনের আওতায় আনা সম্ভবপর হয় নি; কেবলমাত্র কতকগুলিকে তাঁরা আইনের আমলে আনতে পেরেছিলেন। যেগুলি আইনের গণ্ডীর মধ্যে পড়েছিল, কেবলমাত্র সেইগুলিই আমার বর্তমান আলোচনার বিষয়-বস্তু বা কেন্দ্র-স্বরূপ। সেগুলির সম্বন্ধে বলতে গেলেই সে সময়কার কতকগুলি আশপাশের ঘটনা এবং স্বাধীনতা লাভের পূর্বে দেশের আবহাওয়া ও পরিস্থিতি কি রকম ছিল সেই সম্পর্কিত কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ প্রয়োজন। কারণ সেই সংক্রান্ত অনেক বিষয় সম্বন্ধে এখনকার তরুণ-তরুণীদের পরিষ্কার ধারণা নেই।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিরিশ চল্লিশ বছরের ঘটনাবলী যাঁরা চাক্ষুষ দেখেছেন বা দেশের সেই সময়কার অবস্থার সংগে যাঁরা জড়িত ছিলেন, তাঁদের অনেকেই আজ আর ইহলোকে নাই। যাঁরা জীবিত আছেন তাঁদের মধ্যে অনেককেই বলতে শোনা যায়—স্বাধীনতা পেয়ে আমাদের কি লাভটা হল? তার চেয়ে ইংরেজ-আমল ঢের ভাল ছিল। সেদিনের চার টাকা মণ চাল আর দুটাকা জোড়া কাপড়—আজ স্বপ্নেরও অগোচর। বড়ই দুঃখের বিষয় যে এই শ্রেণীর লোক স্বাধীনতা ও পরাধীনতার মধ্যে যে স্বর্গ-নরক প্রভেদ এটা বোঝেন না, বা বোঝবার চেষ্টাও করেন না। নিজের দেশ বা নিজস্ব বলতে কি বোঝায় সে সম্বন্ধে তাঁদের কোন

পরিস্কার ধারণাই নেই মনে হয়। এটা যে কতবড় দুর্ভাগ্য তা বলবার নয়। যাঁরা এ রকম বলেন দুর্ভাগ্যটা তাঁদের, না যাঁরা শোনেন দুর্দৃষ্ট তাঁদের—এ কথা বলা শক্ত। যাই হোক, এ জাতীয় হতভাগ্য লোক এই রকম রায়-বাহাদুরী বা রায়-সাহেবী মনোবৃত্তি নিয়ে রিটায়ার্ড আই. সি. এস্. অফিসার 'কোল্ডহ্যাম্ সাহেব'কে* লিখে জানাবার সুযোগ আর বেশী দিন পাবেন না বলেই মনে হয়।

এই জাতীয় মনোবৃত্তির কারণও ছিল। ইংরেজদের দৌলতে সব বিষয়ে ইংরেজ জাতের প্রাধান্য এবং ভারতীয়দের নিকৃষ্টতা ও হীনতা সম্বন্ধে নিতান্ত ঘৃণিত রকমের অপপ্রচার বরাবর চলে আসছিল। এই সমস্ত শুনতে শুনতে অধিকাংশ ভারতীয়ের ভিতরে হীনমন্যতা (Inferiority Complex) এসে গিয়েছিল। তাঁরা মনে করতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন যে ভারতবাসী মাত্রেই নিকৃষ্ট ও হীন জীব; এবং ইংরেজগণ সর্ব-বিষয়েই শ্রেষ্ঠ। কবিবর যখন ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন—'কেটে যাবে মেঘ, নবীন গরিমা ভাতিবে আবার ললাটে তোর'—অনেকেই তখন অবিশ্বাসের হাসি হেসেছিল। 'নব দিন-মণি উদিবে আবার পুরাতন এ পুরবে'—একথা প্রায় পাগলের প্রলাপ বলেই ধরা হয়েছিল। তখনকার দিনে শিশুদের Central Text Book Committee-র অনুমোদিত পদ্যের বই থেকে নীচের পদ্যটি মুখস্থ করতে হত:

'বীরের দাপটে যেন কাঁপাইয়া মাটি
সাহেব চলিয়া যায় অতি পরিপাটি।'

ঐ রকমের অনুভূতি কিছু লোকের আন্তরিক হয়ে গিয়েছিল ইংরেজের cultural conquest বা সাংস্কৃতিক বিজয়ের ফলে। আবার অনেকের ইংরেজ-প্রীতি ছিল অনেকটা লোক-দেখান। তার কারণ ছিল—হয় সরকারী চাকরি বা অন্য কোন রকম সুযোগ-সুবিধা লাভ করা, নয়ত অপ্রীতিকর ফলাফলের ভয়। অনেকে আবার মহাজন-বাক্য স্মরণ করে আসল কথাটা বুঝতে পেরেও মুখে আনতেন না। এ ত গেল পরিণতবুদ্ধি প্রাপ্তবয়স্ক লোকেদের কথা। অধিকাংশ ছাত্রদের মনের মধ্যে কিন্তু পরাধীনতার জন্যে একটা জ্বালা ছিল। আমাদের পাঠ্যাবস্থায় একটি ছোট

* পরশুরাম বিরচিত 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড্' দ্রষ্টব্য।

দল ছিল, সেখানে অনেক বিষয়েরই আলোচনা হত। আমাদের সেই দল একটি নূতন 'চাণক্য শ্লোক' রচনা করেছিল। তার প্রথম শ্লোকটি ছিল :

সাহেবশ্চ বাঙ্গালীচ নৈব তুল্যং কদাচন।
সাহেবঃ দদাতি থাপ্পড়ং বাঙ্গালী হর্ষেণ খাদতি।

ঐ শ্লোক রচনায় আর কিছু প্রকাশ পাক আর নাই পাক ওতে তখনকার সাধারণ বাঙ্গালী বিদ্যার্থীর মনোভাব নিশ্চয়ই প্রকট হয়ে উঠেছিল।

আবার আর এক শ্রেণীর লোক ছিলেন—যাঁরা নির্ভীক। তাঁরা সুফলের আশা না রেখে এবং কুফলের ভয় না করে সত্যি কথা বলতে বা তা প্রকাশ করতে পারতেন। তাঁদের নেতাদের মধ্যে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ, বালগঙ্গাধর তিলক, বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতির নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। এঁদের চেষ্টায় ১৯০৮ সালে একজন ইংরেজ এম. পি. অর্থাৎ বৃটিশ পার্লামেন্টের সদস্য এদেশে এসে ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তাঁর নাম Mr. Keir Hardie. বক্তৃতা-প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন—'স্বাধীনতা সংগ্রাম তোমরা চালিয়ে যাও—স্বাধীনতা তোমরা পাবেই পাবে।' তাঁর উক্তি যে চল্লিশ বছর পরের ঘটনার সঙ্গে হুবহু মিলে গেল, এটাকে একেবারে কাকতালীয়বৎ বলে মেনে নিতে আমি রাজী নই। বৃটিশ পার্লামেন্টে তিনি আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে এমন একটি উক্তি করেছিলেন যেটা বিয়াল্লিশ বৎসর পর সঠিক মিলে গিয়েছিল। সেই ঘটনাটিই এবার আমি বলব।

এখনকার যিনি Duke of Windsor, ১৯৩৫ সালে কয়েক মাসের জন্যে তিনি ইংলণ্ডের রাজা এবং ভারতের সম্রাট হয়েছিলেন। Mrs. Simpson-এর সঙ্গে তাঁর বিবাহ এবং ইংলণ্ডের সিংহাসন ত্যাগের ঘটনাবলী হয়ত অনেকেরই মনে আছে। তাঁর জন্ম হয় ইংরেজী ১৮৯৪ সালের ২৩শে জুন তারিখে। সে সময় ইংলণ্ডে পার্লামেন্টের অধিবেশন চলছিল। নবজাত রাজকুমারের জন্ম-সংবাদ যখন পার্লামেন্টে জানানো হল, তখন অনেকে অনেক রকম বক্তৃতা করে রাজ-শিশুকে স্বাগত জানান বা তার মঙ্গল কামনা করেন। সে সময় Keir Hardie সাহেব House of Commons-এ যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, সে সম্বন্ধে বর্তমান Duke of Windsor তাঁর 'A King's Story' নামক বইখানায় নিজেই বলেছেন এই ভাষায় :

'However, in the midst of the polite rejoiceings over my birth, at least one grumpy voice made itself heard.'

অন্যান্য কথার মধ্যে Keir Hardie সাহেব বলেছিলেন—

...The assumption is that the newly born child will be called upon, some day, to reign over this great Empire. But, up to the present, we certainly have no means of knowing his qualifications or fitness for the position. From his childhood this boy will be surrounded by sycophants and flatterers by the score, and will be taught to believe himself as of a superior creation. A line will be drawn between him and the people he might be called upon to rule over. In due course, following the precedent which has already been set, he will be sent 'on a tour' round the world and probably rumours of a 'morganatic marriage' will follow, and the end of it will be that the country will be called upon to pay the bill...

অর্থাৎ...শৈশবাবধি অসংখ্য চাটুকার এই কুমারকে ঘিরে থাকবে, যাতে করে তার বিশ্বাস জন্মে যাবে যে সাধারণ মানুষের চেয়ে সে অনেক উচ্চস্তরের জীব। ...নিয়মিত প্রথা অনুসারে সে যখন পৃথিবী পর্যটনে বেরুবে, তখন হয়ত এক 'অকুলীন বিবাহের' গুজব রটবে এবং আমাদের দেশকেই তার খরচ বহন করতে হবে।...

এ জাতের ভবিষ্যৎবাণী একমাত্র, ইংরেজীতে যাকে বলে Seer অর্থাৎ 'কবি', সেইরূপ ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টার পক্ষেই সম্ভব। এঁরা পদ্য-রচনাকারী কবি নন; উপনিষদকার যাঁদের সম্বন্ধে বলেছেন—'দুর্গম্ পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি'—এঁরা সেই 'কবি'। তাঁদের সম্বন্ধেই স্থানান্তরে বলা হয়েছে—

"ভূতং ভবৎ ভবিষ্যৎ ব্যবহিত বিপ্রকৃষ্টাদিকং সর্ব্বং যঃ পশ্যতি সঃ কবিঃ।"

—অর্থাৎ যিনি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অন্তরালস্থিত ও দূরবর্তী সব কিছুই দেখতে পান, তিনিই 'কবি'।

এই Keir Hardie সাহেবকে তখনকার ইংলণ্ডের লোক খুব ভাল

চোখে দেখত না। এমন কি, অনেকে তাঁকে 'Coolie M. P.' বলে ডাকত। 'The Labour Leader' নামে লণ্ডনে প্রকাশিত একখানা কাগজের সংগে তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ইংরেজী ১৯০৯ সালের মে মাসে তিনি ভারতবর্ষ থেকে ফিরে গিয়ে এই কাগজখানাতে লিখেছিলেন—

'It cannot be alleged that the Indian people are unfit for self government. The many Native States which are ruling themselves is a proof to the contrary which cannot be gainsaid. A great educated class exists in India which manages Universities and higher grade Schools, supplies the country with lawyers, professors, newspaper-editors, and the heads of great business concerns. Wherever these men have an opportunity they prove that, whether as administrators or as legislators, they have capacity of a very high order.'

শিক্ষিত ভারতীয়দের বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুধু তিনি একাই করেন নি, পরবর্তীকালেও নিরপেক্ষ ও মাথা-ঠাণ্ডা ইংরেজ সুধীজন অনেকবার সেরকম মনোভাব ভাষায় প্রকাশ করেছেন। যখন বহু ভারতীয় অর্থ অপব্যয় করে তখনকার ইংরেজ সরকার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যকলাপ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করবার জন্যে এবং তার উন্নতির উপায় বাৎলাবার জন্যে বিশিষ্ট ইংরেজ শিক্ষাবিদ্ Sir Michael Saddler সাহেবকে এদেশে আনেন, তখন ফিরে যাবার সময় Saddler সাহেবই ঐ অন্যায় অর্থব্যয়ের সম্বন্ধে নির্ভীকভাবে বলেছিলেন :

'It has been a criminal waste of public money to import an educationist from abroad in a country where a Sir Ashutosh exists.'

কিন্তু চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী। মুষ্টিমেয় চিন্তাশীল ইংরেজের মতামত ওভাবের হলেও ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে ইংরেজ কর্তাদের মনোভাব বা মনোবৃত্তি Sir Winston Churchill-এর দাম্ভিক উক্তি হতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় :

'I am not here to preside over the liquidation of the British Empire.' —এই উক্তি মনে হয় অনেকেরই স্মরণ আছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯১৯ সালে যে 'ভারত-শাসন আইন' (Government of India Act, 1919) পাশ হয়েছিল, সেই আইনের প্রারম্ভে এক গুরুত্বপূর্ণ মুখবন্ধ সংযুক্ত ছিল। তার সারমর্ম এই ছিল যে বৃটিশ সাম্রাজ্যে যতগুলি Dominion আছে ভারতবর্ষও একদিন তার মধ্যে স্থান পাবে। ১৯১৯ সালের আইন পাশ হবার পর যে রাজকীয় Instrument of Instructions এদেশে পাঠান হয়েছিল, তার নবম দফায় এই কথা কয়টি স্পষ্টই লেখা ছিল :

'...That British India may attain its due place among Our Dominions. Therefore, We do charge Our Governor General by the means aforesaid and by all other means which may, to him, seem fit to guide the course of Our subjects in India···towards such realisation···may ever advance to the benefit of all Our subjects in India···'

১৯৩৫ সালে যে নূতন 'ভারত-শাসন আইন' পাশ হল, তাতে ১৯১৯ সালের আইনটি বাতিল করা সত্ত্বেও ওই মুখবন্ধটি বলবৎ রাখা হল। বর্ষীয়ান পাঠকগণের স্মরণ থাকতে পারে যে এই আইন সংক্রান্ত বিষয় আলোচনার জন্যে এই সময় ইংলণ্ডে একাধিকবার 'গোল-টেবিল বৈঠক' ডাকা হয়েছিল। তার একটিতে স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী উপস্থিত হয়েছিলেন। সেই সময় মহাত্মাজীর প্রায়-ফকির বেশে সম্রাট পঞ্চম জর্জের সঙ্গে করমর্দন যে ইংরেজ-জাতের কতবড় চক্ষুশূল হয়েছিল, সেটার কতকটা আন্দাজ পাওয়া যায় সময়ান্তরে ঐ Churchill সাহেবেরই গান্ধীজীকে 'Seditious half-naked Faquir'-রূপ বিশেষণে বিভূষিত করা থেকে। গোল-টেবিল বৈঠকের আগে এই আইনের খসড়াটি যথা-নিয়মে বৃটিশ-পার্লামেণ্টে উপস্থাপিত করা হয়। সেই সময় ভারত-সচিব স্যার স্যামুয়েল হোর বলেন—'১৯১৯ সালের মুখবন্ধটি আগের মতই বলবৎ থাকবে এবং ভারত-শাসন আইনের এই খসড়াটি এমনভাবে তৈরী হয়েছে যে সেই মুখবন্ধের প্রতিশ্রুত ফল-লাভের দিকে আমরা যে শুধু এগিয়েই চলেছি তা নয়, বাস্তবিক পক্ষে আমাদের লক্ষ্যের দিকে অনেকদূর অগ্রসর হয়েছি।' তাঁর মাতৃভাষায় তাঁর নিজের মুখের কথাগুলি ছিল এই :

'Rightly understood the Preamble of 1919, which I repeat

will stand unrepealed, is a clear statement of the purposes of the British people and this Bill is a definite step, indeed a great stride forward towards the achievement of that purpose.'

হোর সাহেব সেই সময় এই রকম একটা আশার বাণী প্রচার করে অনেকের মনটা খুশী করে দিয়েছিলেন। কিন্তু পরে দেখা গেল যে তিনি আদৌ নিজের মনের ভিতরের আসল কথাটা খুলে বলেন নি। এই খসড়া বিবেচনার জন্যে যে Joint Select Committee গঠিত হয়েছিল সেখানে প্রতি দফা নিয়ে সুক্ষ্মভাবে বিচারকালে তিনি বলতে বাধ্য হয়েছিলেন যে Dominion Status ভারতবর্ষের পক্ষে একটা সুদূরপরাহত স্বপ্ন (distant dream)। তিনি আরও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, 'proposed Constitution was neither the first nor the second, nor the third step towards it'। তাহলে বিচার করে দেখুন, হোর সাহেব গোড়ায় যে বলেছিলেন—definite step, indeed a great stride'—তাঁর সেকথা কি শুধুমাত্র কথার কথা ছিল, না সে উক্তির কিছুমাত্র দাম ছিল বা তার মধ্যে বিন্দুমাত্র আন্তরিকতা ছিল!

ইংরেজীতে Language বা ভাষা শব্দের অর্থ করা হয়েছে 'Vehicle for conveying one's thoughts'—অর্থাৎ মনের ভাব প্রকাশ করার বাহন। কিন্তু ঐ অর্থ অন্য ভাষা সম্বন্ধে প্রযোজ্য হলেও ইংরেজী ভাষা সম্বন্ধে ওর প্রয়োগ প্রায় অচল। মনে হয় ইংরেজী 'Language'-কথাটার মানে হওয়া উচিত—যে বাহনের দ্বারা মানুষের মনের ভাব গোপন করা হয়—অর্থাৎ 'Vehicle for concealing one's thoughts'। ইংরেজীতে দুটি শব্দ আছে, একটি হচ্ছে—'Equivocation', অপরটি হচ্ছে—'Mental Reservation'. ইংরেজ জাতের diplomatic ভাষায় এই দুটিরই প্রাচুর্য দেখতে পাওয়া যায়।

আমরা আদালতে দেখেছি যে ইংরেজ সাক্ষীরা যখন সত্য কথা গোপন করতে চায় তখন বলে—'This is not in accord with my recollection'. সোজাসুজি 'হ্যাঁ' কি 'না' তারা বলতে পারে না বা চায় না।

* *

এইবার দেখা যাক্ কোন কোন ক্রিয়া-কলাপকে আইনের কবলে ফেলা হয়েছিল। প্রথম ছিল—কতকগুলি বিদ্রোহাত্মক কাজ। দ্বিতীয় ছিল—ভারতের দাবী বা অধিকার প্রচার।

(ক) বিদ্রোহাত্মক কাজগুলির মধ্যে অনেক রকমের ভাগ ছিল। যেমন:
(i) ইংরেজ বা সরকারী কর্মচারী খুন করা।
(ii) রাজনৈতিক কারণে ডাকাতি বা লুঠ করা।
(iii) নিষিদ্ধ অস্ত্র-শস্ত্র বা আগ্নেয়াস্ত্র কেনা-বেচা ও গোপনে রাখা।
(iv) বৃটিশ-রাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা বা ইংরেজকে উৎখাত করার চেষ্টা করা।

শেষোক্ত কাজের জন্যে রুজু করা হয়েছিল কতকগুলি ষড়যন্ত্রের মামলা। ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনে এই মামলাগুলির নাম ছিল—সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার জন্যে (waging war) মামলা।

ক্ষুদিরাম বসু, কানাই দত্ত প্রভৃতির ফাঁসীর কথা অনেকেই জানেন। তা ছাড়া নীচের তিনটি ষড়যন্ত্রের মামলা বিখ্যাত :
(১) বারীন ঘোষের মামলা—যে মামলাকে সাধারণতঃ 'আলিপুর বোমার মামলা' বা 'মাণিকতলা বোমার মামলা' বলা হয়।
(২) অমৃতলাল হাজরার মামলা—যাকে 'রাজাবাজার বোমার মামলা' বলে।
(৩) পুলিনচন্দ্র দাসের মামলা—বা 'অনুশীলন সমিতির মামলা'।

এ ছাড়াও 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মামলা' এই শ্রেণীর মামলাগুলির মধ্যে সব চেয়ে গুরুত্ব-পূর্ণ বলা যেতে পারে।

(খ) ভারতের দাবী বা অধিকার প্রচারের কাজ করা হত দুরকমে :—
(i) লিখিতভাবে প্রচার করা—অর্থাৎ ছাপান বই, খবরের কাগজ ও নানা রকম সাময়িক পত্রিকা ইত্যাদির মাধ্যমে।
(ii) মুখে প্রচার করা—যথা, বক্তৃতা প্রভৃতির দ্বারা।

আদালতে বিচার-সূত্রে এমন অনেক গুরুত্বপূর্ণ মামলা হয় যেগুলিতে হাইকোর্ট বা তার চেয়েও উচ্চতর আদালত সেই সেই মামলা-সংশ্লিষ্ট আইনের চূড়ান্ত ব্যাখ্যা দিয়ে দেন। সেই সব মামলার বিচারের রায় প্রামাণ্য 'Law Reports'-এ ছাপা হয়। তখন সেগুলিকে 'Leading cases' বা 'নজির' বলে। 'কেশরী' কাগজে বালগঙ্গাধর তিলক যে রাজদ্রোহ প্রচার করেছিলেন তার জন্যে তাঁর মামলাটির বিবরণ ও রায় রাজদ্রোহ সম্বন্ধে একটি Leading Case হয়ে রয়েছে। তার পরে অবশ্য রাজদ্রোহ-প্রচার সম্বন্ধে অনেক মামলাই হয়েছে, কিন্তু পরের সব মামলাতেই বালগঙ্গাধর তিলকের মামলাকে 'নজির' বলে ধরা হয়েছে।

এই প্রচারকার্য স্বাধীনতা সংগ্রামের গোড়া থেকেই চলে আসছিল। Lord Curzon-এর বঙ্গভঙ্গের অনেক আগেই 'কেশরী' কাগজের সম্পাদক বালগঙ্গাধর তিলকের বিরুদ্ধে ওই মামলাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তখনকার দিনে প্রচারকার্যের বিরুদ্ধে একমাত্র আইন ছিল ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১২৪ (ক) ধারা—যে ধারার বলে 'Sedition' বা রাজদ্রোহ দণ্ডনীয় ছিল। বঙ্গভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই নানা-প্রকারের প্রচারকার্য আরম্ভ হয়ে গেল। তখনকার সরকার প্রায় পাগল হয়ে ইংরেজী ১৯১০ সালে Press Act (Act I of 1910) জারী করলেন। তার আগে পর্যন্ত কোন প্রকাশিত কাগজে রাজদ্রোহ-মূলক লেখা বেরুলে তার বিরুদ্ধে ঐ ১২৪ (ক) ধারায় মামলা করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না, কারণ আর কোন আইন বলবৎ ছিল না। ১৯১০ সালের Press Act আইনের বলে রাজদ্রোহিতামূলক কোন 'tendency' বা ঝোঁক অথবা ইঙ্গিত থাকলেই আমানত দাবীর অধিকার ও আমানত বাজেয়াপ্ত করার অধিকার সরকারের হাতে এল। এই আইনটি ১৯২২ সালে রদ করা হয়, এবং তার পরিবর্তে রাজদ্রোহ-দোষে দুষ্ট কাগজগুলিকে বাজেয়াপ্ত করবার অধিকার দিয়ে ফৌজদারী কার্যবিধি আইনের ৯৯ (ক) ধারা প্রবর্তিত হল। পরে যখন ১৯৩১ সালে 'Press Powers Ordinance' এবং তার পরিবর্তে 'Press Emergency Powers Act'-এর সৃষ্টি হল, তখনও কিন্তু ঐ ৯৯ (ক) ধারাকে রদ করা হল না—অর্থাৎ সেটি আজও বলবৎ আছে। ১৯১০ সালের Press-আইন চালু হবার পর থেকেই খবরের কাগজে রাজনৈতিক বিষয়ে সত্যি কথা বলা বড়ই মুশকিল হয়ে পড়ল। কারণ প্রথম রাজদ্রোহাত্মক ইঙ্গিতেই ছোট ছোট ছাপাখানার উপর ২০০০৲ থেকে ৩০০০৲ করে আমানত জমা দেবার হুকুম জারী করা হল এবং দ্বিতীয়বার সেই রকমের কোনও মন্তব্য প্রকাশিত হলে ঐ জমা দেওয়া আমানত বাজেয়াপ্ত হতে থাকল। সঙ্গে সঙ্গে কাগজগুলি ও ছাপাখানা বাজেয়াপ্ত হতে লাগল। বঙ্গভঙ্গের ফলে নানা-রকমের প্রচার করে অনেক রকমের খবরের কাগজ বেরিয়েছিল। রাজদ্রোহের মামলা রুজু হবে এই অজুহাতে জোর খানাতল্লাসীও ঐ সঙ্গে আরম্ভ হল। তার ফলে কাগজওয়ালারা ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ল। খুব বড় কাগজওয়ালা বা বেশ বড় রকমের ছাপাখানাওয়ালা না হলে তার পক্ষে টিঁকে থাকাই প্রায়

অসম্ভব হয়ে উঠল। এ দিকে রাজনৈতিক প্রচার না থাকলে ছোট-খাট কাগজের ক্রেতা বা গ্রাহক জোটান শক্ত। তাই অনেক কাগজ প্রথম বের হবার অল্প দিনের মধ্যেই বন্ধ হয়ে যেতে লাগল। প্রেস্-আইনের ভয়ে রাজনৈতিক মন্তব্য নিয়ে নতুন করে আর কোন কাগজ বেরোতে ভরসা পেল না। দু-একখানা নিছক ধর্মমূলক কাগজ মাত্র বের হতে সাহস করেছিল।

১৯১১-১২ সালে এই 'প্রেস্ আইন'কে ব্যঙ্গ করে একটি গান রচিত হয়েছিল। আমার যত দূর মনে পড়ে, কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ই এই গানের রচয়িতা। কিন্তু তাঁর 'হাসির গান'-এর ভিতর বা অন্য কোথাও আমি এ গানটি ছাপার অক্ষরে দেখতে পাই নি। তার কয়েকটি কলি যা আমার আজও মনে আছে—নীচে আপনাদের উপহার দিচ্ছি :

'বাহির কচ্ছি খবর কাগজ
এবার নূতন রকম, দাদা—
একটি পাতায় হবে লেখা,
একটি পাতা থাকবে সাদা।'

পরের কয়েকটি কলিতে সেই 'নূতন রকমের কাগজে' কি কি বিষয় সম্বন্ধে লেখা থাকবে তার বিস্তারিত বর্ণনা ছিল। কিন্তু তার কোনটার মধ্যেই রাজনীতির নামগন্ধও ছিল না। তার পরের একটি কলিতে এই কাগজের নিজস্ব সংবাদদাতা কে কে থাকবেন তাঁদের নাম-ধাম দেওয়া হয়েছিল—যথা :

'সেই কাগজে লিখবে কে কে ?
রুরু কামস্কাট্কা থেকে।
সিংহল থেকে মন্দোদরী,
আর বৃন্দাবন থেকে রাধা।'

তার পরের একটি কলিতে সেই কাগজের ব্যবহার বা উপকারিতা সম্বন্ধে বলা হয়েছিল :—

'নাড়লে হবে গ্রীষ্মের হাওয়া,
পাতলে হবে লুচি খাওয়া,
মাথায় দিলে হবে টুপি—
আর মুড়লে হবে জুতো বাঁধা।'

একটি পাতা 'সাদা' থাকবে—অর্থাৎ রাজনীতির কথা লেখা চলবে

না বলেই সাদা থাকবে ; কাগজের আসল উদ্দেশ্য যা সে বিষয় বাদ দেওয়া হবে বা দিতে হবে। নিজস্ব সংবাদদাতা বা লেখক কোন নির্ভীক রাজনীতিবিদ্‌ হবেন না—হবেন স্ত্রীজাতীয়েরা। সেই কাগজ কোন 'মনের খোরাক' বা 'চিন্তার খোরাক' জোগাতে পারবে না—কেবলমাত্র নীচু-স্তরের সাংসারিক ব্যবহারেই লাগতে পারবে। ব্যঙ্গের মাধ্যমে পরাধীন জাতির দীর্ঘশ্বাস ত্যাগের কি সুন্দর নমুনা।

আমার সুর-জ্ঞান নেই, ছয় রাগ আর ছত্রিশ রাগিনীর নামের সঙ্গেও আমি পরিচিত নই। তবে ঐ গানটি যখন গাওয়া হত তখন সমঝদারদের মুখে 'খাম্বাজ' এই নামটি শোনা যেত। এটা ভুল কি ঠিক সেটা সংগীত রসে রসিক পাঠক-পাঠিকার বিচারের বিষয়—আমার নয়।

এ জাতীয় প্রচার-কার্যে Keir Hardie সাহেবের কথা ত আগেই বলেছি। একজন আমেরিকান লেখক জে. টি. সাণ্ডারল্যাণ্ড 'INDIA IN BONDAGE—HER RIGHT TO FREEDOM' নামে একখানা বই লিখে আমেরিকায় সেটিকে প্রচার করেন। কোনও রকমে একখানা ছাপা বই বা তার একটা হাতে-লেখা নকল কলকাতায় আসে। প্রবাসী আফিস থেকে সেখানা ছাপিয়ে বের করা হয়। বইটিতে 'R. Chatterjee, 91, Upper Circular Road, Calcutta'—এই কথাকয়টি এমন ভাবে লেখা ছিল যে বইখানা যে R. Chatterjee-র দ্বারা সম্পাদিত সে বিষয়ে কোন সন্দেহই ছিল না। এই 'R. Chatterjee' বলতে 'প্রবাসী' ও 'Modern Review'-এর বিখ্যাত মনীষী রামানন্দবাবুকেই বোঝায়। বইখানার প্রকাশক ছিলেন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক শ্রীসজনীকান্ত দাস। কি ভাবে যে ওটা তাঁদের হাতে এল সেটা তাঁরাই বলতে পারেন—আর কেউ জানে না। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের অক্ষমতা ও আমার অজ্ঞতা দেখে সজনীকান্তবাবু বোধ হয় হাসবেন। ১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসে বইখানার প্রথম সংস্করণ বের হয়। পরের ছমাসের মধ্যেই—অর্থাৎ ১৯২৯ সালের মে মাসের মধ্যেই তার দ্বিতীয় সংস্করণ বের করতে হয়। এই বইখানা প্রকাশ করার জন্যে তখনকার সরকারের তরফ থেকে কলকাতার Chief Presidency Magistrate-এর কোর্টে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১২৪ (ক) ধারায়—অর্থাৎ Sedition বা রাজদ্রোহের অপরাধে—একদফা মামলা রুজু করা হয়। সেই মোকদ্দমার রায় বের হল ১৯২৯ সালের ১২ই আগষ্ট তারিখে।

রামানন্দবাবু ও সজনীকান্তবাবু দুজনেরই ১০০০৲ টাকা করে জরিমানা হল। ঠিক তার পরের দিন—অর্থাৎ ১৩ই আগস্ট ১৯২৯ সাল—বাংলা সরকার একখানা Extra-Ordinary Calcutta Gazette বের করে এই বইখানা সরকারে বাজেয়াপ্ত করা হোল বলে ঘোষণা করলেন। প্রকাশক হিসেবে সজনীকান্তবাবু এই বাজেয়াপ্ত করার বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা রুজু করলেন। হাইকোর্টে অবশ্য সিদ্ধান্ত করা হল যে এই বইখানা অত্যন্ত রাজদ্রোহাত্মক।

বইখানা প্রকাণ্ড ও অনেকগুলি পরিচ্ছেদে বিভক্ত ছিল। বইটিতে ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের সব কুফলগুলির বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া ছিল। তাতে বলা হয়েছিল যে ইংরেজের ভারত দখল করে রাখার কোনও অধিকার নেই এবং ভারতে যে সৈন্যবাহিনী আছে সেটা ভারতের নিজের রক্ষার জন্যে নয়, ভারতে ইংরেজ অধিকার কায়েম করে রাখবার জন্যে প্রয়োজন বলেই তা রাখা হয়েছে। অতএব সেই সৈন্যবাহিনী সংক্রান্ত বিরাট খরচা ভারতের রাজস্ব থেকে নেবার কোনও অধিকার ইংরেজের নেই। ...ইত্যাদি। ঐ মামলার সময় সমস্ত বইখানি আমায় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তে হয়েছিল। তাতে এমন অনেক কথা লেখা ছিল যা প্রত্যেক ভারতবাসীরই জানা উচিত।

যখন ঐ 'INDIA IN BONDAGE—HER RIGHT TO FREEDOM' বইখানা ছাপা হয়ে বের হচ্ছে, সেই সময় আর একটি বড় অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল। এ ব্যাপারটি কলকাতা পুলিশ কোর্টেই নিষ্পত্তি হয়ে যায়—কোনও আপিল ইত্যাদি হয় নি। প্রকাশ্য আদালতে মামলা হলেও পুলিশের অনুরোধে খবরের কাগজের রিপোর্টাররা মামলার সময় কোর্টে অনুপস্থিত ছিলেন এবং মামলার খবরটি গোপন রেখেছিলেন। ব্যাপারটি ছিল এইরকম :

একটি শ্বেতাঙ্গ বিদেশী যুবক কলকাতায় এসে এক প্রৌঢ়া অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান নার্সের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠতা করে। নার্সটি অবিবাহিতা ছিল। নার্সটির সঙ্গে বোধ হয় ঐ যুবকটির বিবাহও ঠিক হয়েছিল। তা সত্ত্বেও যুবকটি ঐ নার্সটির এক বিবাহিতা বোনের সঙ্গেও যেন খুব বেশী ঘনিষ্ঠতা করে ফেলল। এতে নার্সটি আপত্তি করায় যুবকটি তাকে বোঝাল যে তার মনে কোনও পাপই নেই, এবং যদি তার প্রণয়িনী তার কথায় বিশ্বাস করতে না পারে তবে তারা দুজনে কলকাতা ছেড়ে

বহুদূরে গিয়ে বাড়ীভাড়া করে থাকতে পারে—খরচপত্র অবশ্য সেই দেবে। নার্সটি এ প্রস্তাবে রাজী হল এবং সেইমত তারা ভারতের উত্তর-পশ্চিমে হিমালয়ের ওপর যে সেনানিবাসগুলি (Cantonment) আছে তার একটিতে গিয়ে বাসা বাঁধল। যুবকটি ক্রমশঃ সেই সেনা-নিবাসের বৃটিশ সৈন্যদের সংগে আলাপ জমিয়ে নিল এবং তাদের নিজের বাসায় এনে খুব হৈ-হুল্লোড় আরম্ভ করে দিল। স্থানীয় বৃটিশ কর্তৃপক্ষ সেনানিবাসের সৈন্যদের একজন অসামরিক লোকের সংগে এতটা মেলামেশায় আপত্তি করাতে সেই ছোকরাটি ও নার্সটি সেখানকার পাততাড়ি গোটাতে বাধ্য হল। তারপর তারা কলকাতায় না এসে পর পর আরও দু-তিনটি সেনানিবাসে কয়েকদিন করে কাটাল। কিন্তু সব সেনানিবাস থেকেই বিতাড়িত হয়ে মাস দুইয়ের ভিতর আবার কলকাতায় ফিরে এসে বাসা বাঁধল। খবর পাওয়া গেল যে ছোকরাটির কাজই হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় নিম্নপদস্থ বৃটিশ সৈন্যদের নিজের বাসায় এনে তাদের মধ্যে বিদ্রোহ প্রচার করা। কিন্তু এত সাবধানে ছেলেটি তার কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল যে সে বিষয়ে কোন প্রমাণই সংগ্রহ করা গেল না। ব্যাংকে কিছু টাকা ও একখানি বিদেশী ছাড়পত্র (Passport) ছাড়া ছেলেটির সম্বন্ধে আর কোন খবরই পাওয়া গেল না। অনেকেই জানেন যে Criminal Procedure Code বা ফৌজদারী কার্যবিধি আইনে কতকগুলি বিধান আছে যার বলে দণ্ডনীয় অপরাধের জন্যে অভিযুক্ত না করেও মানুষের কাছ থেকে ভাল হয়ে থাকার জন্যে মুচলেকা (Bond) নেওয়া যেতে পারে। যে সব লোকের প্রকাশ্যে কোন রোজগারের পথ না থাকে বা যারা নিজেদের কাজকর্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ না দিতে পারে, তাদের বিরুদ্ধে ঐ কার্যবিধি আইনের ১০৯ ধারায় মামলা রুজু করা চলতে পারে। এই বিদেশী যুবকটির বিরুদ্ধেও ১০৯ ধারায় মামলা রুজু করে তার কাছ থেকে ভাল হয়ে থাকার জন্যে জামীন চাওয়া হল।

যেদিন মামলার শুনানী হবে তার আগে থেকেই আমি কাগজপত্র দেখে প্রস্তুত ছিলাম। মামলা চালাবেন স্বর্গীয় রায় বাহাদুর তারকনাথ সাধু মহাশয় নিজে, আমি থাকব তাঁর সহকারী সরকারী উকিল হিসেবে। কলকাতা পুলিশের Detective Department-এর Deputy Commissioner —Mr. Bird নিজে আমাদের এই মামলায় উপদেশ (instructions) দেবেন।

অতএব সরকারের তরফ থেকে এ মামলার গুরুত্ব সহজেই অনুমান করা যেতে পারে।

এখানে ঐ যুবকটির প্রণয়িনী Anglo-Indian নার্সটির সম্বন্ধে দু-একটা কথা বলা বোধ হয় অবান্তর হবে না। শ্রীমতী মামলার শুনানীর দিন সাক্ষী হিসেবে কোর্টে হাজির হয়েছিলেন—আমাদের Public Prosecutor-এর আফিস হয়ে। আমাদের আফিসে মামলার পূর্বাহ্নে তাঁর উপস্থিতি আমাদের মনে যে ভাবের উদ্রেক করেছিল তাই বলছি। তখন সেই আফিসটি কি রকম ছিল তাও এই সংগে বলা দরকার। আমাদের আফিসে Public Prosecutor এবং Junior Public Prosecutor-এর বসবার ভিন্ন ভিন্ন খাস্-কামরা ছিল। তাছাড়া একটি ছোট ঘরে ও একটি বিরাট হল-ঘরে আমাদের আফিস ছিল। সেই হল-ঘরে আমাদের কয়েকজন কেরাণী বসতেন। তাঁদের বসবার টেবিল-চেয়ার ছাড়াও ঐ হল-ঘরে আরও কয়েকটি টেবিল ও চেয়ার ছিল—যেখানে সময় বিশেষে পুলিশের লোক এবং মোকদ্দমার সাক্ষীরা এসে অপেক্ষা করত। আমার ঘরে যেতে হলে সেই হল-ঘরের ভিতর দিয়েই যেতে হত। রোজ সকালে যখন আমার আফিস-ঘরে ঢুকতাম তখন অনেককেই সেই হল-ঘরে বসে অপেক্ষা করতে দেখতে পেতাম। এ মামলার দিনও অনেকেই অপেক্ষা করছিলেন। হল-ঘরে ঢুকতেই সর্বপ্রথমে আমার নজরে পড়ল প্রগতি-যুগের পোষাক-পরা একটি তরুণী—প্রথম দৃষ্টিতে অপরূপ সুন্দরী। সেদিনের মামলায় কে কে সাক্ষী আসবে তা আমার আগেথেকেই জানা ছিল; কিন্তু তার মধ্যে ত কোন তরুণীর নাম মনে পড়ল না। স্ত্রীলোক সাক্ষী সেদিন একজনই আসবার কথা—কিন্তু সে ত এক প্রৌঢ়া নার্স। ইনি তবে কে? আর একটু কাছে যেতেই বুঝতে পারলাম—ইনি তরুণী ত ননই, যুবতীও নন—প্রৌঢ়া! নব্যভাবের মেক্‌আপ-এর চোটে নিজেকে প্রায়-তরুণী সাজিয়ে ফেলেছেন। তখনই আমার কালিদাসকে অনুকরণ করে বলতে ইচ্ছে হল—এবং পরে তারকবাবুকেও বলেছিলাম—

ইয়মধিকমনোজ্ঞা নব্যবাসসাপি প্রৌঢ়া
কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতিনাম্।

যাই হোক, মামলা সুরু হল। নার্সটি তাঁর বিবরণ দিলেন। তারক

বাবু বুড়ো মানুষ—মেয়েটিকে সোজা জিজ্ঞাসা করে বসলেন—আপনি ত এ ছেলেটির প্রায় মায়ের বয়েসী—এর সংগে প্রেমে পড়লেন কি করে? তার জবাবে মেয়েটি বলেছিল—**I really fell in love, not with the man but with his brain. You don't know what a wonderful brain he has.** হাকিম ছিলেন **Mr. T. J. Y. Roxburgh**—যিনি পরে হাইকোর্টের জজ হয়েছিলেন। নার্সটির জবাব শুনে তিনি হাসতে হাসতে তারকবাবুকে বললেন—**Rai Bahadur, don't pursue the matter.** যাক্ বিচারে কি হল তাই বলি। সরকার-পক্ষ থেকে যে প্রমাণ দাখিল করা হয়েছিল ঐ মামলায়, হাকিম সেগুলিকে যথেষ্ট মনে না করে ছেলেটিকে খালাস দিয়েছিলেন।

আমি অনেক সময় ভাবি—এই ছোকরাটি যে এত জায়গায় ঘুরল, এতদিন এ সব কাজ চালাল, এত খরচের টাকা সে কোথা থেকে পেল। মামলায় খালাস হওয়ার পরই সে তার ব্যাংক থেকে টাকাকড়ি তুলে নিয়ে কোথায় যে চলে গেল তা কেউ জানে না। অবশ্য তখনকার দিনে Foreign Exchange Regulations-এর কোন বালাই ছিল না। বিদেশের টাকা স্বচ্ছন্দে ভারতে নিয়ে আসা যেত এবং এ দেশের টাকাও অনায়াসে এ দেশের বাইরে নিয়ে যাওয়া যেত।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অন্য কোন দেশ 'INDIA IN BONDAGE—HER RIGHT TO FREEDOM'-এর মত এমন যুক্তিপূর্ণ প্রচারকার্য করেছিল কিনা জানি না—অন্ততঃ সেরকম কোন প্রমাণ আমার হাতে আসে নি।

জার্মানী যে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল তার প্রমাণ আমরা অনেকবার নানা ভাবেই পেয়েছি। দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধের সময় ভারতের স্বাধীনতাকামী নেতাদের আশ্রয় দেওয়া এবং তাঁদের অনুকূলে প্রচারকার্য চালান অনেকেরই মনে আছে—কারণ তা খুব বেশী দিনের কথা নয়। প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের সময় Emden নামে একখানা জার্মান জাহাজ ভারতের উপকূলে গুলী-বর্ষণ করে। অনেকে বলেন যে তার কিছুদিন আগে একখানা জার্মান জাহাজ ভারতের উপকূলে এসে অনেক অস্ত্রশস্ত্র নামিয়ে দিয়ে যায় এবং পরেই Emden থেকে গুলী-বর্ষণের মানে এই ইংগিত দেওয়া যে জার্মানী ভারতের মুক্তিকামী সৈনিকদের পিছনে আছে এবং তাদের অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে এবং

অন্যান্য রকমে সাহায্য করতে প্রস্তুত, তারা যেন ভয় না পায় এবং স্বাধীনতার জন্যে লড়ে যায়; লড়াই হচ্ছে ইংরেজের সংগে- ভারতের সংগে নয়, নইলে জার্মানী আগে থেকে অস্ত্রশস্ত্র ভারতের উপকূলে নামিয়ে দিয়ে যেত না।

১৯১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বালেশ্বরের জংগলের মধ্যে কয়েকটি বাংগালী যুবক ইংরেজ পুলিশের সংগে রীতিমত লড়াই করেছিলেন। সে লড়াইয়ে যাঁরা প্রাণ দিয়েছিলেন তার মধ্যে বাঘা যতীন (যতীন্দ্র নাথ মুখার্জী) ছিলেন প্রধান। তাঁর ছবি অনেক কাগজে বেরিয়েছে। অনেকের ধারণা যে ঐ সশস্ত্র লড়াইয়ে এই বাংগালী তরুণদল যে অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করেছিলেন, সেগুলি ঐ জার্মান জাহাজ থেকেই নামিয়ে দেওয়া অস্ত্রগুলির অন্যতম।

আবার অনেকের মতে ঐ অস্ত্রবাহী জাহাজখানা ভারতের উপকূলে পৌঁছানোর আগেই ধরা পড়ে গিয়েছিল এবং সে জাহাজের কোনও মাল ভারতবাসীদের হাতে পৌঁছায় নি। এবং বুড়িবালামের তীরে লড়াইয়ের আগে বাঘা যতীনের দল অন্য উপায়ে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করেছিলেন। মোট কথা এসব বিষয়ের বিস্তারিত খবরাখবর যাঁদের কাছে ছিল তাঁদের অনেকেই আজ ইহলোকে নেই। খবরের কাগজওয়ালাদের কাছে কিছু কিছু থাকা সম্ভব। তবে সরকারী দপ্তরের প্রামাণ্য কাগজপত্রের বোধ হয় আর অস্তিত্ব নেই, কারণ ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হবার আগে যখন Care taker Government সরকারী কাজের ভার নেয় ঠিক তার আগেই পুলিশের Special Branch বা Intelligence Branch-এর হাতে যে সব রেকর্ড ও গোপনীয় কাগজপত্র ছিল সেগুলো পুড়িয়ে নষ্ট করা হয়েছিল। Care taker Government-এ যাঁরা মন্ত্রী হয়ে বসেছিলেন, তাঁদের প্রায় সকলের নামেই মোটা মোটা ফাইল ছিল সরকারী দপ্তরে। পাছে তাঁরা কেউ জেনে ফেলেন যে তাঁদের বিরুদ্ধে সত্যি মিথ্যে কি কি দোষারোপ করে তাঁদের প্রতি সারাজীবন অত্যাচার করা হয়েছে, সেজন্যে সে পথ পাকাপাকি ভাবে বন্ধ করবার মতলবে ইংরেজ ওই গোপন লঙ্কাকাণ্ড করিয়েছিল,—তাড়াতাড়ি এদেশ ছেড়ে চলে যাবার ব্যবস্থা হলেও ওটা তারা ভোলে নি। সেই সংগে কত অপর প্রামাণ্য দলিলপত্র যে বহ্নিসাৎ হয়েছিল, কে জানে?

নেতাজী গত দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের সময় কলকাতা পুলিশ কোর্টে, বিচারাধীন থাকা সত্ত্বেও, ছদ্মবেশে ভারত ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে কিছুকাল জার্মানীতে ও অন্যান্য দেশে আত্মগোপন করে থেকে, পরে পূর্ব রণাঙ্গনে উপস্থিত হন। সেখানকার আজাদ-হিন্দ্ ফৌজের 'কদম্ কদম্ বঢ়ায়ে যা' গানটি প্রায় সকলেই জানেন। কয়েক বৎসর আগেও পথে ঘাটে ছেলেমেয়েরা এ গানটি গেয়ে বেড়াত। এ গানখানির একখানা গ্রামোফোন রেকর্ডও বেরিয়েছিল। বাংলা সরকার সে রেকর্ডখানিকে বাজেয়াপ্ত করেন। সেই বাজেয়াপ্ত করার পর সরকারকে কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করতে হয়। প্রথম :—কোন জিনিস বাজেয়াপ্ত করতে হলে তাকে হতে হবে একটা document অথবা সেই জিনিষটিতে থাকতে হবে Visible representation—অর্থাৎ সেই বাজেয়াপ্ত জিনিসটির প্রতিপাদ্য বিষয়টি স্থূল চোখে দেখতে পাওয়া চাই—এই হল আইন। এখানে রেকর্ডখানির প্রতিপাদ্য বিষয় অথবা ভিতরের জিনিস মোটেই দেখা যায় না, সেটা কলে ফেলে পিন লাগিয়ে আওয়াজ বের করে কানে শুনতে হয়। অতএব আইনতঃ রেকর্ডটি বাজেয়াপ্ত করার আইনের আওতায় আসে না। দ্বিতীয় :—গানের শেষ কলিটির মানে সরকার সম্পূর্ণ ভুল বুঝেছিলেন। শেষ কলিটি ছিল :—

'চলো দিল্লী' পুকারকে
কৌম-ই নিশান সাম্হাল্কে
লাল কিল্লে পর গাড়কে
লহ্রায়ে যা লহ্রায়ে যা।

শেষ চরণটির লহ্রায়ে যা কথাটিকে তাঁরা 'লড়ায়ে যা' ধরে নিয়েছিলেন। তার ইংরেজী তর্জমা করা হয়েছিল—**'proceed with the battle'**। তাঁরা পরে বুঝতে পারেন যে 'লহ্রায়ে যা'র সঙ্গে 'লড়ায়ে যা'র কোন সম্বন্ধই নেই, যার সঙ্গে সম্পর্ক আছে সেটা হচ্ছে "লহর" কথা, যার মানে ঢেউ বা **wave**। নিজেদের ভুল বুঝতে পারবার পর গভর্নমেণ্ট নিজে থেকে এক বিজ্ঞপ্তি বের করে আগেকার বাজেয়াপ্ত করার হুকুমটি রদ করেন।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিদেশীয়গণ আর কোন রকম সহায়তা করেছিলেন বলে আমার জানা নেই—অন্ততঃ আইনের কবলে আর কিছু পড়েছিল বলে আমার মনে পড়ে না। তবে Meerut Conspiracy Case-এ অর্থাৎ "ঝাবওয়ালার মামলা"য়—যাতে মানবেন্দ্রনাথ রায়ও একজন আসামী ছিলেন—বিদেশের সহায়তার খানিকটা আভাস পাওয়া যায়। মামলাটি প্রথমে মীরাটে হয়, পরে এলাহাবাদ হাইকোর্টে আপীল হয়। ঐ মামলার রায় অনেক বিষয়েই আইনের নজির হয়ে আছে; অতএব সে সম্বন্ধে বেশী কিছু বলবার প্রয়োজন নেই। অনেকে হয়ত জানেন না যে ডক্টর কৈলাস নাথ কাটজু স্বয়ং কর্ণধার হয়ে আসামীদের তরফ থেকে ঐ আপিলটি চালিয়েছিলেন।

২

॥ স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কিত কয়েকটি অন্যান্য ব্যাপার ॥

চলতি ভাষায় যাকে "Petty case" বলে, সেইরকম একটি ছোট মামলার কথা প্রথমে বলি। এই Petty case-এর একজন আসামী ছিলেন মহাত্মা গান্ধী স্বয়ং, অন্যান্য আসামীদের মধ্যে ছিলেন স্বর্গীয় কিরণশঙ্কর রায় ম'শায়। সরকারপক্ষ থেকে মামলা পরিচালনা করেন তারকবাবু, সহকারী ছিলাম আমি।

Petty case কাকে বলে সে সম্বন্ধে দু-একটা কথা বললে বোধ হয় অবান্তর হবে না। ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের আমলে যে সব অপরাধ আসে, তা ছাড়াও এমন অনেক তুচ্ছ ব্যাপার আছে যেগুলির দ্বারা অপরের যথেষ্ট অসুবিধার সৃষ্টি করা হয়। যেমন পথেঘাটে লোকের চলাচলের রাস্তা বন্ধ করে কোন জিনিস রেখে দেওয়া বা মাল বিক্রী করা—ইংরেজীতে যাকে বলে 'obstruction' করা, পথে ঘাটে প্রস্রাব ইত্যাদি করা, রাস্তায় গোলমাল বা মারামারি করা, (disorderly conduct)—এই সবগুলিকেও দণ্ডনীয় অপরাধের মধ্যে ফেলা হয়েছে। যে আইনে ঐগুলিকে দণ্ডনীয় অপরাধ করা হয়েছে সেটি হচ্ছে—"Police Act" (Act V of 1861)—অর্থাৎ ১৮৬১ সালের ৫ নম্বর আইন। সাধারণ লোকে Police Actএর নাম জানে না কিন্তু "৫-আইন" বললে ব্যাপারটা সকলেই বোঝে। এই '৫-আইন'-এর যত মামলা হয় সেগুলিকে Petty case বলে। কলকাতা সহরে ঐ Police Act-এর প্রয়োগ নেই—তার বদলে "Calcutta Police Act" (Ace IV of 1866) বলে এক আইন বলবৎ আছে। সেই Calcutta Police Act-এ '৫-আইন'-এর মত অনেক বিধান আছে—এবং কিছু বেশিও আছে। সেই সব বিধানে রোজকার অনেক ছোটখাট ত্রুটি বিচ্যুতিকে দণ্ডনীয় বলে বলা হয়েছে। তবে অনেকগুলি ধারায় শাস্তি জরিমানা মাত্র। কলকাতা সহরে ঐ মামলাগুলিকেই Petty case বলে। পথেঘাটে আগুন-

জ্বালা এই জাতীয় একটি অপরাধ। যেখানে আগুন জ্বালা বারণ সেখানে "Street" শব্দটি ব্যবহার করা আছে। 'Street' শব্দের ব্যাখ্যা যেখানে দেওয়া হয়েছে সেখানে "Square" শব্দটির উল্লেখও আছে। অতএব কোন পার্কে আগুন জ্বাললে তা 'Street'-এ আগুন জ্বালার সামিল হবে—সুতরাং এই বিধানে দণ্ডনীয়।

মহাত্মাজী ১৯২৯, ১৯৩০ ও ১৯৩১ সালে যে সকল আন্দোলন চালিয়ে ছিলেন—বিলিতি জিনিষ পোড়ান তার মধ্যে একটি ছিল। তিনি কিরণশঙ্কর রায় প্রভৃতির সহায়তায় কলকাতার শ্রদ্ধানন্দ পার্কে অনেক বিলিতি জামা-কাপড় এনে আগুনে আহুতি দেন। পুলিশ জোর করে সে আগুন নিবিয়ে দেয় এবং মহাত্মাজী ও আরও পাঁচজনকে কলকাতার তখনকার Chief Presidency Magistrate Mr. T. J. Y. Roxburgh-এর আদালতে আসামী করে চালান দেয়। আগেই বলেছি যে তারকবাবু আর আমি সরকার পক্ষে হাজির হয়েছিলাম; মহাত্মাজী প্রভৃতির পক্ষে হাজির হয়েছিলেন দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত এবং আরও অনেকে। মহাত্মাজী একটি লিখিত বিবরণ কোর্টে পড়েন—তাতে বক্তব্য মোটামুটি এই ছিল যে তিনি স্থির করেছিলেন যে বিলিতি কাপড় পোড়াবেন। এই অগ্নিকাণ্ডটি সাধারণের চলাচলের রাস্তার উপর করলে লোকজনের অসুবিধা হবে—তাই তিনি শ্রদ্ধানন্দ পার্কটিকে এই কাজের উপযুক্ত বলে ঠিক করেছিলেন। নিজেদের যে বৈঠকে এ কাজ করা হবে বলে স্থির করা হয়েছিল সেখানে কয়েকজন আইনজ্ঞও উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা Police Act দেখে বলেছিলেন যে "Street" অর্থাৎ রাস্তায় অগ্নিকাণ্ড করাটাই অপরাধ; পার্কে আগুন জ্বালালে কোন অপরাধ হয় না। মহাত্মাজী আরও বলেন,—"আমার আইনজ্ঞ বন্ধুরা যদি বলতেনও যে পার্কে আগুন জ্বাললে অপরাধ হবে, তবুও আমি পার্কের ভিতরে আগুন জ্বালাতাম। আমার মতে বিলিতি জিনিস এনে ভারতবর্ষের বাজারে বিক্রী করা নিতান্ত অন্যায়। বিলিতি জিনিস পোড়ানই আমার উদ্দেশ্য এবং বিলিতি জিনিস আমি পোড়াবই। এতে যদি কোন আইন ভঙ্গ হয় তবে আমি নাচার।"

বিচারে মহাত্মা গান্ধী ও অন্যান্য সকলের ১৲ এক টাকা করে জরিমানা হল। মহাত্মাজী জরিমানার টাকা দিতে অস্বীকার করলেন। জরিমানা না দিলে

জেলের ব্যবস্থা ছিল বলে মহাত্মাজী আশা করছিলেন যে তাঁকে জেলে নিয়ে যাবে এবং সেই ভেবেই তিনি আদালতের মধ্যেই বসে রইলেন। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল মহাত্মাজীর নামে জরিমানার টাকা কোর্টের ক্যাশ ঘরে জমা হয়েছে এবং সেই মর্মে একখানি রসিদ এনে কোর্টে দাখিল করা হয়েছে। এর জন্য মহাত্মাজী বিরক্তি প্রকাশ করলেন—কিন্তু সেবার আর তাঁর জেল খাটা হল না।

১৯২৯ থেকে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত সারা দেশে বৃটিশের বিরুদ্ধে নানারকম প্রচারকার্য চালান হয়েছিল। বক্তৃতা দিলেই রাজদ্রোহিতার অপরাধে আদালতে বক্তার বিরুদ্ধে নালিশ রুজু হত এবং অধিকাংশক্ষেত্রেই বক্তার জেল হত। বই বা কাগজ লিখলেই সেটা সংগে সংগে বাজেয়াপ্ত করা হত। কত ছোট ছোট ছাপাখানা আর Duplicating Machine যে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল তার ইয়ত্তা নেই। বই বা কাগজ যে কত বাজেয়াপ্ত হয়েছিল তার তালিকা দিতে গেলে বোধহয় আকারে আঠার পর্ব মহাভারতকেও ছাপিয়ে যাবে। তাই সে চেষ্টা না করাই ভাল।

ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য আরও একরকমে চালান হয়েছিল। পূর্বেই বাজেযাপ্ত করা বই বা কাগজ থেকে গরম গরম অংশ বেছে নিয়ে পথে ঘাটে, পার্কে লোক জড় করে পড়ে শোনান হত। যাঁরা এরকম বাজেয়াপ্ত বই বা কাগজ পড়ে শোনাতেন তাঁদের পুলিশ গ্রেপ্তার করে কোর্টে অভিযুক্ত করত। তখন অসহযোগ আন্দোলনের দিন। এসব মামলায় নিজের সাফাইয়ে কেউ কোন কথা বলতেন না—নিজেদের পক্ষ সমর্থনের জন্যে উকিল নিযুক্ত করতেন না—এবং হাসিমুখে জেলে যেতেন।

দেশের বড় বড় নেতারা এই দুরকমের প্রচারকার্য ক'রে কারাবরণ করেছিলেন—তাঁদের মধ্যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহেরু, কলকাতার ভূতপূর্ব মেয়র দেশপ্রিয় স্বর্গীয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত প্রভৃতি অনেকের নাম করা যায়।* এঁরা কেউই কোর্টে বিচারের সময় নিজেদের পক্ষ সমর্থন করতে কোন উকিল, কৌঁসুলী দিতেন না। আইন অনুসারে প্রত্যেক আসামীকে জিজ্ঞাসা করতে হয় এই বলে—"আপনার বিরুদ্ধে অমুক-অমুক প্রমাণ দেওয়া হয়েছে। আপনি জবাবে কি কিছু বলতে চান?" এই প্রশ্ন হওয়ার সংগে সংগেই অভিযুক্ত নেতারা একটি করে রাজনৈতিক বক্তৃতা দিয়ে বসতেন। এই বক্তৃতা এক এক সময় এমন আকার ধারণ

করত যে আদালতে বসে কোন হাকিমের পক্ষে সে বক্তৃতা অগ্রসর হতে দেওয়া অসম্ভব। এইরকম অনেক মামলাতেই হাকিম বলতে বাধ্য হয়েছেন—

"This is a Court, not a public platform. You are entitled only to explain the circumstances appearing in the evidence against you. I am not going to allow a political speech here."

প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহেরুর মামলার বিষয়ে একটি কথা আমার মনে আছে। সন ১৯৩৪ সাল—**Hon'ble S. K. Sinha** তখন কলকাতার **Chief Presidency Magistrate.** —২রা ফেব্রুয়ারী নেহেরুজীর নামে একটি গ্রেপ্তারী পরওয়ানা নেওয়া হয় এই কোর্ট থেকে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল এই যে তিনি হিন্দীতে একটি রাজদ্রোহিতামূলক বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এই রাজদ্রোহ প্রচারের অভিযোগে তাঁকে ১৩ই ফেব্রুয়ারী আদালতে হাজির করা হলে, ১৫ই ফেব্রুয়ারী মামলার শুনানীর দিন ধার্য হয়। হিন্দী **short hand writer** হিন্দীতে বক্তৃতার কথাগুলো বক্তৃতা দেওয়ার সময়ই লিখে নিয়েছিলেন। সেটাকে ইংরেজীতে তর্জমা করা হয়েছিল। তা ছাড়াও পুলিশের **Special Branch** থেকে একজন **Inspector** বক্তৃতার সারমর্ম বিস্তারিত ভাবে রিপোর্ট করেছিলেন। জওহরলালজীকে যখন তাঁর জবাবের কথা জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তখন মামলা সম্বন্ধে তিনি কেবলমাত্র এই কথাটি বলেছিলেন যে, বাঙ্গালী **Inspector**-টি তাঁর হিন্দী বক্তৃতার যে **Long-hand** রিপোর্টটি দাখিল করেছে তার থেকে দেখা যায় যে লোকটি হিন্দী জানে না এবং হিন্দী কথার মানেও জানে না। এ ছাড়া মামলা সম্বন্ধে তিনি আর কোন কিছু বলেন নি। সাধারণ রাজনৈতিক বক্তৃতা দেবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাঁকে বেশীদূর অগ্রসর হতে দেওয়া হয় নি। ১৬ই ফেব্রুয়ারী বিচারের রায় বের হল। এ মামলায় তাঁর দু'বৎসরের **Simple Imprisonment** বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডের হুকুম হয়েছিল।

পরবর্তীকালে প্রচার কার্যের একটি মামলার কথা বলে এই অধ্যায়টি শেষ করব। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ১৯৪১ সালে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে কলকাতার **Additional Chief Presidency Magistrate**-এর এজলাসে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১২৪ 'ক' ধারা এবং **Defence of India Rules** এর এক অভিযোগ করা হয়। এই মামলাটির বিষয়বস্তু

ছিল নেতাজী সম্পাদিত "Forward Block" কাগজে প্রকাশিত কতকগুলি রাজদ্রোহিতামূলক প্রবন্ধ। মামলা যখন রুজু হয় তখন নেতাজী বিনা বিচারে Political Prisoner হিসাবে জেলে আটক ছিলেন। যে কয়দিন মামলা চলেছিল, তার প্রত্যেক দিনই নেতাজীকে জেল থেকে আনান হত। পুলিশকোর্টে তখন কোন মামলাই একাদিক্রমে হত না। প্রত্যেক দিনই খানিকটা করে হবার পর আবার দশ পনের দিন বাদে তারিখ পড়ত। এইরকম একবার যখন পনের দিনের পর আবার শুনানীর জন্যে মামলার তারিখ পড়ল, সেই মুলতুবী সময়ের মধ্যে গভর্ণমেণ্ট তাঁকে জেল থেকে মুক্তি দিল। তিনি জেল থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়ী চলে গেলেন। তার পরের শুনানীর দিনে নেতাজী অসুস্থ বলে তাঁর পক্ষ থেকে এক Medical Certificate কোর্টে দাখিল করা হল। আসামীর অবর্তমানে তার বিরুদ্ধে মামলা সাধারণতঃ চলতে পারে না। সে জন্যে নেতাজীর বিরুদ্ধে এই মামলাটি দেড় মাসের জন্যে মুলতুবী হল। তার পরের ধার্য দিনে না নেতাজী না তাঁর পক্ষ থেকে কোন উকিল কৌঁসুলী, কেউই আদালতে হাজির হলেন না। ফলে তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানার হুকুম হল। ওই Warrant of Arrest নিয়ে পুলিশ তাঁর বাড়ীতে গিয়ে দেখতে পেল যে সেখানে নেতাজীর কোন পাত্তাই নেই। তারপর তাঁর বিরুদ্ধে Proclamation বা 'হুলিয়া' করা হল। Proclamation-এর মেয়াদ শেষ হবার পর নেতাজীর নামে যেসব সম্পত্তি ছিল সেগুলি 'Attachment' বা ক্রোক করার হুকুম হল। তাঁর সম্পত্তির মধ্যে চিত্তরঞ্জন এ্যাভেনিউ-এর উপর অবস্থিত অর্ধসমাপ্ত "মহাজাতি সদন" বাড়ীখানাও ছিল।

১৬৬ নং চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউ-এ Calcutta Corporation-এর প্রায় দুই বিঘা জমি ছিল। নেতাজী 'মহাজাতি সদন' স্থাপনা করবেন ঠিক করে সেই উদ্দেশ্যে কিছু চাঁদা তুলেছিলেন। সেই টাকা থেকে তিনি নিজে ঐ দুবিঘা জমি কলকাতা কর্পোরেশন থেকে Long-term Lease বা দীর্ঘকাল মেয়াদী ইজারা নেন। সে সময় গভর্ণমেণ্ট কথায় কথায় যত কিছু Association, সমিতি বা সংঘগুলিকে বে-আইনী বলে ঘোষণা করে দিচ্ছিল। দেশের সে-সময়কার সেই পরিস্থিতির জন্যে নেতাজীর পক্ষে কোন "Committee" গঠন করে সেই কমিটির হাতে ঐ চাঁদার টাকাগুলি তুলে দেওয়া সম্ভবপর হয় নি। তিনি নিজের নামেই ঐ জমি ইজারা

নিয়ে কলকাতা কর্পোরেশন থেকে Plan Sanction করিয়ে 'মহাজাতি সদনে'র কাজ আরম্ভ করে দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্যে লোহা, সিমেণ্ট প্রভৃতি জোগাড় করার অত্যন্ত অসুবিধা না হলে হয়ত নিজে উপস্থিত থেকেই এই বাড়ীখানি সম্পূর্ণ করে ফেলতে পারতেন। কোর্টের পরওয়ানা বলে নেতাজীর নিজ নামের এই সম্পত্তি ক্রোক করে Receiver নিযুক্ত করার জন্যে দরখাস্ত আদালতে করা হল।

এই দরখাস্ত দেওয়ার আগে গভর্ণমেণ্ট স্থির করেছিলেন যে স্থানীয় Deputy Commissioner of Policeকে রিসিভার নিযুক্ত করার জন্যে দরখাস্ত করা হবে। কিন্তু পরে ব্যাপারটা আর একটু তলিয়ে চিন্তা করাতে দেখা গেল যে মাসে মাসে জমির খাজনা ও প্রতি Quarterএ Municipal Tax কলকাতা কর্পোরেশনকে দিতে হবে। কলকাতা কর্পোরেশন তখন কংগ্রেসীদের হাতে; এই খাজনা কি Tax-এর কিস্তির খেলাপ হলেই ঐ সম্পত্তি যে নীলামে তোলা হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহেরই অবকাশ নেই। এবং এটাও ঠিক হল যে খাজনা ও ট্যাক্স্-এর দরুন অতটাকা গভর্ণমেণ্টের ঘর থেকে দেওয়াও সম্ভব নয়। শেষে গভর্ণমেণ্ট বিচার করে স্থির করলেন যে একবার যদি কলকাতা কর্পোরেশনের Chief Executive Officerকে এই সম্পত্তির রিসিভার নিযুক্ত করা হয় তবে আর কলকাতা কর্পোরেশন সহজে নেতাজীর নামের সম্পত্তিকে নীলামে তুলতে পারবেন না। সে চেষ্টা করলে নিজেদের মধ্যেই গৃহবিবাদ সুরু হয়ে যাবে। বলা বাহুল্য যে, গভর্ণমেণ্টের এই আশা ও সিদ্ধান্ত একেবারে নির্ভুল হয়েছিল।

উপরের পরামর্শমত গভর্ণমেণ্ট Receiver-এর দরখাস্ত করলেন এবং তখনকার Chief Executive Officer Mr. J. C. Mukherjee ঐ সম্পত্তির রিসিভার নিযুক্ত হলেন। Mr. Mukherjee রিসিভার হিসাবে আদালতকে অনেকবার এ সম্পর্কে ট্যাক্স ও খাজনার দরুন টাকা বন্দোবস্ত করবার তাগিদ দিয়েছিলেন,—কোনই ফল হয় নি। কিন্তু যদি প্রথম সিদ্ধান্ত অনুসারে Deputy Commissioner of Policeকে রিসিভার নিযুক্ত করা হত তবে অল্পদিনের মধ্যেই ঐ সম্পত্তি নীলামে চড়ে সামান্য টাকার বিনিময়ে কোনও কোটিপতির আর একটা বাড়ীর মধ্যে গণ্য হয়ে যেত এবং তার কিছুদিন পরেই তার আর একটি চোদ্দ

তলা ভাড়াবাড়ীতে পরিণত হত,—আজকের এই নেতাজীর গৌরবময় স্বপ্ন "মহাজাতি সদন" হয়ে বাঙলার বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়ান সম্ভব হত না কিছুতেই।

এই রিসিভার নিযুক্ত হওয়ার পর নেতাজীর অগ্রজ শ্রীশরৎচন্দ্র বসু আদালতে এই মর্মে এক দরখাস্ত করেন যে 'মহাজাতি সদনে' নেতাজীর নিজস্ব কোন স্বত্বই ছিল না, তিনি জনসাধারণ থেকে চাঁদা তুলে জনসাধারণের হিতের জন্যে ঐ জমি ইজারা নিয়ে 'মহাজাতি সদনে'র বাড়ী তৈরী করছিলেন মাত্র। দেখা গেল যে এ দাবীর সমর্থনে কোন দলিল বা কাগজপত্র নেই, বরং প্রকাশ পেল যে কলকাতা কর্পোরেশন থেকে যে 'পাট্টা' নেওয়া হয়েছিল, সেটা নেতাজীর নিজের নামেই নেওয়া হয়েছিল। ফলে শরৎবাবুর আপত্তি আদালতে না-মঞ্জুর হল। তার পরে Criminal Procedure Code অর্থাৎ ফৌজদারী কার্যবিধি আইনের Section 88 (6-D) দফা অনুসারে কলকাতা হাইকোর্টে এক দেওয়ানী মামলা রুজু হল।

ভারত স্বাধীন হবার ঠিক আগেকার Care-taker Government এর নির্দেশমত নেতাজীর বিরুদ্ধে যত মামলা ছিল সব তুলে নেওয়া হল এবং তাঁর বিরুদ্ধে Warrant, Proclamation ইত্যাদি যত রকমের পরওয়ানা জারী ছিল সব প্রত্যাহার করা হল। তার ফলে এই 'মহাজাতি সদন' সম্পত্তির উপর গভর্ণমেণ্টের আর কোনও দাবী দাওয়া রইল না। তার পরে পশ্চিম বাঙলা বিধান সভা থেকে Mahajati Sadan Act নামে আইনটি পাশ হয়ে ১৯৪৯ সালের ১৪ই এপ্রিল তারিখে Calcutta Gazetteএ বেরুল। এই আইনবলে সরকার "Board of Trustees" নিযুক্ত করবার ক্ষমতা পেলেন এবং সেই Board-কে Rule-making Power অর্থাৎ নিয়মাবলী প্রস্তুত করবার ক্ষমতা দেওয়া হল। সেই আইন অনুসারে নেতাজীর অসমাপ্ত 'মহাজাতি সদন' সম্পূর্ণ হয়ে চিত্তরঞ্জন এ্যাভেনিউ-এর উপর আজ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

॥ ইংরেজ-জাতের ইংরেজ-প্রীতি ॥

স্বাধীনতা লাভের আগে এদেশে ইংরেজদের ইংরেজ-প্রীতির বহু নমুনা দেখা গিয়েছিল। আজ অনেকেই হয়ত তা ভুলে গেছেন। সে সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র, প্রভাত মুখুজ্যে প্রভৃতি লেখকেরা যে সব গল্প লিখে গেছেন, সেগুলি মোটেই গল্প নয়—বরং অনেকসময় সত্যি ঘটনার কাছে সেগুলি পর্যন্ত তুচ্ছ বলে মনে হয়। যাঁরা ঐ সংক্রান্ত ঘটনাগুলি চাক্ষুষ না দেখেছেন, তাঁদের পক্ষে হয়ত এখন সেগুলি বিশ্বাস করা শক্ত।

আসলে ইংরেজরা নিজেদের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্যেই এদেশে এসেছিল—অন্য কোন কারণে নয়। কিন্তু তাদের প্রচার বা অপ-প্রচারের কায়দায় এমন একটা পরিস্থিতি গড়ে উঠেছিল যে অন্ততঃ এক শ্রেণীর লোকের মনে এই ধারণা জন্মে গিয়েছিল যে ভারত বা ভারতীয়দের উপকারের জন্যেই ইংরেজ ভারত শাসন করছে। এই সম্পর্কে শ্বেতাঙ্গ কবি Bertrand Shadwellএর একটি প্রসিদ্ধ কবিতা নিচে তুলে দিচ্ছি—কারণ এটি নানাদিক দিয়ে বিচার বিবেচনার খোরাক জোগায়ঃ—

"If you see an island shore
Which has not been grabbed before,
Lying in the track of trade, as islands should,
With the simple native quite
Unprepared to make a fight,
Oh, you just drop in and take it for his good,
Not for love of money, be it understood.

But you row yourself to the land,
With a Bible in your hand,
And you pray for him and rob him, for his good:
If he hollers, then you shoot him for his good.

Or this lesson I can shape
To campaigning at the Cape,
Where the Boer is being hunted for his good;
He would welcome British rule
If he weren't a blooming fool;
Thus you see it's only for his good.

So they are burning houses for his good,
Making helpless women homeless for their good.
Leaving little children orphans for their good.

In India there are bloody sights
Blotting out the Hindu's rights
Where we've slaughtered many millions for their good.
And, with bullet and with brand,
Desolated all the land,
But you know we did it only for their good.

Yes, and still more far away,
Down in China, let us say,
Where the "Christian" robs the "heathen" for his good,
You may burn and you may shoot,
You may fill your sack with loot,
But be sure you do it only for his good.

MORAL.

If you dare commit a wrong
On the weak because you're strong,
You may do it if you do it for his good!
You may rob him if you do it for his good:
You may kill him if you do it for his good."

ঠিক এই মনোবৃত্তি নিয়ে ইংরেজরা এ দেশে চলাফেরা করত। তাদের রোজকার জীবনে তারা ভারতীয়দের উপর অত্যাচার করত এবং সে সব ব্যাপারে সারা ইংরেজ জাত সংঘবদ্ধ হ'য়ে তাদের জাত-ভাইকে সমর্থন করত। এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে যে সাহেব-মনিব গভীর রাত্রে বেহুঁশ মাতাল হয়ে বাড়ী ফিরল, প্রভুভক্ত খানসামা তার পোষাক ছাড়িয়ে কোনমতে রাতের পোষাক পরিয়ে দিয়ে তাকে বিছানায় শুইয়ে দিল। ভোরবেলা থেকে সাহেবের স্নানের জন্যে গরম জল ইত্যাদি তৈরী করে অপেক্ষা করতে লাগল কখন সাহেব দয়া ক'রে উঠবেন। সাহেবের কাজে যাওয়ার সময় পার হ'য়ে গেল, কিন্তু সাহেবের ঘুম আর ভাঙ্গে না। অতএব খানসামা উভয় সংকটে পড়ে ভয়ে ভয়ে সাহেবকে জাগিযে জানালো যে তার আফিসের দেরী হ'য়ে গেছে। সাহেব ঘড়ির কাঁটার দিকে তাকিযে অন্যদিনের মত স্নান না করেই তাড়াতাড়ি দাড়ি কামিয়ে পোষাক পরে খাবার টেবিলে এসে বসল। খানসামাকে ঘুণাক্ষরেও বলেনি যে "আভি খানা তৈয়্যার চাহি।" প্রভুর আবার খানা গরম গরম না হ'লে মেজাজ খারাপ হ'য়ে যায়! অতএব সাহেবের খানা তৈরী হ'তে একটু দেরী হ'যে গেল এবং সেইসঙ্গে সাহেবের ধৈর্যের বাঁধও ভেঙ্গে গেল। ফলে এক দৌড়ে সাহেবের বাবুর্চিখানায় গমন ও খানসামার পেটে সবুট পদাঘাত! প্রভুভক্ত খানসামা বেচারা পিলে ফেটে রক্তবমি করতে করতে পড়ে গেল! ইংরেজ Police Officer সদলবলে এসে রক্তমাখা কাপড়চোপড়গুলো সরিয়ে ফেলে খানসামার মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্যে পাঠিয়ে দিল। যথাসময়ে ইংরেজ Civil Surgeonএর Post-Mortem Report পাওয়া গেল,—"Death due to sudden heart failure"!

'Labour Laws' বা শ্রমিকদের জন্যে আইন বলতে গেলে ১৯২৬ সালের "Trade Union Act"-এর আগে বিশেষ কিছুই ছিল না। ঐ জাতীয় আইন ক্রমশঃ হওয়ার পরে কারখানা প্রভৃতিতে পিলে ফাটিযে মেরে ফেলে সেটা ঐ রকম ভাবে বেমালুম্ হজম করে যাওয়া শক্ত হযে পড়ল। কিন্তু অন্য জায়গায় ভারতীযদের জীবনের যে কোন দামই নেই এ মনোভাব প্রকাশ করতে ইংরেজরা এককভাবে বা জাত হিসেবে মোটেই দ্বিধা বোধ করত না।

আসামের চা বাগানে একটি খুন সম্বন্ধে কলকাতা হাইকোর্টের দায়রায় একটি মামলা হয়েছিল। সে মামলার খবর নীচে বলছি।

আসামে "খরিয়াল টি গার্ডেন" নামে ইংরেজ কোম্পানীর এক চায়ের বাগান ছিল। সে বাগানে কয়েকজন ইংরেজ Manager, Assistant Manager ইত্যাদি কাজ করত। যে সব কমবয়সী ইংরেজ অবিবাহিত অবস্থায় এ দেশে এসে এ সব চা-বাগানে কাজ করত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা অতি জঘন্য চরিত্রের লোক হত। Reid নামে একটি ইংরেজ তরুণ হীরা নামে কুলিদের একটি মেয়ের উপর অত্যাচার করতে যায়। ফলে সেখানে কুলি-বস্তিতে মারধোর খেয়ে ফিরে আসে। কালা আদমির হাতে লাঞ্ছনায় British pride ধূলিসাৎ হয় এটা কি সে বরদাস্ত করতে পারে? তাই তাড়াতাড়ি তার কোয়ার্টারে ফিরে এসে Rifle-এ গুলি ভরে সেটা নিয়ে আবার হীরার কুলিধাওড়ায় গিয়ে হাজির হল। সেখানে হীরার বাপ ও আরও অন্যান্য লোক জমায়েৎ ছিল—Reid গিয়ে তাদের সামনে চিৎকার করে দাবী করল—"হীরা হ্যায়?" "সাহেব তুমি আবার এলেছ?" —বলে হীরার বাপ এগিয়ে এল; সঙ্গে সঙ্গে সেই নর-পশু হীরার বাপকে লক্ষ্য করে Rifle চালাল। হীরার বাপ বেচারা গুলি খেয়ে সেখানেই পড়ে মরে গেল। এই ঘটনায় কুলিরা খুবই উত্তেজিত হয়ে উঠল, এবং সে উত্তেজনা আসামের সমস্ত চা-বাগানে ছড়িয়ে পড়ল। ফলে Reid এর বিরুদ্ধে খুনের মামলা চালান ছাড়া তখন আর গতি রইল না।

এখন "United Kingdom Citizens' Association" বলে একটি সমিতি আছে। সে সময় "European Association" নামে অত্যন্ত ক্ষমতাশালী একটি সমিতি এদেশে ছিল। স্বয়ং বড়লাট সাহেব প্রতি বৎসর ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় এসে একদিন তাদের ঐ সমিতিতে ভোজ খেতেন। সেই ইউরোপিয়ান-এ্যাসোসিয়েশন থেকে Reid এর মামলার তদ্বির আরম্ভ হল। আসাম অঞ্চলে এমন উত্তেজনার সৃষ্টি সে সময় হয়েছিল যে কলকাতা হাইকোর্ট নির্দেশ দিলেন যে তাঁদের নিজস্ব আদিম বিভাগের দায়রায় ঐ মামলাটির বিচার হবে। কলকাতা হাইকোর্টের ইংরেজ জুরী তখনকার দিনে প্রায়ই Clive Street-এর শ্বেতাঙ্গ বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকেই বেছে নেওয়া হত এবং তারা সকলেই ঐ ইউরোপিয়ান এ্যাসোসিএশনের সদস্য থাকতেন। তার ফলে, কলকাতা হাইকোর্টের দায়রায় কোন শ্বেতাঙ্গ আসামীর জান-মান বিপন্ন হলে শ্বেতাঙ্গ জুরীর "Verdict" বা রায় কি হবে তা আগে থেকেই অনুমান করা যায়—বিশেষ

করে খোদ ইউরোপিয়ান এ্যাসোসিএশনই যদি আসামী-পক্ষের তদ্বির-কারক হয়।

Reid এর মামলায় বিখ্যাত কৌঁসুলী Mr. Langford James আসামীর পক্ষ-সমর্থন করেন। Attorney ছিলেন—Messrs Orr Dignam & Co. —আমি তখন সেখানে শিক্ষানবিশী করছি। আসামী Reid-এর বিবৃতি হল যে, সে বন্দুক ঘাড়ে করে শিকার করতে গিয়ে রাস্তা হারিয়ে ফেলে। পথ হারিয়ে সে ঐ বস্তীর ভিতর ঢোকে। "হীরা" নামে কাউকে সে চেনে না। সে ইংরেজী ছাড়া অন্য কোন ভাষা জানে না। হীরা বলে যে কোনও কথাও আছে এবং হীরা কথাটা যে মানুষের নাম হতে পারে তাও সে জানে না। সে নিজে ভারতীয়দের ভাষা বোঝে না এবং ভারতীয়রাও তার ভাষা বোঝে নি। সে পথ হারিয়ে সামনে লোকজন দেখে জিজ্ঞাসা করেছিল—"Here road হ্যায়?" —অর্থাৎ "এখান দিয়ে রাস্তা আছে?" অমনি কতকগুলো লোক তেড়ে এসে তাকে আক্রমণ করলে সে আত্মরক্ষার্থে গুলি চালাতে বাধ্য হয়েছিল। বলা বাহুল্য, ইংরেজ জুরীদের Verdict-এ আসামী বেকসুর খালাস হল। Reid-এর বন্ধু-বান্ধব অবশ্য তাকে আর আসামে ফিরে যেতে দেয় নি। পরের জাহাজেই তাকে এ দেশ থেকে বিলেতে ফেরত পাঠিয়েছিল।

এ ত গেল জুরীর বিচার। খালি ইংরেজ জুরী বলে নয়, সকল সময়েই ইংরেজ জাত তাদের দেশ-ভাইকে বাঁচাবার জন্যে বদ্ধ-পরিকর থাকত। নিচের ঘটনাটি তার একটি বিশিষ্ট উদাহরণ বলা যেতে পারে।

Ottaway নামে একজন উচ্চপদস্থ Military Officer দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বার্মায় ছিল। যখন সেখানকার Governor এদেশে পালিয়ে আসে তখন সে যাতে অক্ষত দেহে চ'লে আসতে পারে সে ব্যাপারে Ottaway অনেক সাহায্য করেছিল। Ottaway ভারতবর্ষে এসে Civil Supply Department-এ অসামরিক কাজে নিযুক্ত হ'ল। তখন অবশ্য তার Military Rank ছেড়ে দিতে হল। Ottaway কলকাতায় Civil Supply এর Transportation Directorate-এ একজন হোমরা চোমরা Officer হল। Transportation Directorate-এ তার হাতে অনেকগুলি মোটর গাড়ী, লরী ইত্যাদি থাকত। সে সব গাড়ীর মেরামত, চলাচল প্রভৃতি সব বিষয়েরই হর্তাকর্তা Ottaway নিজেই ছিল। সে তখন Free School

Street অঞ্চলে এক বিরাট Motor Garage খুলে বসল। Civil Supply Department-এর গাড়ীগুলো ত' সেখানে মেরামত হতই, তাছাড়া বাইরের অনেক গাড়ী সেখানে আসতে লাগল। এ কারখানার কারবার খুবই জমাও হয়ে উঠল। সেই কারখানার এক অংশে সে কয়েকটি বেশ পরিপাটিভাবে সাজান কামরা রেখেছিল, যে গুলি সে সময়কার অনেক বড় বড় ইংরেজ অফিসারদের সান্ধ্য-সম্মিলনী ও নৈশ-বৈঠকের আড্ডা হয়েছিল। এক কথায় বলতে গেলে তখন কলকাতায় এমন ইংরেজ অফিসার কমই ছিল যারা Ottaway-র ঐ সংলগ্ন কামরাগুলিতে তার আতিথ্য গ্রহণ করে খানা-পিনা আমোদ-প্রমোদ করে নি।

সরকারী কর্মচারীদের উপর প্রযোজ্য কতকগুলি Conduct Rules (চালচলন, কার্য-কলাপ ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ নিয়মাবলী) আছে। তার একটি হচ্ছে যে কোন সরকারী কর্মচারী Government-এর অনুমতি ছাড়া কোনও কারবারে জড়িত হতে পারবে না। যদি কোনও সরকারী কর্মচারী এ নিয়মের ব্যতিক্রম করে গভর্ণমেণ্টের অনুমতি না নিয়ে কোন কারবারে ব্রতী হয় তবে সে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৬৮ ধারা অনুসারে দণ্ডনীয়। এ ক্ষেত্রে গভর্ণমেণ্টের অনুমতি বলতে গভর্ণমেণ্টের নিয়মানুযায়ী কেতাদুরস্ত Government-এর নামীয় অনুমতিই বোঝায়— কোনও বিশিষ্ট কর্মচারীর ব্যক্তিগত মৌখিক অনুমতিতে চলবে না। Ottaway যে এই মোটর গ্যারেজের কারবার করছিল তার জন্যে না সামরিক বিভাগের, না Government of India-র কোন বেসামরিক বিভাগের, না Government of Bengal-এর কোন বেসামরিক বিভাগের— কোন বিভাগেরই কোন যথাযথ অনুমতি কোনদিন সে নেয়নি। তা সত্ত্বেও উচ্চপদস্থ ইংরেজ I. C. S. অফিসার এবং অন্যান্য রাজকর্মচারীরা Ottaway-র ঐ গ্যারেজে যে রকম বেপরওয়া ভাবে সান্ধ্য ও নৈশ সম্মেলনে যোগদান করতে লাগল তাতে সেটা রীতিমত কলঙ্ক ও কুৎসার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। পশ্চিম বঙ্গের ভূতপূর্ব Chief Secretary Sri S. N. Ray তখন Civil Supply Department-এ কোনও একটি বিশিষ্ট পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই কেলেঙ্কারী ও কুৎসার খবর তাঁর কাছে আসতে লাগল এবং Ottaway-র ঐ বেআইনী কাজ ও তার অবশ্যম্ভাবী ফলাফল শ্রীরায়ের কাজে অসুবিধার সৃষ্টি করতে লাগল। তিনি তখন এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন।

কিন্তু তাঁর উপরওয়ালা যত ইংরেজ I. C. S. Officer সবাই ব্যাপারটাকে হেসে উড়িয়ে দিতে লাগল। শ্রীরায় এমনভাবে বেঁকে বসলেন যে ইংরেজের ইংরেজ প্রীতি আর Ottawayকে রক্ষা করতে পারল না এবং শেষটায় তখনকার বাঙলা সরকার Ottaway-র বিরুদ্ধে মামলা রুজু করতে বাধ্য হলেন। Public Prosecutor হিসাবে সরকার পক্ষ থেকে মামলা চালাবার ভার পড়ল আমার উপর। আমার সহকারী ছিলেন শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ চৌধুরী —যিনি হাইকোর্টে 'ধ্রুব চৌধুরী' নামে খ্যাত। এখন তিনি হাইকোর্টের পাবলিক প্রসিকিউটর এবং "Chaudhuri & Chaudhuri" নামে এ্যাটর্ণি আফিসের মালিক। যে Police Officer-টি আমার সহায়তায় নিযুক্ত ছিলেন তিনি হচ্ছেন এখনকার পুলিসের Deputy Commissioner, North—Sri D. C. Chanda I. P. J. P., তিনি বড় বড় Government Officerদের কাছে গিয়ে তাদের statement বা বিবৃতি নিয়ে এলেন। Government of Bengal বা Government of India-র যতগুলি Department-এর সঙ্গে Ottaway সংশ্লিষ্ট ছিল সব Department থেকেই প্রমাণ সংগ্রহ করা হল যে, Ottaway গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে এই মোটর গ্যারেজ চালিয়ে কারবার করার জন্যে কোনও অনুমতি কোনদিন চায় নি এবং গভর্ণমেণ্ট থেকেও কোন অনুমতি কোন দিন দেওয়া হয় নি।

মামলা চালাতে গিয়ে সাক্ষীদের দ্বারা আমায় আইনতঃ প্রমাণ করতে হ'ল যে:— (১) ঐ মোটর গ্যারেজটির মালিক Ottaway নিজে; (২) মোটর গ্যারেজটিতে মোটর মেরামতের কাজ কারবার করা হয়; (৩) Ottaway নিজে Government Servant বা সরকারী চাকরে; (৪) Ottaway গভর্ণমেণ্টের অনুমতি না নিয়ে এই কারবার চালাচ্ছিল।

গ্যারেজের কাগজপত্র, মিউনিসিপ্যালিটির লাইসেন্স ইত্যাদি দেখিয়ে প্রথম দু'টি অভিযোগ সহজেই প্রমাণ করা গেল৭ শেষের দু'টি অভিযোগ প্রমাণ করতে সংশ্লিষ্ট সব ডিপার্টমেণ্ট থেকেই বড় বড় অফিসারদের ডাকা হল। Ottaway যে Government Servant এবং গভর্ণমেণ্টের অধীনে কি কাজ করে সে কথা সকলেই প্রমাণ করলেন। তাঁদের দ্বারা আরও প্রমাণ হল যে Ottaway এই কারবার করবার বা চালাবার জন্যে অনুমতি চেয়ে গভর্ণমেণ্টের কাছে কোন দরখাস্তই দেয় নি। কাজে কাজেই গভর্ণমেণ্ট থেকে Ottaway-কে ঐ কারবার করবার জন্যে কোন অনুমতিই দেওয়া

হয় নি। যতগুলি ডিপার্টমেণ্ট থেকে এই রকম অনুমতি দেওয়া সম্ভব, সেই সব ডিপার্টমেণ্ট থেকেই যখন এই কথাটা প্রমাণ হয়ে গেল, তখন Ottaway-র পক্ষে আর গভর্ণমেণ্টের অনুমতির অভাব সম্বন্ধে 'Benefit of Doubt' বা 'সন্দেহের সুযোগ' দাবী করবার রাস্তা রইল না।

একের পর এক হোমরা চোমরা ইংরেজ সাক্ষী এসে এই কথাগুলি প্রমাণ করে গেল। তাদের মধ্যে দু'জন উচ্চপদস্থ Military Officer ছিলেন—দু'জনেই Major General. এদের সকলের জবানবন্দীতে এই কটি কথা নেওয়া হল :—"আমি এত বৎসর ধরে Ottawayকে চিনি। সে এখন Bengal Government-এর Civil Supply Departmentএ Director of Transportation. যদি কোন সরকারী কর্মচারী নিজে কারবার করবার অনুমতি চেয়ে আমার ডিপার্টমেণ্টে দরখাস্ত করে, সেই দরখাস্ত যথাক্রমে আমার কাছে আসবে। আমি আমার ডিপার্টমেণ্টের কাগজ পত্র দেখেছি। আমার ডিপার্টমেণ্টে Ottaway এরকম কোন দরখাস্ত করে নি; কাজে কাজেই আমার ডিপার্টমেণ্ট থেকে Ottawayকে নিজে কারবার করবার কোন অনুমতি দেওয়া হয় নি। এ সম্বন্ধে আমার ডিপার্টমেণ্টে কোন কাগজপত্র নেই।" এই কথা কটি ছাড়া এই সাক্ষীদের আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করা হয় নি; কারণ বেশ বোঝা যাচ্ছিল যে এঁরা সকলেই এই কথা বলতে প্রস্তুত হয়েই এসেছেন যে Ottaway তার মোটর গ্যারেজের কারবারটি মোটেই গোপনে করে নি, বরং প্রকাশ্যভাবে সকলকে জানিয়েই করছিল এবং বড় ছোট সব শ্রেণীর কর্মচারীরা তা জানত। সে কারণ তাদের যখন মাত্র উপরের আকারের জবানবন্দী নেওয়া ছাড়া আর কিছু জিজ্ঞাসা না করে একের পর এক সাক্ষীকে কাটরা (Witness Box) থেকে নেমে যেতে বলা হচ্ছিল সকলেরই মুখ হাঁড়ি হয়ে যাচ্ছিল। সব চেয়ে মজা করেছিলেন Bengal Government-এর তখনকার Chief Secretary. তাঁরও উপরের আকারের জবানবন্দীটুকু নেবার পরই আদালতের কায়দা অনুসারে আমি তাঁকে বলি,—"That's all. Thank You. You may now step down." তিনি আর থাকতে না পেরে ফ্যাল ফ্যাল করে একবার চারদিকে তাকিয়ে দেখে ম্যাজিস্ট্রেটকে উদ্দেশ করে বললেন,—"Is that all? But I know a lot more." বিচারক ছিলেন এ

মামলায়—Mr. R. Gupta I. C. S., তখনকার Chief Presidency Magistrate, Calcutta, যিনি বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেন্টের Chief Secretary. তিনি ব্যাপারটি বুঝতে পেরে হেসে বললেন Chief Secretaryকে,—"You needn't worry. Mr. Mitter will ask you about everything you know when his turn comes." 'Mr. Mitter'—অর্থাৎ Mr. J. P. Mitter ছিলেন আসামীর কৌঁসুলী—এখন তিনি High Court-এর Judge।

এই রকম প্রমাণের পরে Ottawayর যে জেল হয়ে গেল তা বলাই বাহুল্য। এই সাজার বিরুদ্ধে Ottaway হাইকোর্টে আপীল করে, এবং সেই Appeal-এর শুনানী হয় Mr. Justice Roxburgh এর কাছে। তিনি পত্রপাঠ আপীলটি ডিসমিস করে দিলেন। পরে Ottawayর তরফ থেকে Federal Courtএ আপীল করবার অনুমতি চাওয়া হয়েছিল, তাও নামঞ্জুর হয়—অর্থাৎ Ottawayর সাজা বহালই থাকে।

ইংরেজদের স্বজাতি প্রীতির অন্য ধরণের একটি উদাহরণ এবার দিচ্ছি। এর ঘটনা ও আখ্যানভাগ সম্পূর্ণ সত্যি—কেবল নামগুলি সবই কল্পিত; অর্থাৎ 'ছদ্মনাম' ব্যবহার করেছি সব নামের জায়গায়। আসল নামগুলি কেন গোপন করতে বাধ্য হয়েছি আখ্যায়িকাটি পড়লেই বুঝতে পারবেন।

কলকাতা থেকে কিছু দূরে—মাত্র একরাত্রের পথ গেলে এর ঘটনা স্থল। অবিভক্ত বাংলার একটি জেলার সহর—ধরুন সে জায়গার নাম··· গোবিন্দপুর। সেখানে নতুন একটি উকিল রতিকান্তবাবুর বেশ ভাল পশার জমেছিল। কাজে কর্মে খুব চালাক বলে তার নামডাকও হয়েছিল। একটি ছোটখাট জমিদারীর মালিক নিঃসন্তান কমবয়সী বিধবা কাদম্বিনী দেবী গোবিন্দপুরে এসে রতিকান্তবাবুকে দিয়ে তাঁর জমিদারীর মামলা মোকদ্দমা সব করাতেন, কারণ কাদম্বিনী তাঁর সরকার গোমস্তাদের বিশ্বাস করতে পারতেন না। কলকাতার বাইরের উকিল বাবুদের বাড়ীতে দূর পাড়াগাঁ থেকে মক্কেল এলে থাকতে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। সাধারণতঃ পুরুষ মক্কেলই আসে এবং বৈঠকখানা ঘরের একপাশে ফরাসে তারা শুয়ে থাকে। মেয়ে মানুষ মক্কেল খুব কমই আসে। এলেও রাত্রিবাস করে না উকিলবাবুর বাড়ীতে। একবার মামলার জন্যে কাদম্বিনী সদরে উকিল-বাড়ীতে উপস্থিত হলেন। এক্ষেত্রে

উকিল মক্কেল দুই পক্ষই ব্রাহ্মণ। রতিকান্তবাবুর স্ত্রী কাদম্বিনীকে অন্দরে নিয়ে গিয়ে কুটুম্ব-আদরে রাখলেন। এইভাবে কাদম্বিনী মামলার ব্যাপারে দু' তিনবার যাতায়াত করল। তারপর মাস দুই বাদে আবার তারিখ পড়ল এবং তখন কাদম্বিনীর আবার আসার কথা ঠিক হয়ে রইল। এদিকে রতিকান্তবাবুর স্ত্রী সন্তান-সম্ভবা। প্রসব হওয়ার জন্যে তাঁকে বাপের বাড়ী যেতে হল কাদম্বিনীর মামলায় এবারকার ধার্য দিনের আগেই, কারণ রতিকান্ত বাবুর বাড়ীতে আর দ্বিতীয় মেয়েছেলে ছিল না। মামলার ধার্য দিনে কাদম্বিনী এল এবং আগের মতই রতিকান্তবাবুর অন্দরে রইল—যদিও বাড়ীতে আর কোন মেয়েমানুষ ছিল না। এদিকে রতিকান্তবাবুর স্ত্রী প্রসবের সময় বেশী রকম অসুস্থ হয়ে পড়াতে তাঁকে দীর্ঘদিনের জন্যে বাপের বাড়ীতেই রয়ে যেতে হল। ইতিমধ্যে কাদম্বিনীর মামলার দু'বার তারিখ পড়ল এবং তাকে দু'বারই আসতে হল ও রতিকান্তবাবুর ডেরায় উঠতে হল। তারপর তৃতীয় বারে যখন কাদম্বিনী এল তখন সে রতিকান্তবাবুর ফাঁকা বাড়ীতে কায়েম হয়ে রয়ে গেল। ক্রমশঃ দেখা গেল কাদম্বিনী সন্তান-সম্ভবা। কিছু দিনের মধ্যেই সে গর্ভ নষ্ট করা হল। এইভাবে কিছুকাল কাটার পর কাদম্বিনীর আবার সন্তান-সম্ভাবনা হল। রতিকান্তবাবু তাঁর স্ত্রীকে তাঁর বাপের বাড়ী থেকে আর আনেন নি—তাঁর জায়গা পূরণ করে কাদম্বিনীই বসবাস করছিল। এবার কিন্তু কাদম্বিনী তার পেটের সন্তান নষ্ট করতে রাজী হল না। এদিকে প্রসবের সময় এগিয়ে আসছে দেখে শ্রীমান রতিকান্ত কাদম্বিনীর উপর রীতিমত অত্যাচার আরম্ভ করল, এমন কি গর্ভ নষ্ট না করলে কাদম্বিনীকে খুন করার ভয় পর্যন্ত দেখাল।

গোবিন্দপুরে তখন এক বৃদ্ধ বাঙ্গালী জজ সাহেব ছিলেন। তিনি দেবতার মত লোক ছিলেন। তাঁর স্ত্রী-ও স্বামীর উপযুক্ত সহধর্মিনী ছিলেন। সকলেই তাঁদের দুজনকে অত্যন্ত ভক্তি-শ্রদ্ধা করত। কাদম্বিনী একদিন বিকেলে তাঁদের কুঠিতে পালিয়ে গিয়ে জজ সাহেবের স্ত্রীর কাছে কেঁদে পড়ল ও তার দুর্ভাগ্যের কথা সব খুলে বলল। কাদম্বিনী যখন তার দুঃখের কথা জজ সাহেবের স্ত্রীকে জানাচ্ছিল সেই সময় জজ সাহেব কাছারী থেকে ফিরলেন। সমস্ত কথা শুনে জজ সাহেব পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট ও সিভিল সার্জেনকে ডেকে পাঠালেন এবং তাঁদের

সব কথা বুঝিয়ে দিয়ে তাঁদের যথা-কর্তব্য বলে দিলেন। সে রাত্রিটা কাদম্বিনী জজ সাহেবের কুঠিতেই কাটাল। পরের দিন সকালে কাদম্বিনীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হল এবং পুলিশ সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট সাহেব কড়া পাহারা রেখে এমন বন্দোবস্ত করলেন, যাতে রতিকান্ত বা তার তরফের কেউ কাদম্বিনীর ত্রি-সীমানায় না ঘেঁসতে পারে।

যথা সময়ে হাসপাতালে কাদম্বিনীর একটি ছেলে হল। সেখানে মাসখানেক থাকার পর কাদম্বিনী একটি আলাদা বাসা ভাড়া করে থাকতে লাগল। পুলিশ সাহেবের সহায়তায় কাদম্বিনী রতিকান্তের বিরুদ্ধে কোর্টে ফৌজদারী কার্যবিধি আইনের ৪৮৮ ধারা অনুসারে নালিশ করে তার নাবালক ছেলের খোরপোশের জন্যে মাসহারার হুকুম পেল। কিন্তু কিছুকাল বাদে দেখা গেল যে সেই মাসহারা বন্ধ হয়ে গেছে। খবর নিয়ে জানা গেল যে রতিকান্ত দেওয়ানী আদালত থেকে এক ডিক্রি পেয়েছে যাতে বলা হয়েছে যে, কাদম্বিনীর ছেলের বাপ যে কে তা জানা নেই এবং রতিকান্ত নিজে সে ছেলের বাপ ত' নয়ই। অতএব রতিকান্ত ওই নাবালকের ভরণ পোষণের জন্যে দায়ী নয়। মামলার বিবরণে প্রকাশ যে কাদম্বিনী তার মোকদ্দমা করাবার জন্যে রতিকান্তর বাড়ীতে আসে এবং নিজের অসহায় অবস্থা জানিয়ে রতিকান্তর বাড়ীতে থাকার অনুমতি পায়। রতিকান্ত সরল বিশ্বাসে তাকে বাড়ীতে থাকতে দেয়। ক্রমশঃ রতিকান্ত জানতে পারে যে কাদম্বিনী সন্তান-সম্ভবা। তখন রতিকান্ত দয়াপরবশ হয়ে কাদম্বিনীকে বাড়ীতে থাকতে দেয়। পরে সে হঠাৎ আবিষ্কার করল যে, কাদম্বিনী অত্যন্ত ঘৃণিত চরিত্রের মেয়েছেলে এবং তার চরিত্র এত খারাপ যে কোনও ভদ্রলোকের বাড়ীতে তার জায়গা হওয়া উচিত নয়। তাই রতিকান্ত কাদম্বিনীকে তাড়িয়ে দিতে বাধ্য হয়; এবং সেই রাগে কাদম্বিনী রতিকান্তের বিরুদ্ধে মিথ্যা দোষারোপ করে ফৌজদারী কোর্টে ৪৮৮ ধারার ঐ মামলাটি করে মাসহারার হুকুম পেয়েছিল।

তখন সহরে অফিসার মহলে অনেক অদল-বদল হয়ে গেছে। কাদম্বিনী পুলিশ সাহেবের কুঠিতে গিয়ে জানতে পারল যে আগেকার পুলিশ সাহেব বদলি হয়ে গেছেন ও তাঁর জায়গায় নতুন পুলিশ সুপার এসেছেন। গেটের সিপাই কাদম্বিনীকে ভিতরে ঢুকতেই দিল না। খবর নিয়ে আরও জানতে পারল যে, হাসপাতালেও পুরান সিভিল সার্জন ও ছোট ডাক্তারসাহেব

দুজনেই বদলি হয়ে গেছেন, সেখানেও নতুন ডাক্তারবাবুরা এসেছেন। এইা সব খবর নিতে নিতে বেলা গেল এবং ঠিক সন্ধ্যার আগে জজ সাহেবের কুঠিতে গিয়ে উঠল।

সেখানে এক অদ্ভুত পরিস্থিতির উদ্ভব হল। সেই ঋষিতুল্য বাঙ্গালী জজ সাহেবও বদলি হয়ে গেছেন—তাঁর জায়গায় এসেছেন খাঁটি ইংরেজ জজ সাহেব—**Mr. James**; এই **James** সাহেবের একটু পারিবারিক ইতিহাস ছিল। তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে বনিবনা হত না বলে **Mrs. James** কয়েক বৎসর যাবত ছেলেপিলে নিয়ে বিলেতেই আছেন—ভারতবর্ষে স্বামীর কাছে আসেন নি। **Mr. James** অতবড় কুঠিতে একা না থেকে তাঁর **Additional Judge Mr. Thomas**কেও তাঁর সঙ্গে থাকতে দিয়েছিলেন। **Mr. Thomas** অবিবাহিত যুবক, অতএব জজ সাহেবের কুঠিতে এবার মেয়ে মানুষের নাম গন্ধও ছিল না। এই অবস্থায় কাদম্বিনী সন্ধ্যার সময় জজ সাহেবের কুঠিতে এই দুই ইংরেজের মাঝে গিয়ে পড়ল। জজ সাহেব সমস্ত খবরাখবর শুনে কাদম্বিনীকে পরের দিন কাছারীতে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলে দিলেন।

পরের দিন কাছারীতে **Mr. James** পেশ্‌কারকে নির্দেশ দিয়ে কাদম্বিনী যাতে তাড়াতাড়ি রতিকান্তবাবুর দেওয়ানী মামলার রায়ের নকল পায় তার বন্দোবস্ত করে দিলেন এবং রতিকান্তকে ডেকে ধমকে বললেন—"আপনি যদি কাদম্বিনীর সঙ্গে তার সুবিধে মতন মিটমাট করে না নেন, তাহলে আমি নিজে কাদম্বিনীকে দিয়ে আপীল দায়ের করাব; তখন ব্যাপারটা আপনার পক্ষে মোটেই সুবিধাজনক হবে না। রতিকান্তবাবু **Mr. James**কে বলে এলেন যে, তিনি নিশ্চয়ই কাদম্বিনীর সঙ্গে মিটমাট করে নেবেন—কিন্তু আসলে তার সে রকম ইচ্ছে মোটেই ছিল না, বরং **Mr James**-এর কাছ থেকে চলে এসেই রতিকান্ত একটা দল পাকিয়ে ফেলল।

প্রথম যখন ব্যাপারটা জানাজানি হয়েছিল, তখন থেকেই রতিকান্তকে প্রায় সকলে একঘরে করে রেখেছিলেন। তারপর যখন রতিকান্ত দেওয়ানী মামলা রুজু করল, তখন সকলে আরও বেশী চটে গিয়েছিলেন। কিন্তু যখন **Mr. James** কাদম্বিনীকে দিয়ে আপীল করাবেন বলে ভয় দেখিয়েছেন একথা উকিল-লাইব্রেরীতে প্রকাশ পেল, তখন হাওয়া উল্টো বইতে সুরু করল। সেই উকিল লাইব্রেরীর মেম্বাররা প্রায় সকলেই **Mr. James**-এর

উপর চটে গিয়ে রতিকান্তবাবুকে সাহায্য করবেন বলে ঠিক করলেন। এইভাবে রতিকান্তবাবুর স্বপক্ষে একটি দল গড়ে উঠল।

এদিকে Mr. James তাঁর পেশ্‌কারকে দিয়ে কয়েকবারই কাদম্বিনীর মামলা মেটানর কথা রতিকান্তবাবুকে মনে করিয়ে দেন। কিন্তু রতিকান্তবাবু তাঁর কথা রাখল না দেখে, যে দিন কাদম্বিনীর আপীল দাখিল করবার শেষ দিন ঠিক তার আগের দিন ঐ পেশ্‌কারকে ডেকে কতকগুলি উপদেশ দিলেন এই ব্যাপারে। পেশ্‌কারটি একটু বেশী বুদ্ধি খরচ করে নিচের চিঠিখানা লিখে চাপরাশী দিয়ে রতিকান্তবাবুর কাছে উকিল লাইব্রেরীতে পাঠিয়ে দিলেন :—

"Judge Saheb (D. J.) regrets to note that you have done nothing so far. To-morrow is the last date for filing Kadambini's appeal against you. Unless you make a satisfactory settlement in the course of the day, Judge Saheb will see that the Appeal is filed in time. It will then be transferred to the file of Mr. Thomas. So please be careful."

ব্যস, আর যায় কোথা! চিঠিখানা উকিল লাইব্রেরীতে পৌঁছানমাত্র যেন বারুদের স্তূপে আগুন পড়ল। সকলে সমস্বরে বলে উঠলেন—"এর বিহিত হওয়া চাই-ই চাই।" রতিকান্তবাবু একদিন অপেক্ষা করে দেখলেন যে কাদম্বিনীর আপীলটি সময়ের মধ্যেই দাখিল হল এবং এক বেলার মধ্যেই আপীলের নম্বর পড়ে Mr. Thomas-এর এজলাসে শুনানীর জন্যে পাঠান হয়ে গেল। রতিকান্তবাবুও urgent fee দিয়ে এক বেলার মধ্যেই সব সই-মোহর নকল নিয়ে রাতারাতি কলকাতায় এসে উঠলেন। একখানা Affidavit করে Mr. James-এর পেশ্‌কারের লেখা সেই চিঠিখানা দাখিল করে কলকাতা হাইকোর্টে দরখাস্ত করে প্রার্থনা করলেন যে, এ অবস্থায় গোবিন্দপুরে সুবিচার তিনি পাবেন না, অতএব আপীলটি শুনানী ও বিচারের জন্যে অন্য জেলায় পাঠানর হুকুম দেওয়া হোক। রতিকান্তবাবু যে Affidavit করলেন তাতে অনেক কথাই বলা ছিল। তার মধ্যে এ কথাও ছিল যে কাদম্বিনীকে দিনে রাতে—এমন কি গভীর রাত্রেও—জজ সাহেবের কুঠি থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেছে। যাঁরা এসব দেখেছেন এমন দু'জনের Affidavitও দেওয়া হয়েছিল ঐ সঙ্গে। এ রকম Affidavit

পেয়ে হাইকোর্ট এক Rule জারী করে কাদম্বিনীর আপীল কেন বিচারের জন্যে অন্য জেলায় পাঠান হবে না, তার কারণ দেখাবার জন্যে কাদম্বিনী ও জজসাহেব Mr. James-এর উপর হুকুম দিলেন। পরের দিন সকালে খবরের কাগজে এই সব কেলেঙ্কারির কথা ছাপা অক্ষরে বেরিয়ে পড়ল।

আমি তখন পুরাপুরি এ্যাটর্ণি এবং আমার দাদা হাইকোর্টের Vakil. শীতকাল—ভোরবেলায় বাইরের ঘরে বসে আমরা ক'জনে চা খাচ্ছি ও খবরের কাগজ পড়ছি এমন সময় একটা ভাড়াটে গাড়ী এসে আমাদের দরজার সামনে দাঁড়াল। আমাদের এক আত্মীয় গোবিন্দপুরের পুরান উকিল। তিনি এক মলিন-বেশী বিধবাকে নিয়ে ঐ গাড়ী থেকে নেমে এলেন। তাঁর কাছ থেকেই জানা গেল যে তাঁর সঙ্গের বিধবাটিই কাদম্বিনী। তাঁর মুখ থেকেই সমস্ত ব্যাপার শোনা গেল; আরও জানা গেল যে উপস্থিত গোবিন্দপুরের ৪।৫ জন পুরান উকিল ছাড়া বাকী সব উকিলবাবুই রতিকান্তবাবুর দলে ভিড়েছেন। ঐ ৪।৫ জন প্রবীন উকিলবাবুই কাদম্বিনীকে আশ্রয় দিয়েছেন এবং তার আপীলটি চালানর ভার নিয়েছেন। আমাদের বাড়ীতে এঁদের আসা আমার দাদাকে হাইকোর্টে কাদম্বিনীর তরফে হাজির হবার জন্যে অনুরোধ করতে। বাবা ও মার অনুমতি নিয়ে কাদম্বিনীকে আমাদের বাড়ীর পরিচারিকাদের সঙ্গে থাকতে দেওয়া হল। বেচারীর জমিদারী ত তখন গেছেই, নিজের ও পেটের ছেলেটির খাওয়া-পরার জন্যে অপরের বাড়ীতে দাসীবৃত্তি করা ছাড়া অন্য কোনও উপায় ছিল না।

আমার দাদা যেদিন কাদম্বিনীর তরফে হাজির হওয়ার জন্যে High Court-এ ওকালতনামা দাখিল করলেন, তার পরদিনই সকালে হাইকোর্টে পৌঁছান মাত্র দেখতে পেলেন যে তখনকার Legal Remembrancer (সংক্ষেপে L. R.) এর এক চাপরাশী আমার দাদার নামে একখানা চিঠি হাতে দাঁড়িয়ে দাদার জন্যে অপেক্ষা করছে। চিঠি খুলে দেখা গেল যে সেদিন হাইকোর্টে টিফিনের সময়ে বিশেষ জরুরী কাজের জন্যে L. R.-এর আফিসে L. R.এর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে দাদাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়েছে। এত ভদ্রভাবে চিঠিখানা লেখা যে সে অনুরোধ এড়ান কোন ভদ্রলোকের পক্ষে সম্ভবপর নয়। তিন তলায় L. R.এর আফিসের দরজার কাছে দাদা পৌঁছান মাত্র চাপরাশী সেলাম করে জানাল

যে সাহেব দাদার জন্যই খুব ব্যস্ত হয়ে অপেক্ষা করছেন, এমনকি কার্ড পাঠাবারও প্রয়োজন নাই—কার্ড পাঠিয়ে বাইরে অপেক্ষা করা ত' দূরের কথা!

দাদা সরাসরি ভিতরে ঢুকেই দু'জন ইংরেজকে চেয়ারে বসে থাকতে দেখতে পেলেন। দাদা ঘরে ঢোকামাত্রই ইংরেজরা দু'জনেই চেয়ার ছেড়ে এগিয়ে এলেন এবং তাদের মধ্যে একজন এসে "Good afternoon, Mr. Sen" বলে দাদার হাত ধরে একখানা চেয়ারে বসিয়ে দিলেন। অন্য ভদ্র লোকটির সংগে introduce করে দেবার জন্য বললেন,—"আমার এই বন্ধুটির সংগে আপনার পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি হচ্ছেন গোবিন্দপুরের District and Sessions Judge Mr. James।" অতএব প্রথম ভদ্রলোকটি যে L. R. সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহই রইল না।

মামুলি শারীরিক কুশল জিজ্ঞাসাবাদের পর L. R. দাদাকে বললেন,—"Mr. Sen, খুব একটা গোপনীয় ও চক্ষুলজ্জাকর (delicate) ব্যাপারে আপনার সংগে পরামর্শ করতে চাই ও আপনার সহায়তা চাই। আপনিই কি অমুক মামলায় কাদম্বিনীর উকিল?" দাদা "হ্যাঁ" বলতে L. R. খোলাখুলিভাবে Mr. James-এর পারিবারিক ইতিহাস দাদাকে জানিয়ে দিয়ে বললেন যে James সাহেবের স্ত্রী বিলেতে আছেন, এবং তিনি যদি কোনও খবরের কাগজ থেকে ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেন যে Mr. James-এর নামে এই জাতীয় অপবাদ দেওয়া হয়েছে, তা হলে Mrs. James হয়ত বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা দায়ের করবেন এবং তার ফলে ইংরেজ মহলে Mr. James-এর মাথা একেবারে হেঁট হয়ে যাবে।

কথা প্রসংগে L. R. আরও জানলেন যে Mr. James অবশ্য তাঁর জবাবে রতিকান্তের সব অভিযোগই মিথ্যা বলে বলেছেন, কিন্তু Mr. Thomas নিজেকে বাঁচাবার জন্যে বোকার মত তাঁর জবাবে লিখে বসে আছেন যে, তিনি সে সময় কয়েকটি খুন ডাকাতি প্রভৃতি দায়রার মামলায় ব্যস্ত ছিলেন এবং তিনি প্রতিদিনই কোর্ট থেকে ফিরে অনেক রাত্রি পর্যন্ত সেইসব মামলার নথিপত্র দেখতেন, কারণ প্রত্যেকটি মামলাতেই তাঁর "Summing up"এর জন্যে তাঁকে তৈরী হতে হত। কাদম্বিনী যখন কুঠিতে যেত Mr. James একাই তাঁর ঘরে কাদম্বিনীর সংগে কথাবার্তা বলতেন এবং কাদম্বিনী কতক্ষণ থাকত বা তার সংগে Mr. James-এর কি কথাবার্তা হত সে সম্বন্ধে তিনি কিছুই জানেন না। L. R. আরও বললেন

যে, Hon'ble Member-এর ইচ্ছা ছিল যে Mr. James আর Mr. Thomas যেন এক সংগে বসে সরকারী উকিলবাবুর সংগে পরামর্শ করে তাঁদের জবাব লেখেন, কারণ তাতে দু'পক্ষেরই ভাল হবে ; কিন্তু Mr. Thomas তাড়াতাড়ি তাঁর জবাব দিয়ে ফেলাতে সে মৎলব ভেস্তে গেছে।

১৯৩৭ সাল থেকে আমরা প্রাদেশিক সরকারের মন্ত্রী দেখে আসছি। তার আগে শাসনের ব্যবস্থা ছিল অন্য রকমের। গভর্ণর নিজে, ৪ জন Executive Council-এর Member এবং ২ জন বা ৩ জন গভর্ণমেণ্ট মনোনীত মন্ত্রী—এঁরাই প্রদেশের শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনা করতেন। Honourable Member বলতে এই Executive Council-এর Member দিগেই বোঝাত। I. C. S.-দের মধ্যে থেকে আবার সবচেয়ে পুরান লোকই ঐ Executive Council-এর Member হতেন। যে Hon'ble Member-এর কথা L. R. বললেন তিনি একজন অতি পুরান I. C. S. Officer ছিলেন। দাদা তখন L. R. কে জিজ্ঞাসা করলেন—"Hon'ble Member নিজে যখন এ ব্যাপারে এতটা interest নিচ্ছেন, তখন দরকার হলে Government-এর কোন Order কি এ ব্যাপারে তাড়াতাড়ি পাওয়া সম্ভব ?" L. R. জিজ্ঞাসা করলেন—"কি জাতীয় Order চান, বলুন।" দাদা বললেন,—"ব্যাপার সব থেকে সহজ হয়ে যায় যদি Mr. James ও Mr. Thomas দুজনকেই তাড়াতাড়ি ঐ জেলা থেকে বদলী করে দেওয়া যায়।" L. R. দাদার প্রস্তাব শোনা মাত্র টেবিল চাপড়ে বলে উঠলেন,—"এ ত অতি সহজ কথা। আশা করি এর বন্দোবস্ত করতে কিছুমাত্র বেগ পেতে হবে না। অশেষ ধন্যবাদ Mr. Sen. মনে হয় আপনার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছি।" Mr. James এতক্ষণে মুখ খুললেন,—বলে উঠলেন,—"আমি অবশ্য মাত্র কয়েক মাস এ জেলায় এসেছি,—কিন্তু এরই মধ্যে "I find the place quite hot for me". L. R. সংগে সংগে নিজের Telephone তুলে Hon'ble Member-এর সংগে কথাবার্তা কইলেন, এবং তখনই ঠিক হয়ে গেল যে, এই দু'জন Officer-কে বিনা দেরীতে গোবিন্দপুর থেকে বদলি করে দেওয়া হবে।

এমনি যোগাযোগ হয়ে গেল যে, রতিকান্তর দরখাস্তটির হাইকোর্টে শুনানীর দিন পড়ল বুধবারে। তখন বুধবার সকালে Calcutta Gazette বের হত। বুধবার ভোরবেলা By Special Messenger এক Copy

Calcutta Gazette আমাদের বাড়ীতে দাদার নামে এসে গেল। সেটা খুলতেই দেখা গেল Mr. Jamesকে "with immediate effect" আসামে Sylhet ও Cacharএর জেলা জজ নিযুক্ত করে বদলীর হুকুম দেওয়া হয়ে গেছে, আর Mr. Thomasকেও সেইভাবেই কলকাতায় কোন অস্থায়ী পদে বদলী করা হয়েছে। সেদিন হাইকোর্টে রতিকান্তর মামলাটির ডাক হতে দাদা উঠে দাঁড়িয়ে সেদিনকার Calcutta Gazette-খানি দাখিল করে নিবেদন করলেন যে, যাঁদের নিয়ে গোলমাল তাঁরা দুজনেই যখন গোবিন্দপুর থেকে বদলি হয়ে গেলেন তখন আর এ মামলায় বর্ণিত বিষয়গুলির সত্যাসত্য বিচারের কোনই প্রয়োজন নাই; দরখাস্তকারী যা চেয়েছিলেন কার্যতঃ তা পেয়ে গেছেন। দাদার এ যুক্তি হাইকোর্ট সমর্থন করলেন। ফলে Rule discharged হয়ে গেল; এবং Mr. James ও Mr. Thomas-এর মান ইজ্জৎ অক্ষুণ্ণ রয়ে গেল। রতিকান্তর দরখাস্তে বর্ণিত ঘটনাগুলি সত্য কি মিথ্যা সে সম্বন্ধে যখন কোন বিচার এমন কি আলোচনাই হল না, তখন সেগুলির সম্বন্ধেও খবরের কাগজে আর কিছু বেরুল না। তার ফলে Mr. Jamesও সম্ভাব্য Divorce Suit থেকে রক্ষা পেলেন। এই হচ্ছে আদত ইংরেজজাতির স্বজাতি প্রীতির নমুনা।

প্রশ্নটা আপনা থেকেই ওঠে যে, যদি Mr. James ও Mr. Thomas ইংরেজ না হয়ে 'কালা আদমি' হতেন তবে ইংরেজ L. R. ও ঝানু ইংরেজ আই. সি. এস. 'Hon'ble Member' কি এ বিষয়ে এতটা মনযোগী বা তৎপর হতেন?

কিন্তু সত্যের খাতিরে এটা স্বীকার করতেই হবে যে যেখানে ইংরেজদের ব্যবসা বা তাদের রাজত্ব বা তাদের স্বজাতির স্বার্থ সংশ্লিষ্ট না থাকত—এক কথায় বলতে গেলে যেখানে তাদের ব্যক্তিগত বা জাতিগত স্বার্থে আঘাত না লাগত—সেখানে ইংরেজজাত সাধারণতঃ সত্যবাদী ও সুবিবেচক ছিল। তাদের কাজকর্মের মধ্যে দেখা যেত যে তারা সাধারণতঃ সুরসিক ও কৌতুকপ্রিয় হত। আইন-আদালতে দেখা গেছে যে "British Justice" কথাটা উপরের কটি বিষয় ছাড়া প্রায় সম্পূর্ণ সত্যি। কোন মামলা মোকদ্দমার মধ্যে বুদ্ধি খেলিয়ে একটু রসিকতার অবতারণা করতে পারলে প্রায় সব ক্ষেত্রেই অতি সহজে ভাল ফল পাওয়া যেত। নিচে দেওয়া

ঘটনাটি তার এক বিশিষ্ট উদাহরণ বলা যেতে পারে। ব্যাপারটি সম্পূর্ণ সত্যি কেবল নামগুলি এবারেও ছদ্মনাম।

বিহারের এক রাজার বাসনা হল যে তাঁর নিজের খুব বড় একখানা তৈলচিত্র কোন বিখ্যাত চিত্রশিল্পীকে দিয়ে করাবেন। তাঁর রাজত্ব বিম্বাগড়ে বা কাছাকাছি মনোমত কোন চিত্রশিল্পী না পাওয়ায় কলকাতার এক বিখ্যাত শিল্পীকে সে কাজের ভার দিলেন। স্থির হল :—(১) তিন মাসের মধ্যে ছবি এঁকে দিতে হবে। (২) যে ফটোখানি থেকে এই তৈল চিত্রটি তৈরী করতে হবে সেটি রাজা সাহেবের এক পুরান ফটো। তাতে রাজা সাহেব আছেন ৮ হাত ধুতি পরে, মালকোচা মেরে, গায়ে একটি ফতুয়া চড়িয়ে, মাথায় এক বিশাল পাগড়ী এঁটে, নাগরাই জুতো পরে এবং ছোট্ট একটি ঘোড়ায় চড়ে। রাজা সাহেবের বাহনটি ঘোড়া কি গাধা কি ছাগল ঠিক বোঝা যায় না। (৩) নতুন তৈলচিত্রে করতে হবে—রাজা সাহেব ব্রীচেস পরে, মহারাজোচিত পাগড়ী মাথায় দিয়ে, 'রাজা' খেতাবের যতগুলি মেডাল আছে সবগুলি লাগিয়ে, কোমরে তরোয়াল ঝুলিয়ে, কাল যুদ্ধের ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছেন। (৪) কিন্তু রাজা সাহেব তাঁর রাজত্ব ছেড়ে কলকাতায় এসে তাঁর নতুন ছবির জন্যে Sitting দিতে পারবেন না। একদিন কি দু'দিন মাত্র মোটরে চড়ে সিল্কের পাঞ্জাবী পরে কলকাতায় যখন বেড়াতে বের হবেন তখন শিল্পীর Studi -তে ১০।১৫ মিনিটের জন্যে বসে যাবেন। (৫) ছবিটি এঁকে দিলে রাজা সাহেব কলকাতায় এসে ১৫,০০০৲ টাকা পারিশ্রমিক দিয়ে নিজের খরচায় ছবিটি নিয়ে যাবেন।

এই বাঙ্গালী শিল্পী ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী হিসেবে বিখ্যাত ছিলেন ত' বটেই—তাছাড়াও তাঁর আঁকা ছবি পৃথিবীর অনেক বড় বড় Art Exhibition-এ উচ্চ প্রশংসা ও পুরস্কার পেয়েছে। তিনি ওই সামান্য উপকরণ থেকে চমৎকার একখানা ছবি এঁকে দিলেন। মুখের চেহারা, সমস্ত দেহের গড়ন, গায়ের রং সবই রাজাসাহেবের সঙ্গে মিলে যাচ্ছিল, এ ছাড়া রাজাসাহেব যা চেয়েছিলেন হুবহু সেই জিনিসই করে দিয়েছিলেন। পোষাক-পরিচ্ছদ যোদ্ধাবেশে মহারাজের উপযুক্ত ; পাগড়ীর মাথায় সবুজ পাথর ঝক্ ঝক্ করছে—তরোয়াল ঝুলিয়ে অতি সুন্দর এক তেজী কাল ঘোড়ায় চড়ে বীরবেশে রাজাসাহেব যেন কোন এক নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছেন।

ছবিখানি শেষ হবার খবর পেয়ে রাজাসাহেব আর শিল্পীর সঙ্গে দেখা করলেন না। তাঁর কর্মচারীরা ২।১ জন এসে দেখে বলে গেল যে ছবি ঠিক হয় নি, ও ছবি রাজাসাহেব নেবেন না এবং পারিশ্রমিক স্বরূপ একটি পয়সাও দেবেন না।

শিল্পী নিরুপায় হয়ে তাঁর এ্যাটর্ণিকে দিয়ে তাঁর পারিশ্রমিক ১৫০০০৲ টাকা দাবী করে নোটিশ দিলেন। রাজাসাহেবের এ্যাটর্ণি পাল্টা জবাব দিলেন। এই রকমের দু' একখানা পত্রাঘাতের পর শিল্পী কলকাতা হাইকোর্টে ১৫০০০৲ দাবী করে এক মামলা রুজু করলেন। যথাসময়ে মামলার শুনানীর দিন এসে পড়ল। দেখা গেল যে এক সুরসিক ইংরেজ ব্যারিষ্টার-জজের ঘরে মামলাটি উঠেছে। শিল্পীর কৌঁসুলী এক বিচক্ষণ বাঙ্গালী ব্যারিষ্টার ছিলেন। তিনি আজ আর ইহজগতে নেই। তাঁর মতন রসিক ও দূরদর্শী ব্যারিষ্টার সচরাচর দেখা যায় না। তিনি কাগজপত্র দেখেই শিল্পীকে ও তাঁর এ্যাটর্ণিকে বললেন— "যাও, তোমাদের আর কিছু করতে হবে না।" শিল্পীর ইচ্ছা ছিল যে, রাজা সাহেবের তরফ থেকে জবাবে যে সব কথা বলা হয়েছে সেগুলি যে নির্জলা মিথ্যাকথা সেটা কৌঁসুলী সাহেবকে একটু বুঝিয়ে দেন। কিন্তু কৌঁসুলী-সাহেব, শিল্পী ওরকম চেষ্টা করতেই এক রকম রাগ করেই তাঁদের বললেন,—"আমায় বাপু নিজের কাজ-কর্ম করতে দাও। তোমাদের একটা মামলা নিয়ে থাকলেই ত আমার চলবে না। খালি দেখো যে পুরান ছোট ফটোগ্রাফটি এবং যে ছবিখানি তুমি এঁকেছ—এই দুটিই যেন ঠিক সময়ে মামলার শুনানীর আগেই কোর্টে পৌঁছায়।" এই বলে এঁদের যেন তাঁর ঘর থেকে তাড়িয়ে দিলেন।

পরদিন সকালে যখন মামলা ডাক হল হাইকোর্টে, উভয় পক্ষেরই বড় বড় কৌঁসুলী এ্যাটর্ণি সব হাজির হলেন। রাজা সাহেবও সিল্কের পোষাক পরে, হীরা-জহরতে সেজেগুজে, ফোঁটা-তিলক কেটে আদালতে হাজির। জজ সাহেব শিল্পীর কৌঁসুলীকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলেন— "Now Mr......., what is your case?" কৌঁসুলী সাহেব হাসতে হাসতে শিল্পীকে দেখিয়ে বললেন—"My Lord! This client of mine is a big criminal and his suit ought to be dismissed." অর্থাৎ— "আমার এই মক্কেলটি মস্ত বড় অপরাধী, এবং তার মামলা ডিস্‌মিস্‌ হওয়া

উচিত।" জজ সাহেব তখনই বুঝে নিলেন যে এই শ্লেষোক্তির বিশেষ কোন গূঢ় মানে আছে। তিনিও হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলেন—"Tell me, what has your client done and why his suit should be dismissed." তখন কৌঁসুলী সাহেব খুব গম্ভীর হয়ে ছোট ফটোখানা ও শিল্পীর আঁকা তৈলচিত্রটি জজ সাহেবকে দেখিয়ে জোরের সংগে বলে উঠলেন—"My client had no right to convert that Durwan in a loin cloth into this Maharaja in breeches and jewels and that Bimbagarh goat into this black charger."—অর্থাৎ 'এই লেঙ্গুটি-পরা দারওয়ানটাকে মণিমুক্তা-শোভিত এবং ব্রীচেস পরিহিত মহারাজা বানিয়ে তোলবার এবং এই বিম্বাগড়ের রামছাগলটাকে কাল যুদ্ধের ঘোড়া বানিয়ে দেওয়ার কোন অধিকারই আমার মক্কেলের ছিল না।' তিনি আরও বললেন—"আমার মক্কেল পারিশ্রমিক হিসেবে কোন পয়সাই পেতে পারে না। উল্টে দারওয়ানকে মহারাজা সাজিয়ে যে মানহানি করেছে তার জন্যে (রাজা সাহেবকে দেখিয়ে) এই দারওয়ানকে আমার মক্কেল ক্ষতি-পূরণ দিতে বাধ্য। জজ সাহেব ত প্রথমটা হো হো করে হেসে গড়িয়ে গেলেন। সে মামলার যে সামান্য কাগজপত্র ছিল তা দু'মিনিটে দেখে নিয়ে জজ সাহেব রাজা সাহেবের কৌঁসুলীকে হাসতে হাসতে বললেন—"Mr......এর কথা ত শুনলেন। এখন কত টাকা দিয়ে এই Criminal of an Artist কে বিদায় করতে রাজী আছেন?" বলা বাহুল্য, এই মামলা মিটে পুরো টাকায় ডিক্রি হতে পাঁচ মিনিটও লাগল না—সাক্ষী-সাবুদের কোন প্রয়োজনই হোল না।

৪

॥ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ের কয়েকটি ঘটনা ॥

প্রাপ্তবয়স্ক পাঠক-পাঠিকাদের নিশ্চয় মনে আছে যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যখন পূর্বরণাঙ্গনে জ্বলে উঠল তখন আমেরিকা কতকটা বাধ্য হয়েই যুদ্ধে নামল। তার আগে থেকেই আমেরিকা অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ ইত্যাদি মিত্রপক্ষকে যুগিয়ে আসছিল। অবিশ্যি তার জন্যে মিত্রপক্ষকে যথোচিত মূল্য দিতে হয়েছিল। কি ভাবে সে পয়সা দেওয়া হবে সে সম্বন্ধে যে চুক্তি হয়েছিল সেটা **"Lease and Lend" Scheme**-এর অন্তর্ভুক্ত তাও অনেকেই জানেন।

কিন্তু সব ভালরই একটা মন্দ দিক আছে। সেই দিকের কথাই এবার বলছি। সে সময় বে-সামরিক আমেরিকানদের পূর্বদেশে যাতায়াতের জন্যে **"Chinese National Aviation Corporation"**—বা সংক্ষেপে **"CNAC"**—বলে একটি প্রতিষ্ঠান চীন দেশে গড়ে উঠেছিল। তারা সাধারণতঃ এয়ারোপ্লেনে যাত্রী ও মাল নিয়ে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় যেত। **'CNAC'**র প্লেন-গুলির **Pilot** ও অন্যান্য **Crew** অধিকাংশই ছিল আমেরিকান। তারা যে সব পোষাক পরত, সে সব ছিল হুবহু আমেরিকান সৈন্যদের পোষাকের মত। আমেরিকান অফিসারদের টুপিতে, কাঁধের ওপর, জামায় কি বোতামে যে সব পদ-নির্দেশক চিহ্ন থাকতো **'CNAC'**র অফিসাররাও ঠিক সেই সব চিহ্ন ব্যবহার করত,—এবং নিজেদের সমভাবেই **'Lieutenant', 'Captain'** ইত্যাদি বলে পরিচয় দিত।

প্রথম প্রথম **'CNAC'**র প্লেন দমদম বিমান-ঘাঁটিতে এসে নামলে ভারতীয় **Customs**-বিভাগের অফিসাররা ওদের ধারে এগোতে ভরসা পেতেন না। একবার একজন **Customs Officer** ভদ্রভাবে এক **'CNAC'**-এর **Officer**কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—**"Have you anything to declare?"** অমনি সেই আমেরিকান পুঙ্গব তার **Yankee**-উচ্চারণে—**"How dare**

you touch military stores ?"—বলে তার Rifle নিয়ে তেড়ে এসেছিল। এই 'CNAC'র দল প্রথম কয়েক মাস Customs এবং পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে নানাজাতীয় মাল এনে কলকাতা সহরে বিক্রী করে গেছে। Rifle, Revolver থেকে Jam, Jelly, Powdered milk, cheese, মদ, সিগারেট প্রভৃতি কিছুই বাদ দেয় নি—যদিও সেই সব জিনিষের প্যাকেটের উপর ছাপার অক্ষরে লেখা থাকত যে সে সব জিনিষপত্র কেবল মাত্র সৈন্য বিভাগের ব্যবহারের জন্য,—সাধারণের অর্থাৎ বেসামরিকদের জন্য নয়।

গত লড়াইয়ের সময় Military Stores Ordinance নামে এক আইন বলবৎ ছিল। পুলিশ ও Military এক সময় অনেকগুলি করে এই রকম ছাপওয়ালা রসদ, মদের বাক্স, সিগারেট প্রভৃতি ধরে যাদের কাছে সেই সব মাল পাওয়া গিয়েছিল, তাদিকে বিচারের জন্যে চালান দিয়েছিল। সে সব মামলার মধ্যে কতকগুলি হাইকোর্ট দায়রায় পর্যন্ত পাঠান হয়েছিল। সব মামলার আসামীরই একই উক্তি ছিল:—"এসব মাল 'CNAC'র কাছে প্রচুর পাওয়া যায়, এবং তারাই কলকাতার বাজারে এসব মাল চালিয়ে থাকে।"

এই 'CNAC'র আমেরিকান অফিসারদের কলকাতায় গুটি কতক আড্ডা ছিল, যদিও তারা প্লেনের সংগেই আসত যেত এবং ২।৩ দিনের বেশী এক সংগে কেউ থাকত না। তারা প্রথমে একটু সাবধান থাকলেও পরে বেপরওয়া হয়ে উঠেছিল। ঐ রকম একটি আড্ডার কথাই এবার বলছি। নামের বেলায় কেবলমাত্র ছদ্মনাম ব্যবহার করেছি।

Dalhousie Square ও Esplanade-এর মাঝামাঝি এক জায়গায় এক বড় বাড়ীতে অনেকগুলি Office আর Flat আছে। তার একটি বড় furnished flat-এ এক বাঙ্গালী ভদ্রলোক বিশ্বনাথবাবুর আফিস ছিল। তাঁর অনেক রকমের কারবার ছিল। তাঁর ফ্ল্যাটেও অনেকগুলি কামরা। একটিতে দস্তুরমত আফিস, তাতে মায় Stenographer পর্যন্ত সব মজুত; অপর একটি কামরা একটি well-furnished drawing room; এ ছাড়াও ভিতরে কয়েকটি furnished bed room ছিল, যাতে ৩।৪ জন অতিথি এক সংগে এলেও তাদের সেখানে রাত্রি-বাসের কোনও রকম অসুবিধাই হত না। ঐ সব শোবার ঘরে, বসবার ঘরে এবং Pantry অর্থাৎ ভাঁড়ার ঘরে 'CNAC'র কৃপায় সব সময়েই "কেবলমাত্র সামরিক বিভাগের জন্য"-লেবেল

যারা প্রচুর মাল মজুত থাকত। আফিস-ঘরে বিশ্বনাথবাবু খুব কমই থাকতেন—তিনি প্রায় বাইরে বাইরেই ঘুরতেন। আফিসে থাকত তাঁর **Secretary, Clerk, Typist, Office boy** ইত্যাদি। **Drawing room**-এ 'CNAC'র দু'চারজন আমেরিকান অফিসার প্রায় সব সময়েই থাকতেন।

সে সময়কার কলকাতার অবস্থা মনে পড়িয়ে দিলে বোধহয় অন্যায় হবে না। যাঁরা ১৯৪১ সালের গড়ের মাঠের চেহারা দেখেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে আজকের গড়ের মাঠের সঙ্গে তার অনেক জায়গায় মিল নেই। আগে **Red Road**-এর দু'ধারে বিরাট টকটকে লাল রঙের ফুলে ভরা **Gold Mohur** গাছ ছিল অনেকটা "কৃষ্ণচূড়া" গাছের মত দেখতে। দুধারের গাছগুলি বেশ বড় বড় ছিল এবং হাওয়ায় গাছের মাথায় ফুটে থাকা অজস্র লাল ফুল ঝরে গোটা রাস্তাটিকে লাল পাপড়িতে ঢেকে রাখত। সেই জন্যেই এর নাম ছিল—**Red Road**;—রাস্তাটিতে তখন লাল সুরকি বিছান ছিল বলে নয়। পূর্বাঞ্চলে লড়াই লাগার সঙ্গে সঙ্গেই কলকাতায় এবং উত্তর ভারতের অনেক জায়গায় ছোট বড় সামরিক বিমান-ঘাঁটি "দ্যাখ্ দ্যাখ্' করে গজিয়ে উঠল। সান্ধ্য-বায়ু সেবন ও নৈশ-বিহারের মনোরম স্থান **Red Road**-এর গাছপালা সব কেটে ফেলে সে জায়গাটাকে এক বিরাট '**Runaway**'তে পরিবর্তিত করা হয়ে গেল। ময়দানে ফোর্টের কাছাকাছি অনেকটা জায়গা জুড়ে **aeroplane** ও **armoured car** রাখা হল। ১৯৪২ সাল থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত যাঁরা গড়ের মাঠের ভিতর দিয়ে খিদিরপুরের ট্রামে চড়ে গেছেন তাঁরা কখনই ভুলতে পারেন না যে, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড (কর্পোরেশন ষ্ট্রীট)-এর মোড় থেকে ট্রাম যখন ময়দানের মধ্যে ঢুকতো, তখন থেকে সেই ট্রাম যতক্ষণ না রেস-কোর্স ছাড়িয়ে খিদিরপুর ব্রিজ-এর উপর উঠত, ততক্ষণ কি রকম বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করত। অনেকে ত' প্রকাশ্যেই "দুর্গা"—নাম জপ করতেন। ও দিকটার দিকে তাকিয়েই আতঙ্কের সঙ্গে মনে হ'ত—'কিসের মধ্যে ঢুকছিরে বাবা? ভালয় ভালয় জায়গাটা পেরোতে পারলে বাঁচি!' এ ছাড়া ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল-এর উত্তরে বিরাট জায়গা জুড়ে এক মোটর-পুল ছিল। সেখানে 'U. S. A'-মার্কা শ্যাওলা রঙের হাজার হাজার মোটর ট্রাক ও লরী দাঁড়িয়ে থাকত। সমস্ত জায়গাটা

ফোর্টের শামিল 'Protected Area' ছিল এবং কোন বেসামরিক লোকজনের সেখানে ঢোকার অধিকার ছিল না।

একদিন ঐ Military Pool-এর 'U.S.A.' মার্কা একটি Lorry এসে বিশ্বনাথবাবুর অফিসের নিচে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি কুলি আমেরিকান মিলিটারী ডিপার্টমেন্ট-এর নানা রকম ছাপমারা বড় বড় বাক্স নামিয়ে একেবারে বিশ্বনাথবাবুর Flat-এর শোবার ঘরে, বসবার ঘরে এবং অন্যান্য জায়গায় তুলে দিলে। লরিটি চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই Major Morris নামে আমেরিকান মিলিটারী পুলিশ-এর একজন বড় অফিসার, কলকাতার হেয়ার স্ট্রীট থানার ইন্সপেক্টর ও অন্যান্য সামরিক ও অসামরিক অফিসার নিয়ে বিশ্বনাথবাবুর ঐ Flat-এ চড়াও হলেন। সে সময় 'C N A C'র একজন অফিসার Captain Garthও বিশ্বনাথবাবুর Drawing Room-এ বসে ছিলেন। মিলিটারী ও সিভিল পুলিশ-এর দল বিশ্বনাথবাবুকে ও Captain Garthকে গ্রেপ্তার করলেন এবং সমস্ত মিলিটারী-মার্কা দেওয়া মাল ধরে নিয়ে গেলেন। যে 'U. S. A.' মার্কা লরি থেকে অল্পক্ষণ আগে শেষের কিস্তির মাল নামান হয়েছিল, সেই লরির নম্বর নিয়ে তার ড্রাইভারকে খুঁজে বের করে তার নির্দেশমত এক Lieutenant rank-এর বাচ্ছা মিলিটারী Officerকেও গ্রেপ্তার করা হল। ঘটনার দিন সকালে এবং তার কয়েকদিন আগে থেকে খিদিরপুর ডকে একখানি আমেরিকান জাহাজ থেকে Lease and Lend Scheme-এর বহু লক্ষ টাকা দামের Stores and Provisions নামান হচ্ছিল। এই মালগুলি নামিয়ে আমেরিকান মিলিটারী পুল-এর লরিতে চাপিয়ে ওদের গুদামে পাঠান হচ্ছিল। বাচ্ছা Lieutenantটি ঘটনার দিন সকালে সেই আমেরিকান জাহাজের Gangwayতে দাঁড়িয়ে লরিগুলিকে নির্দেশ দিচ্ছিল, কোন্ মাল কোথায় যাবে। তারই নির্দেশমত এই লরিখানা মাল নিয়ে বিশ্বনাথবাবুর অফিসের সামনে এসে সেইখানে অসামরিক লোকের কাছে মালগুলি খালাস করে দিয়েছিল, অর্থাৎ Lease and Lend Schemeএ সামরিক কাজের জন্যে আনা মাল গোপনে অসামরিক কাজের জন্যে বেআইনীভাবে পাচার করেছিল। এই অপরাধে ঐ Lieutenantকে গ্রেপ্তার করা হল।

গ্রেপ্তারের পর বিশ্বনাথবাবু, Captain Garth এবং ঐ বাচ্ছা

Lieutenant-টিকে যখন কলকাতার চিফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট-এর কাছে হাজির করা হল, তখন আমেরিকান মিলিটারী পুলিশ-এর অফিসার Major Morris এই বলে এক দরখাস্ত কোর্টে পেশ করলেন যে, ঐ ছোকরা Lieutenant-টি সামরিক ব্যক্তি, এবং যুদ্ধ চলার সময় সামরিক ব্যক্তিকে অসামরিক আদালতে বিচার না করে সামরিক আদালতে বিচারের জন্যে পাঠান হোক। বলা বাহুল্য যে এ প্রার্থনা তখনই মঞ্জুর হয়ে গেল। Major Morris তখনই সেই Lieutenant-টিকে নিয়ে চলে গেলেন। বিশ্বনাথবাবু ও Captain Garth-এর মামলা কলকাতা পুলিশ কোর্টেই রইল। যথা সময়ে মিলিটারী স্টোর্স অর্ডিন্যান্স মতে মামলা চল্‌ল। প্রধান সাক্ষী হল সেই Lieutenant-টি। তার জবানবন্দীতে প্রকাশ পেল যে চৌরঙ্গী ও থিয়েটার রোডের মোড়ে তখন একটি রেস্তোরাঁ ছিল। 'C N A C'র দল সেখানে আসত। দু চারজন ভারতীয়ও থাকত সেখানে। আমেরিকান মিলিটারী অফিসার-রাও সেখানে খানা-পিনার জন্যে আসত। সেই রেস্তোরাঁতে কোন এক দালাল মারফৎ সেই বাচ্ছা Lieutenant-টির Captain Garth ও বিশ্বনাথবাবুর সঙ্গে আলাপ হয়, এবং সেখানেই বন্দোবস্ত হয়ে যায় যে, কিছু টাকার বিনিময়ে সে এক লরি মাল বিশ্বনাথবাবুর অফিসে পাঠিয়ে দেবে, কারণ সে যেদিন ডিউটিতে থাকবে মালের গতিবিধি সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া সম্পূর্ণ তার হাতেই থাকবে। সেই বন্দোবস্ত অনুসারে ঘটনার দিন সকালে সে বিশ্বনাথবাবুর কাছ থেকে টাকাও পেয়েছিল এবং এক লরি মালও বিশ্বনাথবাবুর অফিসে পৌঁছে দেবার নির্দেশ লরি-ড্রাইভারকে দিয়েছিল। "Ship's General Manifest" নামে প্রতি জাহাজে একখানি ডকুমেন্ট বা কাগজ থাকে। প্রতি জাহাজে কি কি মাল আসছে সব জিনিষের এক তালিকা ঐ Manifest-এ লেখা থাকে। Lieutenant-টি তাদের জাহাজের Manifest দেখিয়ে বিশ্বনাথবাবুর অফিসে ধরা মালের সঙ্গে দফা দফা মিলিয়ে প্রমাণ করে দিল যে, ঐ মালই সে জাহাজ থেকে পাচার করে বিশ্বনাথবাবুর অফিসে পৌঁছে দিয়েছে। অতএব 'C N A C'র কাছ থেকে যে ঐ মাল এসে থাকতে পারে এ জবাবের বা সন্দেহের কোন রাস্তাই আর খোলা রইল না। ফলে বিশ্বনাথবাবু ও Captain Garth দুজনেরই জেল হয়ে গেল।

ধরা পড়া মালগুলি কিন্তু আমেরিকা মিলিটারী পুলিশ-এর তরফ থেকে Major Morris আদালতের হুকুম নিয়ে উঠিয়ে নিয়ে গেলেন।

British Military Police-এর তরফ থেকে Major Graham বলে এক উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারী সামরিক মামলার তদন্ত করতেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম যে ঐ মাল ত British Government আমেরিকান গভর্নমেন্ট-এর কাছ থেকে Lease and Lend Scheme-এ কিনে নিয়েছেন, তবে ঐ মালগুলি ব্রিটিশ মিলিটারীর তরফ থেকে Major Graham না নিয়ে Major Morris কেন নিয়ে যাচ্ছেন? Major Graham-এর ভাব দেখে মনে হল যে Major Morris-এর কথার উপর Major Graham-এর কথা বলার কোন অধিকারই নাই; এই যুদ্ধের ব্যাপারে আমেরিকানদের কাছে 'British Lion' একেবারে জুজুটি সেজে রয়েছেন! ঐ মালগুলি Major Morris নিয়ে গেলেও ভারতের রাজস্ব থেকেই ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট তার দাম Lease and Lend Scheme-এ আমেরিকাকে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

আগেই বলেছি যে ভারতীয় বিশ্বনাথবাবু ও বেসামরিক আমেরিকান Garth দুজনেরই জেল হয়ে গেল। সামরিক আমেরিকান সেই Lieutenant-টির Court Martial হয়ে সাজা হল—Repatriation and loss of rank and franchise—অর্থাৎ তাকে দেশে ফেরত পাঠান হল, সামরিক চাকরী থেকে তাকে বরখাস্ত করা হল এবং হুকুম দেওয়া হল যে সাত বৎসর পর্যন্ত সে আমেরিকার কোন Election-এ ভোট দিতে পারবে না। বিশ্বনাথ বাবুর কাছ থেকে যে টাকা সে পেয়েছিল সে টাকা সে Bank-এ রেখেছিল। সে টাকাও তাকে তার Bank থেকে তুলে তাদের Military Department-এর কাছে দিতে হল,—এবং তা বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল।

যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হল, তখন ইংলণ্ডে Defence of the Realm Act নামে এক নতুন আইন তৈরী ও চালু করা হয়েছিল। এই আইনের নামের প্রথম অক্ষর কটি নিয়ে চলতি ভাষায় একে "DORA" বলা হত। ভারতবর্ষেও ঠিক সেই রকম আইন Defence of India Act এবং Defence of India Rules চালু করা হয়েছিল। এই আইনগুলির উদ্দেশ্য ছিল লোকের সাধারণ কাজকর্মের অধিকার ও চালচলন অনেক বিষয়ে খর্ব করা। তার কারণ ছিল এই যে সাধারণ অবস্থায় শান্তির সময়

এমন অনেক কাজ করা হয় যে সব কাজ লড়াই চলার সময় করতে দিলে লড়াই চালান বা দেশরক্ষা করা প্রভৃতি বিষয়ে অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারে। একটি উদাহরণ দিচ্ছি—সাধারণত ডাকঘরের মারফত যে সব চিঠিপত্র আদান প্রদান হয়, সেগুলি খোলার অধিকার কারও নাই। পাছে কোন চিঠিতে এমন কোন খবর থাকে যা শত্রু বা তাদের গুপ্তচরের হাতে পড়লে তাদের সহায়তা হতে পারে, সেজন্যে অনেককিছু খবরকেই **Information likely to assist the enemy** বলা হয়েছিল এবং ঐ জাতীয় খবরাখবর চিঠিতে লেখা আইন-বিরুদ্ধ বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। লোকে আইন মেনে চলে কিনা সেটা দেখবার জন্যে ডাকের চিঠিপত্র খুলে দেখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। একবার এক সামরিক অফিসার কলকাতা থেকে হিমালয়ের উত্তর-পশ্চিম দিকে কোন একটি সেনানিবাসে বদলি হয়েছিল। তার কলকাতায় এক প্রণয়িনী ছিল। মনে হয় কলকাতা ছেড়ে যাবার সময় তার প্রণয়িনীকে প্রতিশ্রুতি দিতে হয়েছিল যে সে নিয়মিতভাবে চিঠিপত্র লিখবে। সেই অঙ্গীকার মত চিঠিপত্র না পেয়ে শ্রীমতীর অভিমান হয়েছিল। সেই মান ভঞ্জন করতে গিয়ে বেচারাকে যে কৈফিয়ৎ দিতে হয়েছিল তাতে লিখে জানাতে হয়েছিল যে,—"চারদিকে বরফ পড়ছে। তার মধ্যেও দিনে আঠার ঘণ্টা খালি খোলা জায়গায় থাকতে হয়।···খোলা হাওয়ায় রোজ অতক্ষণ থাকতে হওয়ার প্রধান কারণ, এতগুলি **Anti-Aircraft gun,** এতগুলি **Bomber** আছে সেগুলির তদারক করতে হয়, তাছাড়া এতগুলি **Plane** আসে তাদেরও তদ্বির প্রয়োজন। এই সব করে সময় আর প্রায় থাকে না···" ইত্যাদি; কলকাতা **G. P. O.**-তে যখন চিঠি এল, তখন সেটি খোলা হয়েছিল। লেখকের সন্ধান করা হল, এবং **Handwriting Expert**-কে দিয়ে তার হাতের লেখার সংগে ঐ চিঠি মেলান হল। তারপর **for communicating information likely to assist the enemy** অর্থাৎ শত্রুপক্ষের সাহায্য হতে পারে এমন সংবাদ পাঠানর অপরাধে মামলা রুজু হল। সে মামলায় বেচারার জেল হয়ে গেল। খালি জেলেই শেষ নয়—বেচারার চাকরিটিও গেল। শ্রীমতী অফিসারটির বিবাহিতা স্ত্রী হলে এত কৈফিয়তের দরকার হত না বলে মনে হয়। "কাজের চাপে সময় পাই না"—লিখলেই বোধহয় যথেষ্ট হত এবং সে চিঠির জবাবে স্ত্রী সম্ভবত স্বামীকে লিখতেন,—"আমাকে চিঠি লেখবার জন্যে তোমার নিজের

অসুবিধা বা শরীর খারাপ করো না। তুমি সুস্থ থেকে নিজের কাজকর্ম করে যাও, এই প্রার্থনা করি। তবে মাঝে মাঝে তোমার খবর না পেলে বড়ই দুশ্চিন্তায় থাকি, এটা মনে রেখে মধ্যে মধ্যে একটা পোস্ট কার্ডে শুধু কেমন আছ এটুকু দুলাইনে লিখে ডাকে ফেলে দিও, তাহলেই যথেষ্ট মনে করব।" বা ঐ জাতীয় কিছু।

এই সূত্রে আমার ছোটবেলায় জানা এক ভদ্রমহিলার কথা মনে পড়ল। তাঁদের অবস্থা ছিল খুবই খারাপ, বাড়িতে খরচ চলে না। বুড়ো শ্বশুর শ্বাশুড়ীকে খাওয়াতে পরাতে হয়—স্বামী চাকরী করতে বিদেশে গেছে, সেখানে সে বেচারা কোনও মতে নিজের দুবেলা খাবার খরচটা রেখে মাইনের বাকীটা প্রতি মাসে স্ত্রীর নামে **Money Order** করে পাঠাত, মাঝে একটা পোস্ট কার্ড লেখার খরচাও হাতে রাখত না। প্রতি মাসের **Money Order Coupon**-এ তার এক মাসের খবর সংক্ষেপে লিখে জানাত। তবে প্রতিমাসের মাঝামাঝি সময় অফিস থেকে একখানা খাম চেয়ে নিয়ে খালি স্ত্রীর নাম ঠিকানা লিখে ডাকে ফেলে দিত **Bearing Post**-এ অর্থাৎ টিকিট না দিয়ে। ডাক পিয়ন ঐ বেয়ারিং চিঠি নিয়ে এসে পয়সা চাইলেই স্ত্রী সংগে সংগে পত্রখানি Refuse করতেন অর্থাৎ নিতে অস্বীকার করতেন। বেয়ারিং চিঠিটা Dead letter office-এ চলে যেত, কারণ খামের ভিতরে কি বাইরে কোথাও লেখকের নাম গন্ধও থাকত না এবং স্বামী-স্ত্রী কারুরই এক পয়সা খরচ হত না। একবার যখন এরকম বেয়ারিং চিঠি ফেরত যাচ্ছে, তখন এক দূর আত্মীয়—যিনি মেয়েটির শ্বশুরের সংগে সে সময় দেখা করতে এসেছিলেন—মেয়েটিকে চিঠি ফেরত দেবার কারণ জিজ্ঞাসা করে অবাক হয়ে শুনলেন যে তাঁদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এই সংকেত ঠিক হয়ে আছে যে নিতান্ত খবর দেবার দরকার হলেই উভয় পক্ষ পয়সা খরচ করে পোস্ট কার্ড লিখবে ; তা না হলে বেয়ারিং চিঠির সাংকেতিক মানে ধরে নিতে হবে যে স্বামীর শারীরিক কুশল এবং খবর মোটামুটি ভাল। স্বামী অফিস থেকে বিনা পয়সায় লেফাফা জোগাড় করতে পারবে, কিন্তু স্ত্রীর ত সে সুবিধে নেই। অতএব স্ত্রীর তরফ থেকে একান্ত দরকার না হলে কোন খবর দেওয়া হয় না। এই হল গরীব গৃহস্থের দাম্পত্য জীবন!

যে অফিসারটির জেল হল ও চাকরী গেল বল্লাম তার পরের খবর আর জানি না। যে প্রণয়িণীকে খুশী করতে গিয়ে এত ব্যাপার হয়ে গেল, জেল,

থেকে বের হবার পর সে বেচারা কি তার দেখা পেয়েছিল, কিম্বা তাদের প্রণয় অটুট ছিল ? —কে জানে ?

Defence of India Rules যখন চালু ছিল, তখন কলকাতা পুলিশে একজন ডেপুটি কমিশনার ছিলেন—যাঁকে প্রতি পদে আমায় পরামর্শ দিতে হত, যদিও ভদ্রলোককে পরামর্শ দেওয়া একান্ত শক্ত ছিল। তাঁকে পরামর্শ দিয়ে খুসী করা আমার সাধ্যের বাইরে ছিল। তবে মানুষ হিসেবে তিনি বড়ই ভাল ছিলেন—অতি ভদ্র ও অমায়িক। তিনি কলকাতা পুলিশে নিম্নতম কর্মচারী হয়ে ঢোকেন, কিন্তু পরিশ্রম ও কর্তব্যনিষ্ঠার জন্যে খুব শীগগিরই কর্তৃপক্ষের নজরে পড়ে যান—এবং ফলে তাঁর প্রমোশনও খুব তাড়াতাড়ি হয়। তিনি যখন Inspector ছিলেন তখনকার তাঁর একটা "রিপোর্ট" উপভোগ্য হবে বলেই মনে হয়। স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাসে যখন মাঝে মাঝে একটা ধোরা-পড়া হত তখন আন্দোলনের তেজ অনেকটা কমে যেত। ১৯৩২ সালেও একবার এ রকম হয়েছিল। ১৯৩০-৩১ সালে যাঁরা জেলে গিয়েছিলেন তাঁরা তখন প্রায় সকলেই জেল থেকে বাইরে এসেছিলেন। সেই সময় কলকাতায় বিভিন্ন দলের কতকগুলি শান্ত গোছের সভা ও সম্মিলনী হয়েছিল। একটি সভার ব্যাপারে কলকাতার গ্র্যাণ্ড হোটেলে ভোজের ব্যবস্থা ছিল। নেতা ও নেত্রীদের মধ্যে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু প্রভৃতি দেশপূজ্যা মহিলারাও ছিলেন। এ সব ভোজ সভায় বক্তৃতা ইত্যাদি হয়ে থাকে। সভা যতই শান্ত বা ঠাণ্ডা হোক না কেন, পুলিশের সেখানে হাজির না হয়ে উপায় নেই। তাদের নিয়ম মত Note নিতে হবে, এবং রিপোর্ট দাখিল করতে হবে। আমাদের তখনকার Inspector-বাবুটি এই সভায় Note নিয়েছিলেন এবং Routine মাফিক আমাকে তা দেখতে হয়েছিল—কারণ সে সময় কলকাতায় যত সভা-সমিতি হত সে সংক্রান্ত সব পুলিশ রিপোর্টই আমার কাছে আসত এবং আমায় দেখতে হত। এই সভাটির রিপোর্ট লিখে শেষে নিজের মন্তব্য লিখেছিলেন—**Moderate Inter-Sexual Dinner!** বোধ হয় বলতে চেয়েছিলেন—**Mixed dinner for expressing moderate views.** কিন্তু লেখায় প্রকাশ পেয়েছিল কি তা পাঠকবর্গের বিবেচনার বস্তু!

যাক্, বাঙ্গলা দেশে যখন Muslim League Government হল তখন তিনি ডেপুটি কমিশনার হলেন। যখন লড়াই আরম্ভ হয়ে D. I. Rules-এ

লোকজনের ধর-পাকড় আরম্ভ হল, তখন একজন উকিল তাঁর কাছে এক D. I. Rules-এ ধরা আসামীর জামীন চাইতে গিয়েছিলেন। তিনি তখনই টেলিফোনে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, যেহেতু D. I. Rules-এর আসামীর জামীন চাইতে এসেছে, সেহেতু তিনি উকিলটিকে গ্রেপ্তার করবেন কিনা। জামীন চাওয়াটাই যে উকিলের একটা কাজ এবং যে অধিকার আইনই তাকে দিয়েছে—তা সে D. I. Rules-এর আসামীই হোক বা অপর কোন আইনের আসামীই হোক—একথা এই D. C.-কে বোঝাতে আমাকে বড়ই বেগ পেতে হয়েছিল। এমন কি শেষ পর্যন্ত আমাকে বলতে হয়েছিল—জানেন ত উকিল জাতটা কি রকম বদ—শেষে হয়ত আপনার বিরুদ্ধেই malicious arrest-এর জন্যে দেওয়ানী মামলা এবং wrongful confinement-এর জন্যে ফৌজদারী মামলা রুজু করে বসবে। —তবে ভদ্রলোক সে যাত্রা ঠাণ্ডা হয়েছিলেন।

এ ভদ্রলোককে নিয়ে আমায় আরও অনেকবার অনেক মুস্কিলে পড়তে হয়েছে। একবার এক অত্যন্ত সংগীন ব্যাপার উপস্থিত হয়েছিল—এবার সেই কথাই বলছি। এ ঘটনা ঘটেছিল ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসের হাংগামার সময়। চারিদিকে তখন ট্রামগাড়ী পোড়ানর হিড়িক চলেছে। ভোরবেলা কোন এক কলকাতা-কলেজের মেয়েদের বিভাগের বাস ছাত্রীদের আনতে বেরিয়ে গিয়েছিল। ঐ গোলমালের মধ্যে ১০।১২টি মেয়ে নিয়ে বাস যখন কলেজে ফিরে এল তখন যথেষ্ট বেলা হয়ে গিয়েছে। কয়েকটি ছাত্র গেট্-এর সামনে শুয়ে পড়ে বাসটিকে কলেজে ঢুকতে দিল না। পুলিশ ঐ সত্যাগ্রহকারী ছাত্রকটিকে গ্রেপ্তার করে আমাদের ওই ডেপুটি কমিশনার সাহেবের কাছে হাজির করল।

D. I. Rules-এ 'Prejudicial act' দোষে দোষী হলে ৫ বছর পর্যন্ত জেলের বিধান ছিল। যত রকম ক্রিয়াকলাপ 'prejudicial act' বলে গণ্য হত তার মধ্যে একটি ছিল—to impede, delay or restrict the means of transport or locomotion...of any munitions of war or:. of any essential commodity. ঐ গ্রেপ্তার হওয়া ছাত্রকটিকে তাঁর কাছে হাজির করা মাত্র আমাদের ডেপুটি কমিশনার সাহেব একেবারে কাগজ পত্র তৈরী করে আমার অফিসে হাজির! কি ব্যাপার?—জবাব এল—'Prejudicial Act'-এর অপরাধে অপরাধী বলে ঐ ছাত্রকটিকে ঐ দিনই

চালান দিতে হবে। ভদ্রলোকের কথা বুঝতে আমার বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগল, কারণ তিনি বার বার বলছিলেন,—বাসটা transport ও means of locomotion দুই-ই, আর সেটাকে যখন আটকেছে তখন impede, delay এবং restrict তিনটিই হয়েছে। বাধ্য হয়েই তখন জিজ্ঞাসা করলাম,—কোন জিনিষের transport ও means of locomotion এর ব্যাঘাত ঘটেছে ? সঙ্গে সঙ্গে উত্তর পেলাম,—কেন ? কলেজের মেয়েদের ? আর হাসি চাপতে না পেরে হেসেই জিজ্ঞাসা করলাম—কলেজের মেয়েদের আপনি কোন শ্রেণীতে ফেলছেন—Essential commodity না Munitions of war ? ভদ্রলোক অপ্রস্তুত না হয়ে চটে গেলেন। তখনও তর্ক করতে চান দেখে আমি নাচার হয়ে তাঁকে বললাম যে তিনি ভুল বুঝেছেন এবং এ মামলা হতে পারে না। আরও রেগে মেগে তিনি উঠে গিয়ে Legal Remembrancer-এর কাছে Opinion চাইলেন। L. R.-এর কাছ থেকে কি Opinion পেয়েছিলেন জানি না, তবে মামলা চলে নি এবং ছাত্রকটিকে ছেড়ে দিতে হয়েছিল।

উপরের ঘটনাগুলি থেকে পাঠক মহল নিশ্চয়ই বুঝবেন, যে ঐ ভদ্রলোকটির যুক্তিগুলো আইনের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে তাঁর দৃঢ়-বিশ্বাস প্রণোদিত ছিল, এবং যা তিনি ঠিক বলে বিশ্বাস করতেন জোর গলায় তা প্রচার করবার সৎসাহস তাঁর ছিল। ওর থেকে তাঁর কর্তব্য-জ্ঞানেরও পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি আজ আর ইহ-জগতে নেই ; কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে তিনি বেঁচে থাকলে তাঁর অনুমতি নিয়ে তাঁর নামটি পাঠক-মহলে প্রকাশ করতে পারতাম ; এবং সে অনুমতি তিনি খুশী মনে হাসতে হাসতেই দিতেন।

এই বৃদ্ধ বয়সে সব কথা ওজন করে বা মেপে বলতে পারি না। অনেকবারই দেখছি শুধু কেবল 'পাঠক' 'পাঠকমহল' এমনি কথাই ব্যবহার করে ফেলেছি। এ্যা-এর জাত যেন মনে না করেন যে, আমি এমন কোন ইঙ্গিত করছি যে এই বইখানা কেবল পাঠকদের জন্যে, পাঠিকাদের জন্যে নয়, কিম্বা মেয়েরা লেখাপড়া জানেন না—অতএব আমার বই পড়ে বুঝতে পারবেন না। এ রকম কোন অসৎ উদ্দেশ্য আমার নেই বা কোন কালে ছিল না। প্রথমতঃ, যদি আমার কোন ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে, আমি তার জন্যে ক্ষমা চাইছি। দ্বিতীয়তঃ, সমান অধিকার-এর যুগে আমি যদি কোন

ক্ষেত্রেই নারী-জাতিকে বাদ দিতে চাই, তাহলে হয়ত আমার নামেই আদালতে মামলা রুজু হয়ে যাবে।

আমরা উকিল মানুষ—সারাজীবন আইন নিয়ে নাড়াচাড়া করেছি। আইনে বলে পুংলিঙ্গ-বাচক "He" শব্দে "he" ও 'she' দুই-ই বুঝায়। আইনে যত বিধান আছে—খালি মেয়েদের বেলায় প্রযোজ্য বিধানগুলি ছাড়া—কেবলমাত্র পুংলিঙ্গ-বাচক শব্দ দ্বারাই চলে আসছে। দ্বিতীয়ত, আমি হিন্দু হয়ে মেয়েরা লেখাপড়া জানেন না বা মূর্খ এ ইঙ্গিত পর্যন্ত করি কি করে? —কারণ আমাদের বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হলেন—মা সরস্বতী, যিনি নিশ্চয়ই মেয়ে ছেলে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর—এঁরা ত সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় নিয়েই ব্যস্ত। অন্যান্য দেবতারা সবাই যাঁর যাঁর নিজের port-folio সামলাতে ও Constituency ঠিক রাখতেই ব্যস্ত! তাঁদের লেখাপড়া করার সময় কোথায়? উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে অগ্নিদেবের port-folio হল আগুন জ্বালান, পবন দেবের ঝড় বওয়ান, বরুণদেবের জল ঢালা ইত্যাদি। যুগে যুগে তাঁদের একই কাজ। ত্রেতায় অগ্নিদেব পবন-নন্দনের ল্যাজটি ধরে লঙ্কাকাণ্ড করেছিলেন, পবনদেব ঝড় বইয়ে সে আগুন চারদিকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, বরুণদেব জল ঢেলে সে আগুন নিভিয়ে দিয়েছিলেন। আবার দ্বাপরে বহুকাল ধরে ঘি দুধ খাওয়ার ফলে অগ্নিদেবের যখন Dyspepsia হয়েছিল তখন দেব-বৈদ্যের পরামর্শমত animal protein খাবার জন্যে খাণ্ডব দহণ করলেন। আজও তাঁর সেই একই port-folio, একই কাজ। মা সরস্বতী ছাড়া দেব-দেবীদের মধ্যে আর কেউ যে লেখা পড়া দুইই জানতেন এমন প্রমাণ আমি পাই নি—অবশ্য দেবগুরু বৃহস্পতি ও দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য এই দুই বুড়োকে বাদ দিয়ে। গণেশ ঠাকুর কেবলমাত্র লিখতে পারতেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায়—যদিও চালাকি করে এমন একটি বাহন বেছে নিয়েছিলেন, যে সে লেখার মধ্যে কোন ফাঁক বা গলদ থাকলে এবং তা ধরা পড়লে সঙ্গে সঙ্গে সাফাই দিতে পারেন—ইঁদুরে কেটেছে! অতএব মায়ের জাতকে 'মুখ্যু' বলা বা তার ইঙ্গিত-মাত্র করার মত 'মুখ্যুমি' আমার নেই। আমার মতে পাঠিকারা—অর্থাৎ "বিদুষী-মৈত্রেয়ী খনা লীলাবতী"র উত্তর সাধিকারা—অনেক সময় পাঠকদের চেয়ে পড়েন বেশী, বোঝেন বেশী।

মা সরস্বতীর কথা বলতে বলতে একটি গল্প মনে পড়ল। আগেকার

দিনের কথা। এখন অবশ্য একটা নিতান্ত ছোটগলির মধ্যেও তিনখানা—অন্ততঃ দু'খানা বারোয়ারী বা সার্বজনীন সরস্বতী পুজো হচ্ছে। আবার অনেক জায়গায় দেখি মা-এর নাম পর্যন্ত নেই—'বসন্তোৎসব' 'বাসন্তী পঞ্চমী সম্মেলন' এই জাতীয় নামে হচ্ছে—যদিও প্রতিমা সেই মায়েরই। কিছুদিন আগেও বাড়ীতে বাড়ীতে এবং স্কুলে ছাড়া সরস্বতী পুজো হত না। পুরোন দিনের একটি স্কুলের সরস্বতী পুজোর কথাই বলছি। সে সময় সাধারণত সব স্কুলেই ছেলেরা চাঁদা তুলে পুজোর বন্দোবস্ত করত এবং স্কুলের পণ্ডিত মশাই নিজে হাতে এই পুজো করতেন। একবার এক স্কুলে পুজোর সব ঠিক, আয়োজনও সব হয়ে গেছে। হঠাৎ পুজোর দিন সকাল বেলা দেখা গেল যে পণ্ডিত মশাইয়ের রক্ত-আমাশা হয়েছে এবং তিনি পুজো করতে পারবেন না। এদিকে ছেলেরা—এমন কি অনেক মাস্টার মশাইরা—স্নান করে 'অঞ্জলি' দেবার জন্যে প্রস্তুত। Geography-র মাস্টার মশাই ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, এবং ভাল সংস্কৃত জানতেন। তাছাড়া তিনি সুরসিক ও ছেলেদের প্রিয় ছিলেন। ছেলেরা পুজোর জন্যে তাঁকে ধরতে তিনি বল্লেন,—ঠিক আছে, আমিই পুজো করব। তিনি স্নান করে পুজোর কাপড় পরেই এসেছিলেন—কেবল গায়ের জামাটা খুলে আলোয়ান গায়ে দিয়ে পুজোয় বসে গেলেন। তার আগে নিজের জামার পকেট থেকে ফাউণ্টেনপেনটি বার করে মা সরস্বতীর পায়ের কাছে অন্যান্য বই কলমের সঙ্গে রেখে দিলেন। বেশ ভক্তি সহকারে সাড়ম্বরে পুজো শেষ করে নিজে দেবীকে প্রণাম করে উঠলেন। ছেলেরা 'অঞ্জলি' দেবার জন্যে চারিদিক থেকে এগিয়ে এল এবং একটু ঠেলাঠেলি পড়ে গেল। যখন এই গোলমাল চলছে তখন মাস্টার মশাই-এর নজর পড়ল যে তাঁর ফাউণ্টেনপেনটি যথাস্থানে নেই। সে অবস্থায় যতটুকু খোঁজা সম্ভব খোঁজ করা হল, কিন্তু দেখা গেল যে মাস্টার মশাই-এর ফাউণ্টেনপেনটি সরে পড়েছে। মাস্টার মশাই-এর সিদ্ধান্ত হল যে, মা তাঁর, পুজোয় এত খুশী হয়েছেন যে মা নিজেই তাঁর কলমটি নিয়ে মায়ের আশীর্বাদ বলে অন্য এক ভক্তকে দিয়ে দিয়েছেন। তিনি আর কোন আবেগ বা উত্তেজনা প্রকাশ না করে বেশ শান্ত ও সংযত ভাবে অঞ্জলির মন্ত্র পড়িয়ে গেলেন—"সরস্বতী মহাভাগে বিদ্যে কলমনাশিনি!"

ছেলেরা সব ঐ মন্ত্রেই অঞ্জলি দিয়ে গেল। অঞ্জলি-দান শেষ হবার

পর সবাই মাস্টার মশাইকে ঘিরে ধরল তিনি এরকম নতুন ধরনের মন্ত্র পড়ালেন কেন তার কারণ জানার জন্যে। তখন মাস্টার মশাই এই ভাবে কারণ ব্যাখা করলেন,—বৎসগণ, তোমরা 'মহাভাগে' কথাটার মানে সহজেই বুঝতে পারবে। বরাবর দেখে আসছিলাম যে মা ফিরে যাবার সময় হয় তোমাদের কাঁধে নয়ত মুটের মাথায় যেতেন। অতএব গতিটা মন্থরই ছিল। সম্প্রতি দেখছি তিনি লরি চেপে 'মহা বেগে' প্রস্থান করতে আরম্ভ করেছেন। তাই 'মহাভাগে' কথাটা বিশেষভাবেই এখন প্রযোজ্য; ও 'বেগে' আর 'ভাগে' একই কথা। তোমরা শুনে এসেছ যে তিনি চিরকাল সকলের 'মোহ নাশ' করে এসেছেন। আজ চোখের ওপর দেখতে পেলে যে তিনি আমার ফাউন্টেনপেনটি 'নাশ' করে আমার 'মোহ' বাড়িয়েই দিলেন। অতএব মা সরস্বতীর পুজোয় আজ থেকে যেখানেই ফাউণ্টেনপেন দেওয়া হবে সেখানেই এই নূতন মন্ত্রে অঞ্জলি দেওয়া হবে। তোমরা ঠিক দেখবে যে, যে দগ্ধ-বদন দুর্বৃত্ত আমার ফাউণ্টেনপেনটি পেয়েছে, সে কখনই সেটি নেওয়ার বা পাওয়ার কথা স্বীকারই করবে না—ফেরত দেওয়া ত' দূরের কথা।

এই অভিনব ব্যাখ্যা ও বক্তৃতার পর মাস্টার মশাই তাঁর হারানো ফাউণ্টেনপেনটি ফেরত পান নি; কিন্তু ছেলেরা ঐ নতুন মন্ত্র চালু হবার ভয়েই হোক বা অন্য যে কোন কারণেই হোক, সকলে আরও কিছু কিছু চাঁদা তুলে তাদের Geographyর মাস্টার মশাইকে একটি নতুন ভাল স্বর্ণা-কলম কিনে দিয়েছিল। তাই কি অঞ্জলি দেবার আগেকার মন্ত্রই আজও চালু রয়েছে?

॥ কয়েকটি খেলোয়াড়ের কাহিনী ॥

এবার আমি কয়েকটি ছোট বড় খেলোয়াড়ের গল্প বলছি। 'খেলোয়াড়' বলতে একটা কথা মনে পড়ে গেল। একবার আমরা জনকয়েক তরুণ বন্ধুতে মিলে জটলা করছিলাম। আমাদের দলের মধ্যে একজন ছিল যাকে সাধারণত বলে 'eccentric type'-এর—সব বিষয়েই তার একটা উৎকট ভাব ছিল। তাই তাকে ক্ষেপিয়ে বড় আনন্দ পাওয়া যেত। সে সব চেয়ে বেশী চটে যেত যদি তাকে বলা হত যে সে নিজে কিছু জানে না আর অন্য সবাই সব কিছু জানে। আমাদের সেদিনকার জটলায় সে উপস্থিত ছিল না—আমাদের মধ্যে নানারকম খেলার গল্প হচ্ছিল। হঠাৎ সে আমাদের মধ্যে উদয় হয়ে আমাদের কথাবার্তা মিনিট খানেক শুনেই গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা করলে,—যে বেশী খেলে তাকেই কি 'খেলোযাড়' বলে? অনেকেই তার কথার কোন জবাব দেওয়ারই দরকার মনে করল না। একজন নিতান্ত অবজ্ঞা-ভরেই বললে—তা ছাড়া আর কি? অপর একজনা ফুট্‌ কাটলে—এটুকুও জান না? ব্যস্‌, আর যায় কোথা? সে যেন এইটুকুর জন্যেই অপেক্ষা করছিল। সঙ্গে সঙ্গে বলে ফেলল,—যে বেশী খেলে সে যদি 'খেলোযাড়' হয়, তা হলে যে বেশী জানে সে নিশ্চয়ই 'জানোযার'। তোমরা প্রায়ই বল যে আমি কিছু জানি না। বেশ, আমি বিশেষ কিছু জানতেও চাই না, এবং জেনে তোমাদের মত 'জানোয়ার' হতেও চাই না; সে রকম কোন সখ আমার নেই, এটাও জেনে রেখো। এই কথাগুলো অম্লান বদনে বলে সে বীরদর্পে সেখান থেকে তখনকার মত চলে গেল। বুঝলাম যে সে আগে থেকেই এই মৎলবটা ঠিক করে এসেছিল এবং সেই জন্যেই আমাদিকে কোন জবাব দেবার সুযোগ না দিয়েই

তাড়াতাড়ি সরে পড়ল। তবে সেই থেকে আমরা কজন 'খেলোয়াড়' কথাটা সাবধানে ব্যবহার করে আসছি।

গোড়াতেই তাই বলে দিচ্ছি যে এখানে 'খেলোয়াড়' শব্দ ব্যবহার করছি যে খেলে তাকে বোঝাবার জন্যে নয়, যারা অন্য দশজনকে খেলাতে পারে সেই রকম লোককে বোঝাবার জন্যে।

প্রথমে একটা বাচ্ছা খেলোয়াড় বা খোকা-খেলোয়াড়ের কথা বলছি। সন ১৯২৯ সাল—আমি তখন কলকাতার Junior Public Prosecutor। রায় বাহাদুর তারক নাথ সাধু, সি, আই, ই, তখন পাব্লিক প্রসিকিউটর এবং Mr. T. J. Y. Roxburgh I. C. S. কলকাতার Chief Presidency Magistrate. ঐ Roxburgh সাহেবের ঘরে মামলা—আসামী ১৬।১৭ বৎসরের একটি ছেলে; অপরাধ—cheating অর্থাৎ লোক ঠকিয়ে টাকা নেওয়া। মামলার বিবরণে প্রকাশ যে, সে খৃস্টানদের একটি ধর্মপ্রতিষ্ঠানের নামে কতকগুলো ভুয়ো লটারীর টিকিট বিক্রি করে লোককে ঠকিয়ে টাকা আদায় করেছে। অনেকেই জানেন যে কোন কোন ধর্ম-প্রতিষ্ঠান মাঝে মাঝে গভর্ণমেণ্ট-এর অনুমতি নিয়ে লটারীর টিকিট বিক্রি করে কিছু কিছু টাকা তুলতেন। যে টাকা উঠত তা থেকে লটারীর খরচ-খরচা বাদে নিট্ টাকার অর্ধেক গরীব দুস্থ আর্তের সেবায় খরচ করতেন এবং বাকী অর্ধেক টাকা সেই লটারীর বিক্রি হওয়া টিকিটগুলো Drawing করে কতকগুলো পুরস্কার দিতেন। এক টাকার টিকিটে অনেক সময় দশ বার হাজার টাকা পর্যন্ত প্রথম পুরস্কার উঠত—অন্যান্য পুরস্কার ছাড়া। অবশ্য যে লটারীর টিকিট যত বেশী বিক্রি হত, সে লটারীর পুরস্কার সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পেত। দু' কারণে লোকে এই সব লটারীর টিকিট কিনতো—প্রথম এবং মুখ্য কারণ—১০।১২ হাজার টাকা পাবার লোভ; দ্বিতীয় এবং গৌণ কারণ—কিছু না পাওয়া গেলেও মনকে এই বলে সান্ত্বনা দেওয়া যেত যে তাদের টাকার প্রায় অর্ধেক ত' সৎকাজে ব্যয় করা হয়েছে বা হবে। সেই জন্যেই বিশিষ্ট কোন ধর্ম-প্রতিষ্ঠানের নামের সঙ্গে যুক্ত লটারীর সম্বন্ধে কেউ কোনও খবর নেওয়া প্রয়োজন বিবেচনা করত না।

আমাদের আসামী ছোকরাটি এই রকম একটি প্রতিষ্ঠানের নামে কতকগুলো লটারীর টিকিট ছাপিয়ে নিয়েছিল। ক্লাইভ স্ট্রীট অঞ্চলে

বড় বড় merchant office-এ গিয়ে বেয়ারাদের দিয়ে সাহেবদের ঘরে এই টিকিটের বই পাঠিয়ে দিত। দু' একজন তাকে ডেকে টিকিট কিনে তার হাতে টাকা দিয়ে দিত। আবার অনেকে ধর্ম-প্রতিষ্ঠানের নামটা মাত্র দেখে টিকিটের কাউণ্টারফয়েল-এ নিজের নাম ঠিকানা লিখে টিকিট খানা ছিঁড়ে নিয়ে বেয়ারার হাতেই টাকা পাঠিয়ে দিত। এ রকম কয়েকবার করবার পর ছোকরার সাহস এত বেড়ে গেল যে, এক মাসের মধ্যেই একই সাহেবের কাছে দুবার গিয়ে উঠল। তার দুর্ভাগ্যবশতঃ আগের বারে বিক্রি করে যাওয়া লটারীর টিকিটখানা সাহেবের অফিসের drawer-এর ভিতরই পড়ে ছিল। সেটা দেখে সাহেবের মনে একটু সন্দেহ হল। তিনি সেই ছোকরাকে ডেকে তার সংগে একটু মিষ্টি ব্যবহার করে তাকে পরের দিন আসতে বল্লেন এই বলে যে, পরের দিন তাঁর কয়েকজন বন্ধু আসবেন, যাঁরা এ রকম লটারীর টিকিট অনেক কিনে থাকেন। আভাষে ইংগিতেও নিজের সন্দেহের কথা জানতে দিলেন না এবং ঐ ছোকরাটিও খুসী হয়ে সেদিন সেখান থেকে চলে গেল। তার পরেই তিনি সেই প্রতিষ্ঠানে টেলিফোন করে জানতে পারলেন যে সেই প্রতিষ্ঠান থেকে এ রকম কোন লটারীর আয়োজন করা হয় নি, তাঁরা এ রকম কোন টিকিট ছাপান নি, এ রকম কোনও টিকিট বিক্রি করে টাকা তোলার অধিকার দিয়ে কোনও প্রতিনিধি তাঁরা কারও কাছে পাঠান নি, এবং ব্যাপারটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। সাহেব তখন লালবাজার পুলিশ হেড কোয়াটার্স-এ টেলিফোন করে সব ব্যাপার জানিয়ে দিলেন। লাল বাজার থেকে তাঁকে পরামর্শ দেওয়া হল যে ভবিষ্যতে ছোকরাটি সাহেবের কাছে আসা মাত্রই যেন তিনি তাঁদের খবর দেন, তখন তাঁরা যথাকর্তব্য করবেন।

ঐ ছোকরার লোভ এত বেড়ে গিয়েছিল যে তার পরের দিন সে কোনও রকম বিপদের আশঙ্কা না করে আরও দু'খানা টিকিটের বই নিয়ে সাহেবের কাছে গিয়ে উঠল। সাহেব তাকে নিজের ঘরে বসিয়ে রেখে পাশের ঘরে গিয়ে লালবাজারে টেলিফোন করে দিলেন, এবং ফিরে এসে ছেলেটিকে বল্লেন যে তাঁর বন্ধুদিকে খবর দিলেন, তাঁরা আসছেন, অনেক টিকিট নেবেন; সে যেন একটু অপেক্ষা করে। পাঁচ মিনিট পরে লালবাজার থেকে পুলিশ এসে ছোকরাকে গ্রেপ্তার করল। টিকিট-এর

কাউণ্টারফয়েল-এ যাঁরা যাঁরা টিকিট কিনেছিলেন তাঁদের অনেকেরই নাম ঠিকানা লেখা ছিল এবং তাঁদের মধ্যে অনেকেই ছোকরাটিকে চিনতে পারলেন অর্থাৎ সনাক্ত করলেন। মামলা চালান দেওয়া হল। মামলার দিন টিফিন-এর আগেই মামলার ডাক ও শুনানী হল। সেই প্রতিষ্ঠানের কর্তারা এসে প্রমাণ করলেন যে তাঁরা এ রকম কোনও লটারীর আয়োজন করেন নি, ঐ লটারীর টিকিটগুলো তাঁরা ছাপান নি বা ঐ টিকিট দিয়ে কাউকে টাকা তুলতে পাঠান নি, ঐ আসামী ছোকরার সঙ্গে তাঁদের প্রতিষ্ঠানের কোনও সম্পর্ক নাই—এমন কি তাকে তাঁরা কোনও দিন দেখেন নি। দ্বিতীয় সাক্ষী হিসেবে সেই অফিসের সাহেব এসে যা যা ঘটেছিল সব কিছুই বল্লেন। তারপর হাকিম বল্লেন যে তিনি বাকী সাক্ষী টিফিনের পর নেবেন; তারকবাবু ও আমি আমাদের নিজের নিজের কামরায় ফিরে গেলাম।

এই টিফিনের অবকাশে আমি তারকবাবুকে বল্লাম—ছেলেটা বেশ চালাক চতুর মনে হচ্ছে। ওকে জেলে পাঠিয়ে পাকা জোচ্চোর না বানিয়ে যদি ওকে প্রথমবারের অপরাধী হিসেবে গণ্য করে শোধরাবার একটা সুযোগ দেওয়া যায় ত' কেমন হয়? তারকবাবু জানালেন যে তাঁর তাতে কোনও আপত্তি নেই। তখন আমি এ মামলার তদন্তকারী পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্টরকে ডেকে এ কথাটা বল্লাম। কথাটা শুনেই সেই পুলিশ অফিসারটি বল্লে যে ছেলেটির বাপ প্রথম দিন থেকেই এই প্রস্তাব নিয়ে তাদের কাছে দরখাস্ত দিয়েছে এবং সে নিজেই জামীন হয়ে ছেলেটিকে নিয়ে যেতে রাজী আছে। টিফিনের পরে হাকিম এজলাসে বসবার আগেই তারকবাবু ও আমি তাঁর চেম্বার-এ গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম। আমরা খাসকামরায় ঢুকতেই Roxburgh সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন,—Isn't there any one to take charge of the boy? —অর্থাৎ, এ ছেলেটির ভার নেবার কি কেউ নেই? আমরা বল্লাম —ঠিক সেই প্রস্তাব নিয়েই আমরা এসেছি। ছেলেটির বাপ জামীন হয়ে ছেলেটিকে নিয়ে যেতে রাজী আছে। Roxburgh সাহেব বল্লেন,—বেশ, ছেলেটির বাপ নিজে যদি জামীন হয়ে তার ছেলেকে নিয়ে যেতে রাজী থাকে, তাহলে আমি এজলাসে বসে সেই হুকুমই দেব। আপনারা সেই বন্দোবস্তই ঠিক রাখুন। আমরা বেরিয়ে এসেই ছেলেটির বাপকে

তাকিয়ে বন্দোবস্ত পাকাপাকি করে ফেল্লাম এবং তাদের উকিলবাবুকে বলতে বল্লাম।

তখনকার আইনে এ অবস্থায় আসামীকে জামীন-মুচলেকায় খালাস পেতে হলে প্রথমে আসামীকে দোষ স্বীকার করতে হত এবং তার পরেই জামীন মুচলেকার দরখাস্ত করতে হত। সে দিন টিফিনের পর হাকিম এজলাসে এসে বসলেন, তখন আসামীর উকিলবাবু আগের পরামর্শ মত দরখাস্ত দিয়ে আসামীর দোষ স্বীকার করলেন এবং জামীন-মুচলেকায় প্রার্থনা করলে সে দরখাস্ত মঞ্জুর হল, এবং আসামী তার বাপের জামীনে এবং নিজের মুচলেকায় ছাড়ান পেল। আমার ইচ্ছা হল যে ছোকরাকে একটু সৎ পরামর্শ দিই। তাই পুলিশ ইনসপেক্টরকে বলে এলাম, যেন সব চুকে গেলে আসামী ও তার বাপকে আমার খাস কামরায় নিয়ে আসে। মনে মনে একটু 'আত্মপ্রসাদ' উপভোগ করছিলাম এই ভেবে যে, এ দেশের অন্ততঃ একটি ছোকরাকেও hardened criminal হওয়া থেকে বাঁচাতে পেরেছি।

একটু পরে সেই ছোকরাটি তার বাপের সংগে আমার কামরায় ঢুকতে, তাদের দু'জনকে চেয়ারে বসিয়ে আমি একটি ছোট বক্তৃতা দিয়ে ছেলেটিকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম যে, গেরস্তর ছেলে হিসেবে লেখা পড়া শিখে মানুষ হবার চেষ্টা করাই তার কর্তব্য, এ রকম অসৎ পথে যেন সে তার জীবনে আর কোন দিন পা না দেয়, এ বারে তার ভবিষ্যৎ ভেবে তার বাপের জামীনে ছেড়ে দেওয়া হল, কিন্তু ভবিষ্যতে আর কোন দিন সে সুযোগ সে পাবে না ইত্যাদি। ছোকরা চুপ করে সব কথা শুনে গেল। আশা করছিলাম যে সে অন্ততঃ মৌখিক ভাবে অনুতপ্ত একটু জানিয়ে ধন্যবাদ দিয়ে চলে যাবে। কিন্তু তার জবাব এল এই ভাবে :—মানুষের প্রাণে 'লোভ' বলে জিনিষটা যতদিন থাকবে, ততদিন আমাদের 'অন্ন' কেউ মারতে পারবে না। দু'একবার 'accident' হয়ত হবে; তখন কিছুদিনের জন্যে জেলে ঘুরে এলে এমন কিছু ক্ষতি হবে না। ভাব ছাড়া ভাষাটাও প্রায় হুবহু তারই —কারণ—এ রকম ভাষা প্রায় শোনা যায় না। আমি দাঁড়িয়ে থাকলে নিশ্চয়ই বসে পড়তাম এই জবাব শুনে। হতভম্ব হয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে রইলাম—তারা পিতা পুত্রে উঠে চলে গেল। একটু সামলে নিয়ে তারকবাবুকে গিয়ে সব কথা বল্লাম। তিনি শুনে প্রথমটা খুব গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপর হেসে উঠে বল্লেন,—বেটা আমাদের বড়ই বোকা

বানিয়ে গেল- ছে। এখন ত আর আমাদের করবার কিছু নেই—মনে হয়, শীগ্‌গির আবার ঘুরে আসবে, তখন দেখা যাবে। তবে একটা কথা—আমার মনে হয় গোড়া থেকেই আমাদের বোঝবার একটু ভুল হয়ে গেছে। ও বিদ্যেয় কার কাছে ওর হাতে-খড়ি হয়েছিল, দলে আর কে কে ছিল, এ সব খবর Police Investigation-এর সময় ও বেমালুম চেপে গেছে—তখনই আমাদের বোঝা উচিত ছিল যে, ও একেবারে পাকা হয়ে গেছে, ওর **first offender-এর stage** অনেকদিন আগেই কেটে গেছে।

জীবনে আর একবার আমি এই রকম বোকা বনেছিলাম—সদুপদেশ দিতে গিয়ে এই রকম হতবাক্‌ হয়ে থেমে গিয়েছিলাম—এইবার সেই ঘটনার কথাই বলছি।

কলকাতা সহরে অনেকগুলো বেশ্যা-পল্লী ছিল। ঐ সব পাড়ায় ভদ্র গৃহস্থ বিশেষ থাকত না। ঐ সব পাড়া নানা রকম নামে পরিচিত ছিল—যেমন সোনাগাছি, রামবাগান, হাড়কাটা ইত্যাদি। যে সব হতভাগিনী এ সব পাড়ায় থাকত তাদের জীবন যেমন দুঃখের ছিল, তেমনি বিপদে পরিপূর্ণ ছিল। একজন অসহায়া স্ত্রীলোক একজন বা একাধিক সম্পূর্ণ অপরিচিত পুরুষকে নিয়ে দরজা বন্ধ করবে—অনেক সময় রাত কাটাবে, তাতে সে বেচারার জীবনের বা গয়নাগাঁটি চুরি যাওয়ার আশঙ্কা না থেকে পারে না। বিশেষতঃ যারা ও-পথের পথিক তারা সাধুসজ্জন বা সৎ লোক হওয়ার চেয়ে গুণ্ডা বদমায়েস বা সমাজের সব চেয়ে নীচু স্তরের জীব হওয়ার সম্ভাবনাই ষোল আনা বেশি। তাই ঐ সব পল্লীতে খুন করা, অজ্ঞান করে গয়নাপত্র নিয়ে পালান, ইত্যাদি প্রায়ই ঘটত।

যে ঘটনার কথা বলছি সেটা হয়েছিল হাড়কাটায় একটি মেয়ের ঘরে। এক গুণ্ডা তার ঘরে গিয়ে তাকে মদ খাইয়ে অজ্ঞান করবার চেষ্টা করে, না পেরে ধৈর্য হারিয়ে তাকে খুন করবার চেষ্টা করে, ছুরি মারে। মেয়েটি ছিল অপরূপ সুন্দরী। সে সন্ধ্যার আগে থেকে লাল রঙের বেনারসী শাড়ী পরে ও সারা গায়ে গয়না পরে প্রতিদিন হাড়কাটা গলির এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পায়চারি করত। মাঝে মাঝে পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পান ও সিগারেট কিনত। ঘটনার দিন সন্ধ্যার পরেই লুঙ্গি-পরা এক অপরিচিত লোক এক বোতল হুইস্কি নিয়ে মেয়েটির কাছে এসে আলাপ করল, তারপর তারা মেয়েটির ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করল। লোকটা

ছিল এক দাগী গুণ্ডা। সে প্রথমে মেয়েটিকে বেশী করে মদ খাইয়ে অজ্ঞান করবার চেষ্টা করল—কিন্তু মেয়েটিকে বেশী মদ খাওয়াতে পারল না। এদিকে রাত বেড়েই চলেছে। তখন গুণ্ডাটা অধৈর্য হয়ে কোমর থেকে ছুরি বের করে মেয়েটিকে খুন করবার চেষ্টা করল। বুকে ছুরি বসানর সংগে সংগে মেয়েটি চিৎকার করে লাফিয়ে উঠল। সেই ফাঁকে গুণ্ডাটা দরজা খুলে পালাবার চেষ্টা করছে দেখে, মেয়েটি ঐ অবস্থাতেও তার পরণের শাড়ীখানার ডগায় এক ফাঁস তৈরী করে ঐ গুণ্ডাটার গলায় ছুঁড়ে আটকে দিয়ে চিৎকার করতে লাগল। ঐ বাড়ীর অন্য সব ঘর থেকে লোকজন বেরিয়ে এসে দেখতে পেল যে, যাতে ফাঁসটা এঁটে গলায় না আটকে যায় সে জন্যে ফাঁসের পেছন দিকটা এক হাত দিয়ে টেনে ধরে রেখে ও অপর হাত দিয়ে ঐ ফাঁস খোলার চেষ্টা করতে করতে গুণ্ডাটা সাধ্যমত দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে নামছে, আর মেয়েটি দুহাতে শাড়ীর অপর দিকটা জড়িয়ে রেখে 'খুন করেছে' 'খুন করেছে' বলে চিৎকার করতে করতে তার পিছন পিছন ধাওয়া করছে—মেয়েটির বুকে ঠিক গলার নিচে ছোরাটা বিঁধে রয়েছে—আর সেখান থেকে রক্ত গড়াচ্ছে। মেয়েটির প্রাণপণ চিৎকারে বাড়ীর বাইরেও অনেক লোক জমে গিয়েছিল। ঐ অবস্থায় তারা দুজন যখন বাড়ীর উঠোন পেরিয়ে রাস্তায় এসে পড়ল তখন লোকে গুণ্ডাটাকে ধরে ফেলল, মেয়েটিও অজ্ঞান হয়ে রাস্তায় পড়ে গেল। এতক্ষণ পর্যন্ত শাড়ীখানা মেয়েটির হাত থেকে ছুটে যায় নি, এমন কি তার মুঠো একটুও ঢিলে হয় নি, এবং সমানে 'খুন করেছে' বলে চিৎকার করে গেছে।

মেয়েটি হাসপাতালে দেড় মাসের ওপর থাকার পর বেঁচে গেল। ডাক্তারের রিপোর্টে প্রকাশ পেয়েছিল যে, প্রথম পনের-ষোল দিন সে প্রায় নিশ্চিত মৃত্যুর সংগে যুদ্ধ করেছে। এ দিকে গুণ্ডাটার নামে "Attempt to murder"—এই অভিযোগে মামলা রুজু হয়ে গিয়েছিল—High Court Sessions-এ তার বিচার হয়, এবং তার দীর্ঘকালের জন্যে কারাদণ্ডের হুকুম হয়।

Sessions-এ যাবার নিয়ম হচ্ছে যে আগে Magistrate সাক্ষী-সাবুদ নিয়ে ঘটনা সত্য বলে মনে করলে তবে আসামীকে বিচারের জন্যে দায়রা-সোপর্দ করেন। সেইজন্যেই এই মামলা প্রথমে কলকাতার Chief Presidency Magistrate-এর ঘরে উঠেছিল।

সকলেই জানেন যে আদালতে মামলা ওঠার আগে উকিলদের কাগজ-পত্র পড়ে তৈরী হয়ে নিতে হয়। আমি ও তারকবাবু এ মামলার কাগজ-পত্র পড়ে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। কাগজ-পত্র থেকে জানতে পারি যে মেয়েটি জাতিতে ব্রাহ্মণ, জমিদারের মেয়ে, ভাল গান-বাজনা জানে এবং ম্যাট্রিকুলেশন পাশ। কোন এক মফঃস্বল সহরের এক উকিলের সংগে বিয়ে হয়েছিল। সে উকিলটিও স্থানীয় বনেদীঘরের ছেলে এবং তাদের আর্থিক অবস্থা খুবই ভাল। জেলা কোর্টের উকিলদের মুহুরীরা অধিকাংশই বাঙলা-নবীশ হতেন, ইংরেজী লেখা-পড়া বিশেষ জানতেন না। কিন্তু এই উকিলটির মুহুরী একটু ভিন্ন রকমের ছিল। তাঁদের এক প্রজার ছেলে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে তাঁকে এসে বলল—"আমাকে আপনার একজন মুহুরী হয়ে থাকতে দিন; আমি মুহুরীর কাজ শিখব এবং সংগে সংগে মোক্তারি পড়ব।" উকিলবাবু ছোকরার শেখবার ও পড়বার ইচ্ছা দেখে তাকে তাঁর একজন মুহুরী করে নিয়ে বাড়ীতে থাকতে দিলেন। বছর খানেক বাদে একদিন সন্ধ্যার পর দেখা গেল মুহুরীটি নিখোঁজ এবং ভদ্রলোকের স্ত্রী তার ভাল ভাল কাপড় গয়না সমেত সেই সংগে উধাও। রেল স্টেশনে খোঁজ নিয়ে দেখা গেল যে অল্পক্ষণ আগেই কলকাতা যাবার ট্রেন ছেড়ে চলে গেছে; একটি পরিচিত লোকের সংগে দেখা হওয়াতে জানা গেল যে উকিলবাবুর ঐ মুহুরীটি ঐ ট্রেণে একটি বোরখা-পরা মেয়েছেলে, একটি ট্রাংক ও একটি বিছানা সমেত গেছে—এটা সে দেখেছে। সংগে সংগে পুলিশ থেকে সব স্টেশনে টেলিগ্রাম করে দিল এবং ভোরবেলা ওরা যখন শিয়ালদা স্টেশনে ট্রেন থেকে নামল তখন স্টেশনের G. R. P. অর্থাৎ গভর্ণমেণ্ট রেলওয়ে পুলিশ তাদের সন্দেহ করে গ্রেপ্তার করে আটকে রাখল এবং উকিলবাবুকে খবর পাঠাল। পুলিশ মারফৎ সকালবেলাতেই সংবাদ পেয়ে ভদ্রলোক দিনের গাড়ীতে এসে সন্ধ্যার পরে শিয়ালদা স্টেশনে পৌছালেন এবং G. R. P.-র অফিসে গিয়ে দেখলেন যে তাঁর স্ত্রী ও মুহুরী মশাই দুজনেই বসে আছেন। এতক্ষণ পর্যন্ত তারা কিন্তু তাদের অন্য নাম বলেছিল এবং স্বামী-স্ত্রী বলে পরিচয় দিয়েছিল। সনাক্ত হওয়ার পর পুলিশ কেস লিখে মুহুরীটিকে হাজতে পুরল ও যতদিন মামলা শেষ না হয় ততদিন পর্যন্ত থাকার জন্যে মেয়েটিকে Rescue Home-এ পাঠাল।

যথাসময়ে মুহুরীটির বিরুদ্ধে দুদফা মামলা চালু হল। একটি

পুলিশ করেছিল—সেটি ছিল নাবালিকা-হরণের মামলা। সে মামলায় একটু অসুবিধা এই হল যে মেয়েটি বয়স্থা—অর্থাৎ সাবালিকা—এবং সে নিজের ইচ্ছায় আসামীর সংগে ঘর ছেড়ে এসেছে। সে জন্যে সে মামলায় বিশেষ সুবিধে হল না। কিন্তু উকিলবাবুটিও সংগে সংগে অপর একটি মামলা রুজু করে দিয়েছিলেন এই অভিযোগ করে যে আসামী মুহুরী তাঁর বিবাহিতা স্ত্রীকে ফুসলিয়ে নিয়ে এসেছে। সে মামলায় আসামীর অর্থাৎ মুহুরীটির দেড় বৎসর জেল হল।

কিন্তু মামলা শেষ হবার পর উকিলবাবু তাঁর নিজের হাজার ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও সমাজের শাসনের ভয়ে তাঁর বিবাঁহিতা স্ত্রীকে ঘরে নিতে পারলেন না। মেয়েটির বাপ-মা বর্তমান থাকলেও তাঁরা পর্যন্ত মেয়েটিকে তাঁদের ঘরে স্থান দিতে পারলেন না। মেয়েটি দেখল যে তার কাছে তখন—

"Sisterly, brotherly,
Fatherly, motherly
Feelings had changed :
Love, by harsh evidence,
Thrown from its eminence,
Even God's providence
Seeming estranged."

মেয়েটির তখনকার অবস্থা সম্বন্ধে সত্যিই বলা যায়—

"Oh ! it was pitiful !
Near a whole cityfull
Home she had none."

কিন্তু এই মেয়েটি **Thomas Hood**-এর **"Bridge of Sighs"**-এর নায়িকার মত **"rashly importunate, gone to her death"** না হয়ে তার সমাজের উপর গভীর বিতৃষ্ণা আর আক্রোশ নিয়ে **'Rescue Home'** থেকে বেরিয়েই একেবারে হাড়কাটায় ঘর-ভাড়া নিল। দেখা গেছে যে যদি এক দিক থেকে সিল্কের জামা ও দেশী ধুতি পরে মোটর গাড়ী চেপে কোন জমিদারের ছেলে আসত এবং অপর দিক থেকে ময়লা জামা-কাপড় পরা গুণ্ডা জাতীয় কোন লোক এসে হাজির হত এবং দুজনেই তার ঘরে রাত কাটাতে

চাইত, তা হলে মেয়েটি বিনা দ্বিধায় হাসতে হাসতে ঐ ভদ্রলোক জমিদার তনয়কে প্রত্যাখ্যান করে গুণ্ডাটিকে নিয়েই ঘরে চলে যেত !

যেদিন Police Court-এ 'Attempt to murder' মামলাটির প্রথম শুনানী হবে, সেদিন কোর্টে গিয়ে শুনতে পেলাম যে case-টি Tiffin-এর পর ধরা হবে। আমার প্রথম দিকের কাজকর্ম সেরে নিয়ে এই মামলার তদন্তকারী Inspector-কে ডেকে বললাম—"এ মেয়েটিকে আপনারা এ রকম ভাবে নষ্ট হতে দিচ্ছেন কেন ? এর জন্যে কি কিছুই করতে পারেন না ?" এই Inspector-টিকে এ ভাবে বলবার অন্যতম কারণ হল এই যে ইনি ছিলেন একজন উচ্চ-শিক্ষিত ভদ্রলোক, সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলে। ইনি পরে Deputy Commissioner পর্যন্ত হয়েছিলেন। তাঁর কাছ থেকে যা জবাব পেলাম তার সারমর্ম হচ্ছে এই যে মেয়েটি বাস্তবিকই যাকে বলে 'accomplished'—তাই ; রবীন্দ্র-সংগীত ও কীর্তন চমৎকার গাইতে পারে—লেখাপড়া ত জানেই। কিন্তু গণিকা-মহলে যারা একটু ভদ্র ধরনের বা উচ্চ স্তরের, মেয়েটি তাদের সংগে কখনও মেশে না। দুচারজন বড়লোকের ছেলে তাকে ভদ্র-পল্লীতে নিয়ে গিয়ে যথাসম্ভব ভদ্রভাবে তাদের রক্ষিতা হিসেবে রাখতে চেষ্টা করেছে—কিন্তু মেয়েটি কিছুতেই রাজী হয় নি। ভদ্র-জাতির প্রতিই যেন তার সমস্ত বিতৃষ্ণা—এবং ইতর বা গুণ্ডা শ্রেণীর প্রতিই যেন তার সমস্ত অনুরাগ। সে যে ভাবে রোজ রোজ দামী গয়না ও কাপড়-চোপড় পরে রাস্তায় পায়চারি করে ও পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পান সিগারেট খায় তাতে করে যেন গুণ্ডার দলকে আমন্ত্রণ জানায় এই বলে—"ওগো, তোমরা এসে পারত আমায় খুন জখম করে আমার গয়না পত্র নিয়ে পালিয়ে যাও !" পুলিশ থেকে তাকে Deputy Commissioner-এর কাছে নিয়ে গিয়ে এই মর্মে কয়েকবার সাবধানও করে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাতেও কোন ফল হয় নি। এবারের আগে আরও তিন-তিনবার মেয়েটিকে খুন করবার চেষ্টা হয়ে গেছে কিন্তু এবার ছাড়া কোনবারই আসামীকে ধরতে পারা যায় নি। তাঁর বক্তব্যের শেষে Inspector-টি আমায় বললেন—"Sir, আপনিও একবার বলে দেখুন না, যদি কথা শোনে। নইলে মেয়েটা কোন দিন গুণ্ডার হাতেই প্রাণটা দেবে। মেয়েটার ভাল parts আছে, কেন এভাবে নষ্ট করছে সেই জানে !" আমি বললাম—"বেশ, মেয়েটিকে ডেকে আনুন।"

মেয়েটি আমার ঘরে এলে আমি তাকে বসতে বললাম। চেয়ারে বসবার পর তাকে সোজাসুজি বললাম—"দেখুন, আপনার ইতিহাস আমি পুলিশের কাগজ-পত্র থেকে পেয়েছি। আপনি ভদ্রঘরের শিক্ষিতা মেয়ে—নিজের জীবনটাকে কেন এ ভাবে নষ্ট করছেন? আপনি যাতে সম্মানের সঙ্গে নিজের জীবন কাটাতে পারেন, Government থেকে সে বন্দোবস্ত করিয়ে দিতে পারি। ধরুন যদি আপনি Nursing শিখতে চান, আপনাকে Medical College-এ ভর্তির বন্দোবস্ত করে দেওয়া যেতে পারে। আপনি যদি Film প্রভৃতিতে যেতে চান তা হলে পুলিশ থেকে মাস দুইয়ের মধ্যেই সে ব্যবস্থা করে দেবে।—ইত্যাদি।" কথাবার্তার প্রথম দিকে মেয়েটি এক অক্ষরে "হ্যাঁ" কিম্বা "না" ছাড়া কোন কথা বলে নি। আমার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মেয়েটি চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে—"আমার ভাবনা আমার ওপর ছেড়ে দিয়ে নিজের মামলার কথা এখন ভাবুন দিকিন"—বলেই একটি ছোট নমস্কার করে সম্পূর্ণ সপ্রতিভ ভাবে ও সদর্পে আমার কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল। আর আমি জীবনে এই প্রথম ও শেষ এতটা অপ্রতিভ হয়ে চুপ করে বসে রইলাম। কারণ আমি পূর্বেই Inspector-এর কাছ থেকে মেয়েটির অদ্ভুত মনোবৃত্তির বিবরণ পেয়ে থাকলেও এতটা তেজ এতটা ঝালের জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না।

তারপর ছাব্বিশ সাতাশ বৎসর চলে গেছে। মেয়েটি আজও বেঁচে আছে কিনা জানি না—সেই মামলার পর থেকে আজ পর্যন্ত আর তার কোন খোঁজ নেবার চেষ্টাও করি নি। তবে তার কথা অবসর-সময়ে অনেকবার আমার মনে পড়েছে তার সেই অতি-অদ্ভুত ব্যবহারের জন্যে। শেষ পর্যন্ত আমার এই স্থির সিদ্ধান্তই হয়েছে যে, মেয়েটির ওই ব্যবহার সমাজের উপর অত্যন্ত বেশী ঘৃণা ও বিদ্বেষ থেকেই দাঁড়িয়েছিল। তখন সে যেন তার সমস্ত আকার ইঙ্গিত ভাব ভঙ্গি দিয়ে বলতে চাইছিল—"যে সমাজ আমার এক মুহূর্তের ভুল ত্রুটির জন্যে আমায় মাপ করলে না, স্বামীর ঘরে ত নয়ই,—এমন কি বাপ-মায়ের ঘরেও একটু জায়গা দিলে না, সে সমাজের বুকে লাথি মেরে মরণের দিকে এগিয়ে যাব। সে সমাজের সঙ্গে আপোষ করে ভদ্রভাবে জীবন যাপন করবার দুর্বুদ্ধি যেন কখনও আমার না হয়!" এই জাতীয় মনোবৃত্তি ও চিন্তাধারা ছাড়া এই মেয়েটির চরিত্রের ও ব্যবহারের অন্য কোন সন্তোষজনক কারণ অনেক ভেবেও আমি আজ পর্যন্ত খুঁজে পাই নি।

এবার বলছি একদল খেলোয়াড়ের কথা। দলে এরা ৫।৬ জন ছিল—এদের কাজ ছিল দলের এক যুবকের সঙ্গে ঠকিয়ে বিভিন্ন মেয়ের বিয়ে দিয়ে টাকা ও গয়না আত্মসাৎ করা। দলের প্রধান কাজগুলো তিন জনে করত। প্রথম ছিল—সুশীল ওরফে নির্মল ওরফে রমেশ ইত্যাদি নামে এক যুবক—যে প্রতিবার 'বর' হত; দ্বিতীয় ছিল তার বিধবা মা; তৃতীয় হল ঐ বিধবার ভগ্নীপতি বা সুশীলের মেসোমশাই বলে পরিচিত এক ব্যক্তি। নানা জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন নামে সুশীল ইত্যাদি নামধারী যুবকটির বিয়ে দেওয়াই ছিল এদের কাজ।

কলকাতা সহরের মত আত্ম-গোপনের স্থান খুব কমই আছে। এই দলটি কলকাতার কোন এক পাড়ায় বাড়ী ভাড়া নিয়ে মাস খানেক বসবাস করবার পর চারদিকে ঘটক লাগিয়ে বিয়ের ঠিক করে সুশীলের বিয়ে দিত। প্রত্যেকটি বিয়েতে অন্ততঃ দু-তিন হাজার টাকা নগদ ও দু-আড়াই হাজার টাকার গয়না আদায় করত। বিয়ের পর ফুল-শয্যা, দ্বিরাগমন ইত্যাদি শেষ হয়ে গেলেই মেয়েকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিত। প্রথম দু' একবার সুশীল মাঝে মাঝে শ্বশুরবাড়ী ঘুরে আসত—তারপর আর সে বা তারা সে দিকও মাড়াত না। তাদের চিঠি লিখলে সে চিঠি Dead Letter Office থেকে ফিরে যেত। পাড়ায় খোঁজ নিতে গেলে দেখা যেত যে কোথাও তাদের কোন পাত্তাই নেই—পাখী খাঁচা থেকে উড়ে গেছে। এক একবার এক একরকম নাম ও পরিচয় দিয়েছে—অতএব তাদের সন্ধান করে বের করা অসম্ভব ছিল। কিন্তু প্রত্যেকবারই বিয়ের পর মেয়েকে তার বাপের বাড়ী পাঠাবার আগে বলা হত—"ভাড়াটে বাড়ী, এত গয়না চুরি যেতে পারে—গয়নাগুলি Bank-এ জমা রাখা দরকার।" প্রথম দুক্ষেত্রে আবার Bank-এ জমা রাখার Deposit Receipt মেয়েদের দেখান হয়েছে। পরে যখন কোর্টে মামলা চলে তখন ঐ রসিদ দুটির কোন পাত্তাই পাওয়া যায় নি। এর পরে বিয়ে হল শিবপুরে। এক ব্রাহ্মণের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে—এবার বরের নাম হল সুশীল বাঁড়ুয্যে। এই মেয়েটি ছোটবেলায় বাজীতে পুড়ে যাওয়ার জন্যে তার গালে একটি সাদা দাগ হয়েছিল। সেই দাগের জন্যেই হয়ত মেয়েটির বিয়ের অসুবিধা হচ্ছিল। তাই বরকর্তা অর্থাৎ সেই মেসোমশাই এবং সুশীলের মা বরপণ বলে নগদ পাঁচ হাজার টাকা আদায় করেছিল। সেবার তাদের সাহস এত বেড়ে গিয়েছিল যে ফুলশয্যার পরের দিনই মেয়েকে

বাপের বাড়ী ফেরত পাঠিয়ে দিয়ে বলে পাঠাল যে মেয়েটির গালের দাগ কুষ্ঠ রোগের দরুণ হয়েছে—এ অবস্থায় তারা মেয়ে নিয়ে ঘর করতে পারবে না। বলা বাহুল্য, মেয়েকে তার বাপের বাড়ী ফেরত পাঠাবার সময় সামান্য কাপড় আর গয়না তার সংগে দিয়ে বাকী—অর্থাৎ প্রায় সবই—নিজেরা রেখে দিয়েছিল। এর পর মেয়েটির ভাই যখন এ বিষয়ে আলোচনা করবার জন্যে বরপক্ষের বাসায় যান, তখন সেই মেসোমশাই বলে উঠলেন—"জান, আমি ৩২ বছর পুলিশে চাকরি করে retire করেছি? আমার এখনও Police Department-এ এরকম influence আছে যে তোমরা যা করেছ তার জন্যে তোমাদের বাপ-ব্যাটা দুজনকেই জেল খাটাতে পারি!" পরে এই মেসোমশাইটির Police এ চাকরী করে retire করার কথাও মিথ্যা বলে প্রমাণ হয়ে গিয়েছিল।

আমি যে সময়কার কথা বলছি—অর্থাৎ ১৯৩১-৩২ সাল—তখনও হিন্দু সমাজ অন্ততঃ মেয়েদের ব্যাপারে বড় পিছিয়ে ছিল। কথায় কথায় জাত না যাক্ অন্ততঃ একঘরে হয়ে থাকতে হত। একবার কোন রকমে কোন কুৎসা রটলে সে বাড়ীর মেয়েদের বিয়ে হওয়া মুশকিল হত। সেই কারণেই মেসোমশাইটির ঐরকম আস্ফালন মেয়েটির বাপ-ভাইকে তখনকার মত হজম করতে হল। কিন্তু তাঁরাও চুপ করে বসে রইলেন না। চারদিকে খোঁজ খবর নিয়ে তাঁরা জানতে পারলেন যে সুশীলের এম্. এ. পাশ করা বা ভাল চাকরি করার কথা সব ভুয়ো—সে কাজকর্ম কিছুই করে না এবং লেখাপড়া যে শিখেছে তারও কোন প্রমাণ নেই। এইটুকু মাত্র খাঁটি খবর পাওয়া গেল যে, বিয়ের অল্পদিন আগে ও-পক্ষ শিয়ালদার কাছে বৌবাজারের এক গলিতে বাড়ী ভাড়া করে আছে। সাবধানে বন্ধু-বান্ধব লাগিয়ে সেই বাড়ীর আশে পাশে কিছুদিনের জন্যে নজর রাখতে দেখতে পাওয়া গেল যে, সে বাড়ীতে ঘটক যাতায়াত করছে। ক্রমে দেখা গেল যে ঐ বাড়ীতে বিয়ের আয়োজন হচ্ছে, কিন্তু কোথাকার পাত্রী সে খবর কিছু পাওয়া গেল না। দিন কতক পরে সকালের দিকে হঠাৎ খবর পাওয়া গেল যে কন্যাপক্ষ Harrison Road-এর উপর অবস্থিত এক ইস্কুল-বাড়ী ভাড়া নিয়ে উঠেছেন এবং সেইদিনই সন্ধ্যা বেলায় বিয়ে।

শিবপুরের মেয়েটিকে বিয়ে করার পরদিন সুশীল যখন তার কনেকে নিয়ে গাড়ীতে উঠছিল, মেয়ের তরফ থেকে তখন বর-কনের একটি photo নেওয়া হয়েছিল এবং সেটা তাদের কাছেই ছিল। সেই ফটোখানা এবং

জন কয়েক লোক সংগে নিয়ে মেয়ের ভাই ঐ দিন সন্ধ্যার আগেই সেই ইস্কুল বাড়ীতে গিয়ে কন্যা-কর্তার সংগে দেখা করে সব কথা বললেন। কন্যাকর্তা ত আকাশ থেকে পড়লেন। ফটো দেখে সে ভদ্রলোকের কোন সন্দেহই রইল না যে এই পাত্রের সংগেই তিনি মেয়ের বিয়ে দিতে যাচ্ছিলেন এবং মাত্র কয়েকদিন আগে পাত্র-আশীর্বাদের সময় এরই মেসোমশাই-এর হাতে বরপণের তিন হাজার টাকার মধ্যে নগদ এক হাজার টাকা অগ্রিম গুণে দিয়েছেন! কন্যাকর্তার এক কায়স্থ বন্ধু সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কি সন্দেহ হওয়াতে 'দেখি, দেখি' বলে ফটো খানা চেয়ে নিয়ে দেখে বল্লেন,—"এ ছেলেকে ত আমি চিনি বলে মনে হচ্ছে। বছর খানেক আগে আমার এক আত্মীয়ের মেয়ের সংগে এর বিয়ে হয়েছিল। সে ক্ষেত্রেও এই রকম একজন মেসোমশাই বরকর্তা হয়েছিল। তখন বলেছিল তারা 'কায়স্থ' এবং বরের পদবী 'বসু'।" তিনি আরও বললেন যে, বিয়ের পর এক বৎসর মেয়েকে বাপের বাড়ী থাকতে হয় বলে পাঠিয়ে দিয়ে, জামাই, তার মা, মেসোমশাই প্রভৃতি দলবল ফেরার হয়েছে; এবং সে-মর্মে পুলিশে ডায়েরী করা আছে। তখনই সে মেয়ের বাড়ীতে খবর দেওয়া হল এবং ফলে সে মেয়ের পক্ষ থেকেও কয়েকজন ভদ্রলোক একেবারে পুলিশ সংগে নিয়ে এ বাড়ীতে হাজির হলেন। রাত ৮৷৷৹টা নাগাদ ব্যাণ্ড বাজিয়ে আলো জ্বালিয়ে শ্রীমান্ সুশীলচন্দ্র আর একবার বিয়ে করতে এলেন, বরকর্তা হিসেবে এলেন সেই মেসোমশাই। বলা বাহুল্য যে, এবার বিবাহ-বিশারদ শ্রীমান্ সুশীলচন্দ্রকে বাসরঘর দূরের কথা, ছাঁদনাতলা পর্যন্ত পৌঁছুতে হল না। পুলিশ তার জন্যে অন্য-জাতীয় শ্বশুরবাড়ীর বন্দোবস্ত করে দিলে—এবারও সংগে রইল তার মা আর সেই মেসোমশাই। পরের দিন সকালে ব্যাপারটি কতকগুলি খবরের কাগজে বের হল। সেই খবরের কাগজ পড়ে আগেকার তিনটি বিয়ের মেয়ে-পক্ষ পুলিশের সংগে দেখা করল এবং সুশীল ও মেসোমশাইকে দেখেই চিনতে পারল আগের সব বিয়েরই বর ও বরকর্তা বলে।

প্রত্যেকটি বিয়েই ঘটক মারফত ঠিক হয়েছিল এবং ঘটকের খাতায় তারা এক একবার এক এক রকম নাম ধাম দিয়েছিল। সুশীলের মা আর তার 'মেসোমশাই' প্রত্যেকবারই কনে পছন্দ করেছিল এবং তারাই দুজনে প্রতিবার বর-পণ, যৌতুক, গয়না ইত্যাদি আদায় করেছিল।

মামলা যখন চলল তখন আসামী পক্ষ থেকে শিবপুরের মেয়েটিকে এই রকম জেরা করার চেষ্টা হয়েছিল যে, মেয়েটির অসুখের খবর লুকিয়ে পাত্র-পক্ষকে ঠকিয়ে মেয়েটির বিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই মামলার বিচার হয় কলকাতার তখনকার **Chief Presidency Magistrate, The Hon'ble S. K. Sinha I. C. S.** মহাশয়ের এজলাসে। তিনি এ শ্রেণীর জেরা অগ্রসর হতে দেন নি। পরিষ্কার ভাবে আসামীপক্ষের উকীলবাবুদের বলে দিলেন যে, 'যতক্ষণ না তিনি সুশীলের আগেকার বিয়ে কয়টির বেলায় তার নিজের নাম, বাপের নাম, এমন কি জাত পর্যন্ত ভাঁড়ানর এবং বিয়ের পরেই টাকা ও গয়না নিয়ে ফেরার হওয়ার সন্তোষজনক কৈফিয়ত পাচ্ছেন,' ততক্ষণ তিনি এই সমস্ত বাজে জেরা হতে দেবেন না।

বলা বাহুল্য, এ মামলায় জবাব দেবার বাস্তবিকই কিছু ছিল না। দলসুদ্ধ সকলেরই জেল হয়ে গিয়েছিল।

খবরের কাগজ দেখে যে কয়টি মেয়ের বাপ ইত্যাদি এসে সাক্ষী দিয়েছিলেন, তা ছাড়া আর কোনও বিয়ে শ্রীমান সুশীলচন্দ্র করেছিল কিনা সে সম্বন্ধে আর কোন খবর পাওয়া যায় নি।

এবার বলছি দুটি বিদেশী খেলোয়াড়ের গল্প। ব্যাপারটা হয়েছিল বড়ই মজার। আজকাল আমাদের দেশে মোটর গাড়ীর সংখ্যা অনেক বেড়েছে—অবশ্য সহর ও সহরতলীতে; কিন্তু এখন আর আগেকার মত নানা রকমের মোটর গাড়ী পাওয়া যায় না। আগে বিভিন্ন রকমের মোটর গাড়ীর ব্যবসা এই কলকাতা সহরেই চালু ছিল। এবং প্রত্যেক কোম্পানীরই একটা করে অফিস ও কারখানা ছিল। কোন কোন কোম্পানীর গাড়ীর দাম ৬০ হাজার, ৭০ হাজার, ৮০ হাজার পর্যন্ত হতে দেখা গেছে। এ ঘটনা ঘটেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কয়েক বৎসর আগে—তবুও নাম কয়টা নকলই দিলাম—আর সবই আসল।

বেলা তখন আন্দাজ ১১টা। স্থান—কলকাতার এক দামী গাড়ীওয়ালা কোম্পানীর অফিস, বড় সাহেবের কামরা। টেলিফোন বেজে উঠল, ক্রিং-ক্রিং-ক্রিং। বড় সাহেব টেলিফোন তুলে নিয়ে জবাব দিলেন—

—"General Manager Jones Speaking." (আমি General Manager Jones কথা বলছি।)

অপর দিক থেকে ভেসে এল :

—"আমি Motor Vehicles Department-এর Deputy Commissioner Smith কথা বলছি। Good morning, Mr. Jones। দেখুন আপনারা আজ সকালে যে দুখানা গাড়ী বিক্রি করেছেন সেই দুখানা registry করে Registration Certificate (Blue Book) দুখানা তৈরী করে দেবার অল্পক্ষণের মধ্যেই ঐ গাড়ী দুখানাই ফের ৫৬ হাজার টাকা করে বিক্রি হয়েছে বলে আবার রেজিস্ট্রীর জন্যে আসে। ব্যাপারটা একটু কেমন কেমন ঠেকছে না ?"

Jones—"গতকাল দুটি বিদেশী যুবক আমাদের অফিসে এসে দুখানা গাড়ী পছন্দ করে। দাম ঠিক হয় ৬৬ হাজার টাকা করে। তারাও ৬৬ হাজার টাকা করে দু'খানা cheque দিয়ে যায়। তাই আমাদের Asst. Manager Mr. King আজ সকালে গাড়ী দুখানা নিয়ে ওদের নামে registry করানর জন্যে আপনার Department-এ যায়। এ ছাড়া আমি ও-সম্বন্ধে আর কিছু জানি না।"

Smith—"Mr. King-ই আজ সকালে আমার সংগে registration-এর ব্যাপারে দেখা করেন। কথায় কথায় বলছিলেন যে বহুকাল আপনাদের দুখানা গাড়ী একসংগে বিক্রি হয় নি।"

Jones—"সে কথা খুবই ঠিক, কারণ আমাদের এ গাড়ীর খদ্দের এত কম যে অনেক সময় সারা বছরেও এ গাড়ীর দুখানা বিক্রি হয না। কিন্তু আসল ব্যাপারটা কি বলুন ত।"

Smith—"আসল ব্যাপারটা যে কি তা আমিও বুঝতে পারছি না। কেবলমাত্র Number Plate দুখানা তৈরী করতে যা সময় লেগেছিল, তা ছাড়া আমার অফিসে ওঁার দেরী হয় নি। Mr. King আসার সংগে সংগেই আমরা Blue Book দুখানা ready করে ওঁকে দিয়ে দিই। Mr. King-এর সংগে দুজন যুবক ছিল। তাদের কথা শুনে আমি তাদের German বলে মনে করেছিলাম। আর যে নামে গাড়ী দুখানা তখন registry হয়েছিল সে দুটোও German নাম। তারা নতুন গাড়ী দুখানা নিয়ে Mr. King-এর সংগে বেলা ১০টার অল্প পরেই আমার অফিস থেকে চলে গেছে। কিন্তু সব চেয়ে তাজ্জব হচ্ছে যে বেলা ১১ টার মধ্যেই Henry নামে গাড়ীর দালাল আবার ঐ গাড়ী দুখানা আজই

বিক্রি হয়েছে বলে registry-র জন্যে এনেছে। অন্যান্য কাগজের সংগে সে এক একটা গাড়ীর দাম বাবদ ৫৬ হাজার টাকা করে দুখানা রসিদ দাখিল করেছে—একটা গাড়ী কিনেছে বিম্বাগড়ের রাজা, অন্যটি কিনেছে কাঞ্চন পুরের জমিদার। দুজনেরই ম্যানেজার Henry-র সংগে গাড়ী নিয়ে এসেছে। Henry-কে জিজ্ঞাসা করতে সে আমায় বললে যে প্রত্যেকটা গাড়ী বিক্রি করিয়ে দেওয়ার জন্যে সে এক হাজার করে মোট দুহাজার টাকা commission বা দালালি পেয়েছে। এ অবস্থায় আমরা ত আর নতুন ক্রেতাদের নামে গাড়ী পুনরায় registry না করে পারি না। এখন আপনাদের কিছু করবার থাকলে করতে পারেন। আমার কিন্তু ব্যাপারটা ভাল মনে হচ্ছে না—তাই আপনাকে খবর দিলাম।"

Jones—"আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। আমি এখনই Mr. King-কে দিয়ে খবরাখবর করছি।"

এর পরই Jones তাঁর ম্যানেজার King-কে ডেকে সব খবর বললেন। শেষে জিজ্ঞাসা করলেন—"কাল এত আগ্রহ করে ৬৬ হাজার টাকা দিয়ে কিনে আজই এক একটা গাড়ী দশ হাজার টাকা করে লোকসান দিয়ে বিক্রি করা হল, ব্যাপারটা কি বলতে পার, King?" বিশেষ না ভেবেই King জবাব দিলেন—"ওরা দুজনে ত Great Eastern Hotel-এ থাকে। একজন M. V. D. থেকে ফেরবার পথে আমাকে আমাদের অফিসেই নামিয়ে দিয়ে গেল, আর একজন সোজা Great Eastern Hotel-এ তার গাড়ী নিয়ে যাচ্ছে, বলে গেল। তা ছাড়া আমাদের কোম্পানীর দুজন driver ত গাড়ীর সংগেই রয়েছে।" King যেন আরও কি বলতে যাচ্ছিল। তাকে বাধা দিয়ে Jones বললেন—

—"ভুলে যাচ্ছো King, এখন গাড়ী দুখানার রেজিস্টার্ড মালিক বলতে গেলে একজন হল বিম্বাগড়ের রাজা—আর একজন হল কাঞ্চনপুরের জমিদার, কারণ তারা নগদ ৫৬ হাজার করে টাকা দিয়ে আগের রেজিস্টার্ড মালিকদের কাছ থেকে কিনেছে। এখন আর আমাদের কোম্পানীর ড্রাইভার গাড়ীর সংগে থাকলে আমাদের লাভটা কি? তার চেয়ে এখুনি গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেল-এ টেলিফোন করে খোঁজ নিয়ে দেখ ঐ জার্মান যুবক দুজনের সংগে 'কনটাক্ট' করতে পার কিনা।" এতক্ষণে যেন King ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে পেরে তক্ষুণি গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেলকে টেলিফোন করে সেই জার্মান যুবক দুটির খবর জানতে চাইল। জবাব যা পেল তাতে তারা

দুজনেই মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। হোটেল থেকে জবাব এলো যে ঐ যুবক দুটি হোটেলের একটি দুই সিট-ওয়ালা ঘর নিয়ে প্রায় ১ মাস যাবৎ ছিল, কিন্তু সেই দিনই ঘণ্টা খানেক আগে হোটেলের বিল চুকিয়ে দিয়ে মালপত্র নিয়ে চলে গেছে। Thomas Cook তাদের খবর বলতে পারে। এই খবর পেয়ে তাঁরা ঠিক করলেন যে তখুনি সমস্ত ঘটনা দরখাস্তয় লিখে সেটা নিয়ে লালবাজারে Detective Department-এর ডেপুটি কমিশনার-এর সংগে দেখা করা উচিত। সংগে সংগে সেইমত কাজ হল এবং King নিজে সেই দরখাস্ত নিয়ে গিয়ে ডেপুটি কমিশনার-এর সংগে দেখা করলেন। ইতিমধ্যেই Jones ডেপুটি কমিশনারকে টেলিফোনে ব্যাপারটা জানিয়ে দিয়েছিলেন। King যাওয়ামাত্রই তার সংগে একজন Detective Department-এর ইন্‌সপেক্টরকে দিয়ে বলে দিলেন—"আপনারা সকলের আগে Thomas Cook-এর অফিসে গিয়ে খোঁজ-খবর নিন—সেখানে পাওয়া খবরের সূত্র ধরে পরে এগিয়ে যাবেন।" Thomas Cook-এর অফিসে গিয়ে খবর পাওয়া গেল যে, ঘণ্টা খানেক আগে সেই যুবক দুটি সেদিনকার "Overland Mail"-এ ইউরোপ-এর জন্যে প্যাসেজ বুক করে মালপত্র সব রেখে গেছে। তারা নিজেরা একেবারে সন্ধ্যার পরে হাওড়া স্টেশনে গিয়ে "Overland Mail"-এ চড়ে বসবে। Thomas Cook-এর লোক তাদের মালপত্র টিকিট প্রভৃতি নিয়ে হাওড়া স্টেশনেই তাদের সংগে দেখা করবে—এই ঠিক হয়ে আছে। Thomas Cook-এর এক দ্বারোয়ানের কাছে খবর পাওয়া গেল যে ঐ জার্মান ছোকরা দুটি তাকে একখানা ট্যাক্সি ডেকে দিতে বলে—সেও একখানা 'T' মার্কা ট্যাক্সি ডেকে দেয়, তাতে উঠেই যুবক দুটি ট্যাক্সির ড্রাইভারকে 'ডায়মণ্ড হারবার' যাবার হুকুম দিয়েছে—এটা সে নিজের কাণে শুনেছে। তখনকার দিনে ট্যাক্সির মার্কা 'W. B. T.' ছিল না শুধু 'T' দিয়েই হত, বোধহয় পাঠক-পাঠিকার মনে আছে।

মনে অনেকের না থাকা সম্ভব 'Overland Mail'-এর কথা। তাই তার পরিচয় এখানে একটু দেওয়া প্রয়োজন মনে করছি। আগে P. & O. Company-র মেল বোট ভারতীয় ডাক ও প্যাসেঞ্জার নিয়ে প্রতি শনিবার বোম্বাই থেকে ছেড়ে ইউরোপ যেত। বি. এন. আর.-এরই হোক কিম্বা ই. আই. আর-এরই হোক, মেল ট্রেন বৃহস্পতিবার হাওড়া থেকে ছেড়ে শনিবার বোম্বাই পৌঁছে সেই মেল-জাহাজ ধরাতে পারত না। তাই

ই, আই, আর, কোম্পানী 'পোস্টাল এক্সপ্রেস' ওরফে **'Overland Mail'** নামে একখানি অতিরিক্ত দ্রুতগামী ডাক-গাড়ীর বন্দোবস্ত করে-ছিলেন। সে ট্রেণে কেবল ইউরোপ-গামী যাত্রীরাই যেতে পারত। ঐ ট্রেণ প্রতি বৃহস্পতিবার রাত্রে হাওড়া থেকে ছেড়ে শনিবারে পি এণ্ড ও, মেল বোট ছাড়ার অন্ততঃ কয়েক ঘণ্টা আগে বোম্বাই পেঁাছে দিত। সেখানেও প্রত্যেকটি যাত্রী যাতে যথাসময়ে জাহাজে উঠে নিজের কেবিন-এ যেতে পারে তার বন্দোবস্ত করা ছিল।

আমাদের চলতি গল্পের ঘটনাগুলি সবই বৃহস্পতিবারেই ঘটেছিল। **Thomas Cook**-এর দ্বারোয়ানের কাছে ঐ খবর পেয়ে **King** ও পুলিশ ইন্সপেক্টর কালবিলম্ব না করে কোম্পানীর গাড়ীতে চেপে ডায়মণ্ড হারবার ছুটল। সেখানকার ডাক-বাংলোর মাঠে পেঁাছে খবর পাওয়া গেল যে এক ঘণ্টা/দেড় ঘণ্টা আগে দুজন বিদেশী যুবক সেখানে এসে গাছতলায় তাদের গাড়ী দাঁড় করিয়েছিল এবং ডাক-বাংলোর বেয়ারার কাছ থেকে দুটি কাচের গ্লাস চেয়ে নিয়ে বিয়ার খেয়েছিল। বিয়ার ও অন্যান্য খাবার তাদের সঙ্গেই ছিল। তাদের গাড়ীটা যেখানে দাঁড়িয়েছিল বেয়ারা সে জায়গাটাও দেখিয়ে দিল। সেখানে গিয়ে দেখা গেল যে গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেল-এর নাম ছাপান খালি খাবারের বাক্স ও ভাঙ্গা বিয়ারের বোতল পড়ে রয়েছে। ইন্সপেক্টর-এর জিজ্ঞাসাবাদে বেয়ারাটি স্বীকার করল যে খালি গ্লাস দুটি দেওয়ার জন্যে সে ঐ বিদেশীদের কাছে একখানা ৫৲ টাকার নোট বক্‌শিষ পেয়েছে। বেয়ারার কাছ থেকে আরও খবর পাওয়া গেল যে, তারা খাওয়া-দাওয়া শেষ করে ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে ডায়মণ্ড হারবার রেলওয়ে স্টেশনে যাবার হুকুম দিয়েছে। কোম্পানীর গাড়ী তখনই রেলস্টেশনের দিকে ছুটল; স্টেশনে পেঁাছে দেখা গেল যে ভাগ্যক্রমে কলকাতার সেই 'T' মার্কা ট্যাক্সিটা তখনও দাঁড়িয়ে আছে সেখানে।

ট্যাক্সি ড্রাইভারকে ইন্সপেক্টর জিজ্ঞাসাবাদ করাতে, সে বলল :—

"আমি **Thomas Cook**-এর অফিসের সামনে গাড়ী নিয়ে ভাড়ার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। এমন সময় **Thoms Cook**-এর একজন দ্বারোয়ান আমায় ডাকে। আমি **Thomas Cook**-এর দরজায় গাড়ী লাগাবামাত্র দুজন সাহেব দুটি কার্ড-বোর্ডের বাক্সে খাবার ও মদের

বোতল নিয়ে আমার ট্যাক্সিতে উঠে খালি 'ডায়মণ্ড হারবার' কথাটি বলে। গাড়ী start করা মাত্র তারা কেবল হো হো করে হেসে এ-ওর গায়ে ঢলে পড়ছিল। প্রথম ৫।৭ মিনিট তারা খালি হেসে গড়িয়েছে—তারপর ও হাসতে হাসতে নিজেদের ভাষায় পরস্পরের মধ্যে কি বলাবলি করেছে, তার একবর্ণও আমি বুঝতে পারি নি। খিদিরপুর ছাড়িয়ে Diamond Harbour Road-এর এক pump থেকে আমি যখন Petrol নিই, তাদেরই একজন একখানি ১০৲ টাকার নোট বার করে দাম দেয়; change ফেরৎ নেয় নি, তারপর বেহালা ছাড়িয়েই বাক্স খুলে খাবার খেতে আরম্ভ করে। আমি সোজা Diamond Harbour ডাক বাংলোতে গাড়ী নিয়ে আসি। এবং এক গাছের ছায়ায় গাড়িটা দাঁড় করাই। গাড়ীর আওয়াজ শুনে একজন বেয়ারা এগিয়ে এলে সাহেবরা ইশারা করে তাকে দুটি গ্লাস আনতে বলে। বেয়ারা দুটি কাচের গ্লাস এনে দিয়ে দূরে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। তাদের সংগের খাবারগুলো শেষ করে তারা দুটো গ্লাসে দুগ্লাস মদ ঢেলে খেল। খাওয়া শেষ হলে বেয়ারাকে ডেকে গ্লাস দুটো তার হাতে ফেরৎ দিয়ে তাকে ৫৲ টাকার নোট একখানা বকশিষ দিল। তারপর আবার গাড়িতে উঠে আমায় বললে—"Railway Station" আমিও গাড়ী ঘুরিয়ে নিয়ে ওদের স্টেশনে পৌঁছে দিই। স্টেশনে পৌঁছে দেখি আমার Meter-এ ২৩৲ ভাড়া উঠেছে। যাতায়াতের দরুণ আমি ওদের "Fifty Rupees" বলি। আমার হাতে একখানা ১০০৲ টাকার নোট গুঁজে দিয়ে তারা খুব হাসতে হাসতে স্টেশনের ভিতর ঢুকল—বাকী টাকার জন্যে একবারও পেছন ফিরে তাকাল না। তাদের এই বরাবরকার দিলদরিয়া মেজাজ দেখে এবং নিজে ভাড়া ও বকশিষ বাবদ এতগুলো টাকা একসংগে পেয়ে আমার বড় মজা লাগল। ওরা পরে কি করে বা ফিরে আসে কিনা দেখবার জন্যে আমি গাড়ী থেকে নেমে ওদের পিছু পিছু স্টেশনের ভিতর গেলাম। দেখলাম ওদের একজন গিয়ে দুখানা টিকিট কিনে আনল এবং কলকাতা যাবার যে ট্রেণখানা দাঁড়িয়েছিল তাতে ওরা উঠে পড়ল। অল্পক্ষণ পরেই ওদের ট্রেণ ছেড়ে দিল। গাড়ী ছাড়ার সংগে সংগে ওরা দুজনেই আমাকে হাত তুলে সেলাম করল। আমার গাড়ীর Engineটা বড্ড গরম হয়ে গিয়েছিল, তাই সেটাকে ঠাণ্ডা হতে দেবার জন্যে ফিরে এসে এখানে একটু অপেক্ষা করছি। এর বেশী কিছু জানি

না।" তার কথা শেষ হতেই Inspector-টি স্টেশনের ভিতরে গিয়ে Sealdah Station-এ Telephone করে জানতে পারলেন যে ঐ ট্রেণখানি তখনও Sealdah পৌঁছায় নি। তৎক্ষণাৎ Sealdah G. R. P. কে Telephone করে ছোকরা সাহেব দুটির বিবরণ দিয়ে বলে দিলেন যে তারা Sealdah পৌঁছানমাত্র যেন তাদের গ্রেপ্তার করা হয় এবং আটকে রাখা হয়—তিনি King-কে নিয়ে ঘণ্টা খানেকের মধ্যে মোটরে Sealdah পৌঁছাচ্ছেন।

কোম্পানীর গাড়ীতেই Sealdah station-এ ফিরে এসে Inspector ও King জানতে পারলেন যে ও ট্রেণ হতে কোন বিদেশীই নামে নি। তখন এই সিদ্ধান্ত করা হল যে তারা Dhakuria, Ballygunj কি মাঝ পথের ঐ রকম কোন স্টেশনে নেমে হাওয়া হয়েছে এবং তখন আর তাদের খোঁজা বৃথা। Inspector-এর পরামর্শ মত ঠিক হল যে তারা যখন Overland Mail এ passage book করেছে তখন রাত্রে Howrah Station-এ সেই গাড়ীতে ছাড়া তাদের আর ধরবার চেষ্টা করলে কোন ফল হবে না; ইতিমধ্যে গাড়ীর দালাল Henryর কাছে থেকে কি খবর পাওয়া যায় দেখা যাক। Inspector-এর phone পেয়ে ঐ দিন বৈকালেই Henry লালবাজারে এসে Inspector-এর সংগে দেখা করল এবং Inspector-এর জিজ্ঞাসাবাদের উত্তরে বলল—"আমি Motor Car প্রভৃতি অনেক জিনিষেরই কেনা বেচার দালালি করি। ৪ দিন আগে এক মক্কেলের সংগে দেখা করবার জন্যে আমি Great Eastern Hotel-এর Bar-এ বসে whisky খাচ্ছিলাম ও অপেক্ষা করছিলাম। এই দুটি যুবকও পাশের টেবিলে বসে whisky খাচ্ছিল। কিছুক্ষণ কাটবার পর ঐ যুবক দুটি উঠে এসে আমার সংগে ভাংগা ভাংগা ইংরেজীতে আলাপ করে নিজেরাই Motor Car-এর কথা তুলল। তখন আমি তাদের বললাম যে আমি মোটর গাড়ীর দালালিও করি। ওরা তখন আমায় জিজ্ঞাসা করল যে সব চেয়ে দামী গাড়ী কেনার মত ভারতীয় খরিদ্দার আছে কিনা। আমি তার জবাবে তাদের বলি যে সে রকম ভারতীয় খরিদ্দার হচ্ছে এদেশের রাজা মহারাজা বা বড় বড় জমিদার, তবে তাঁরা একটু সস্তায় জিনিষ খোঁজেন। তারপর আমাদের মধ্যে অনেক রকমের কথাবার্তা হল। শেষে তারা আমায় বলল যে কি রকমের কোন design-এর এবং কি রঙের গাড়ী আমার মক্কেলরা পছন্দ করেন, আমি যেন তার পরদিন তাদের জানাই। আমি বিম্বাগড়ের মহারাজার সংগে তাঁর Chowringheer Palace-এ দেখা

করি এবং কাঞ্চনপুরের জমিদারের সংগে তাঁর Park Street-এর Mansion-এ সাক্ষাৎ করি—এবং তাঁদের সংগে কথাবার্তা বলে তাঁদের পছন্দ মত গাড়ীর Maker, pattern, design ইত্যাদি পরদিনই যুবক দুটিকে জানাই এবং সেই সংগে তাদের বলি যে মহারাজা ও জমিদার ৫৬ হাজার টাকা পর্যন্ত নগদ দিয়ে তাঁদের চাহিদামত গাড়ী কিনতে রাজী আছেন। শুনে তারা আমাকে বুধবার সন্ধ্যায় Great Eastern Hotel-এ তাদের সংগে Dinner খাবার নেমন্তন্ন করল। গতকাল Dinner-এর শেষে তারা আমাকে আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১০টায় Great Eastern Hotel-এর Lounge-এ অপেক্ষা করতে বলে। সেই মত আমি নির্দিষ্ট স্থানে ও সময়ে তাদের জন্যে অপেক্ষা করি। বেলা সাড়ে দশটা নাগাদ তাদের একজন একখানা নতুন গাড়ী নিয়ে আসে এবং তার ৪।৫ মিনিট পরেই আর একজন আর একখানা ঐ রকম গাড়ী নিয়ে হাজির হয়। ঐখান থেকেই আমরা Park Street-এ কাঞ্চনপুরের জমিদারের Mansion-এ যাই এবং তাদের পছন্দমত গাড়ী তার Blue-Book সমেত তাদিকে দিয়ে ৫৬ হাজার টাকা নগদ নিয়ে সেই মর্মে সেই গাড়ীর মালিক এক রসিদ লিখে দেয়। সেখান থেকে আমরা সবাই কাঞ্চনপুরের জমিদারের Manager-কে সংগে নিয়ে Chowringhee-তে বিম্বাগড়ের মহারাজার palace-এ আসি। সেখানেও ৫৬ হাজার টাকা নগদ বুঝে নিয়ে দ্বিতীয় গাড়ীর মালিক আর একখান রসিদ সই করে গাড়ী ও তার Blue book ইত্যাদি দিয়ে দেয়। তারপর যুবক দুটি আমার সংগে করমর্দন করে একখানা Taxi চেপে Chowringhee থেকে Great Eastern Hotel-এ চলে গেল। আমি গাড়ী দুখানা এবং তাদের নতুন মালিকদের Manager দুজনকে নিয়ে সোজা Motor Vehicles Department-এ গিয়ে D. C.—Mr. Smith-এর সংগে দেখা করে গাড়ী দুখানার রেজিস্ট্রীর বন্দোবস্ত করে দিই। ঐ গাড়ী দুখানা যে ঐ দিন সকালেই প্রথম রেজিস্ট্রী হয়েছিল, সে খবর আমি জানতাম না।

সব দেখে শুনে Jones এবং King যেন হতভম্ব হয়ে গেলেন। এ রকম দিনে ডাকাতি বা পুকুর-চুরি যে আধুনিক সভ্য জগতে কি করে সম্ভব হল, সেটাই তাঁরা বুঝতে পারছিলেন না। তখন তাঁদের একমাত্র আশা যে রাত্রে Overland Mail-এ লোক দুটোকে নিশ্চয়ই ধরা যাবে।

যথাসময়ে রাত্রে Police Inspector-এর সংগে King হাওড়া

স্টেশনে উপস্থিত হল এবং প্রথমেই Reservation office-এ গিয়ে Overland Mail-এর Reservation chart দেখে অনেকটা আশ্বস্ত হল ওদের দুজনের নামেই Berth reserve করা আছে দেখে। বেলা এ্যাগারোটার পর থেকে এতক্ষণে King-এর মুখে হাসি ফুটলো—এইবার বোধ হয় বাছাধনরা ধরা পড়ল। কিছুক্ষণ বাদে Thomas Cook-এর লোকও মালপত্র নিয়ে platform-এ এসে পেঁাছাল। অন্যান্য যাত্রীদের মালের সংগে এই মালপত্রও গাড়ীতে চাপান হল। Inspector অবশ্য Thomas Cook-এর Steward-কে বলে রেখেছিলেন যে হয়ত ঐ মালের মালিকদের পুলিশ গ্রেপ্তার করবে; সে ক্ষেত্রে যেন ঐ মালগুলি তারা নামিয়ে নিয়ে গিয়ে নিজেদের হেফাজতে রেখে দেয়।

গাড়ী ছাড়তে যখন আর মাত্র মিনিট দশেক দেরী, তখন দেখা গেল যে সেই যুবক দুটি টলতে টলতে আসছে—বেহেড্ মাতাল, পরস্পর পরস্পরের গায়ে পড়ে যাচ্ছে ও দুর্বোধ্য ভাষায় গালাগালি করছে। King-এর তাদিকে চিনতে দেরী হল না। Inspector তখনই তাদের দুজনকে গ্রেপ্তার করে King-এর গাড়ীতে বসিয়ে দিলেন এবং Thomas Cook-এর লোককে বলে দিলেন যে তারা যেন মালগুলি নিয়ে গিয়ে সাবধানে রেখে দেয়, পরদিন কোন সময় আদালতের হুকুম নিয়ে ঐ মালপত্র পুলিশ তাদের কাছ থেকে নিয়ে নেবে।

যুবক দুটিকে King লালবাজারে পেঁাছে দিলেন—তাদের ভাব দেখে মনে হচ্ছিল যে তারা ঠিক করেছে যে ধরা যখন পড়েই গেছি; তখন আর বিদেশে বিভুঁয়ে বৃথা গোলমাল বা পালাবার চেষ্টা করি কেন? সারারাত তারা Lalbazar Lock up-এ বন্দী হয়ে রইল। পরের দিন বেলা দশটার সময় তাদের Deputy Commissioner-এর কাছে হাজির করা হল। ডেপুটি কমিশনারকে তারা অনুরোধ করল যেন তাদের ব্যাপারে German Consul-কে খবর দেওয়া হয়। Deputy Commissioner-এর Telephone পাওয়া মাত্রই German Consulate থেকে একজন দোভাষী লালবাজারে এসে ঐ যুবক দুটির সংগে দেখা করল। তাদের সংগে কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর দোভাষী Deputy Commissioner-কে জানাল যে যুবক দুটি সম্পূর্ণ নির্দোষ, সে কারণ হয় তাদের এখনই ছেড়ে দেওয়া হোক, না হয় কিছুমাত্র দেরী না করে তাদের কোর্টে পাঠান হোক Magistrate এর কাছে বিচারের

জন্যে। তার জবাবে Deputy Commissioner দোভাষীকে বললেন যে ঐ দিনই বেলা দুটোর সময় ঐ যুবক দুটিকে Chief Presidency Magistrate-এর কোর্টে হাজির করা হবে, দোভাষী যেন ওই সময় সেই কোর্টে উপস্থিত থেকে ওদের বক্তব্য পেশ করেন।

যথাসময়ে German যুবক দুটিকে কলকাতার Chief Presidency Magistrate-এর কোর্টে হাজির করা হল—সঙ্গে পুলিশের তরফ থেকে এক Remand Application, তাতে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ লেখা এবং 'প্রায় একরকম হাতেনাতেই আসামীদিকে ধরা গেছে' এই রকম মন্তব্য করা। Case-Diary-তে Henry, Taxi-Driver, Thomas Cook কোম্পানীর লোক প্রভৃতি সকলের বিবৃতি। ঐ Remand Application-এ দুটি প্রার্থনা ছিল। প্রথম—সাত দিনের জন্যে আসামী দুজনকে জামিন না দিয়ে পুলিশের হেফাজতে পাঠান হোক; দ্বিতীয়—Thomas Cook-এর উপর হুকুম দেওয়া হোক যেন তারা আসামী দুজনের সমস্ত জিনিষপত্র এই মামলার তদন্তের জন্যে পুলিশের জিম্মায় দেয়। মোটর কোম্পানীর তরফ থেকে King-ও কোর্টে উপস্থিত—সঙ্গে একজন খ্যাতনামা ইংরেজ এ্যাটর্নি। দোভাষীও উপস্থিত।

টিফিনের পর হাকিম কোর্টে বসতেই প্রথমে এই মামলাব কাগজপত্র পেশ করা হল। হাকিমের নথি পড়া শেষ হওয়া মাত্র আসামীদের তরফ থেকে ঐ দোভাষী ভদ্রলোক এই কথা কয়টি বললেন,—হুজুর, যুবক দুটি সম্পূর্ণ নির্দোষ; তারা কারও কোন ক্ষতি করে নি। গাড়ীওয়ালা কোম্পানী কি বলতে চায় যে গাড়ীর দামের দরুণ ৬৬ হাজার টাকা করে যে দুখানা চেক আসামীরা পরশু বিকেলে দিয়েছিল, আজ এই বেলা আড়াইটা পর্যন্ত সেই চেক দুখানার টাকা তারা পায় নি বা তাদের Bank Account-এ জমা হয় নি? তারা কি বলতে পারে বা চায় যে ঐ চেক দুখানা dishonoured হয়েছে? দোভাষী মারফত আসামীদের বক্তব্য শুনে আদালত শুদ্ধ সকলে স্তম্ভিত!

হাকিম তৎক্ষণাৎ বললেন—আমি দশ মিনিট সময় দিচ্ছি। এই দশ মিনিটের মধ্যেই আমি Bank থেকে এ বিষয়ে খাঁটি খবর চাই। আপনারা এখনই Telephone করে খবর নিন। আপিসের নাম করে তাদের Bank-এ Telephone করা মাত্র King খবর পেল যে বৃহস্পতিবার দিনই চেক

দুখানা honoured হয়েছে এবং সেই চেক দুখানার টাকা কোম্পানীর হিসাবে জমা পড়েছে। King-এর এ্যাটর্নি তৎক্ষণাৎ হাকিমকে সে খবর জানালেন এবং সংগে সংগেই হাকিম সেই German যুবক দুটিকে বেকসুর খালাস দিলেন।

খালাস পাবার পরই ঐ যুবক দুটি হোটেলে না গিয়ে সোজা আর এক বড় ইংরেজ এ্যাটর্নির আপিসে গিয়ে গাড়ীওয়ালা কোম্পানীর নামে এক এক একজনের দরুণ পাঁচ লক্ষ টাকা করে খেসারতের দাবী করে নোটিশ দিল। শুনেছি যে কোম্পানী খুব মোটা টাকা দিয়ে দুদিনের মধ্যেই ব্যাপারটা যুবক দুটির সংগে মিটিয়ে ফেলেছিল। কত করে এক একজনকে দিতে হয়েছিল, সেটা অবশ্য জানি না। হ্যাঁ, খেলোয়াড় বটে!

আসুন এবার আমার সংগে কল্পনা রাজ্যের টিকিট কেটে পরের বৃহস্পতিবারের Overland Mail-এ, যে ট্রেণে ঐ যুবক দুটির জন্যে একটি coupe reserve করা হয়েছে। আসুন আমরা লুকিয়ে দেখি ওরা কি বলে ও করে। ঐ দেখুন, ওরা এসে waiter-কে ডেকে whisky ও soda দিতে বললে। তারপর ওদের পরস্পরের মধ্যে কি কথাবার্তা হচ্ছে শুনতে পাচ্ছেন ত?

প্রথম—দাঁড়াও, আগে বিম্বাগড় ও কাঞ্চনপুরের স্বাস্থ্য-পান করি।

দ্বিতীয়—(পান করিতে করিতে)—কিন্তু ঠিক সময়ে Henry ব্যাটার দেখা না পাওয়া গেলে কিছুই হত না।

প্রথম—হত, হত—না হয় কিছুদিন দেরী হত। কিন্তু ব্যাটারা যদি প্রথমেই তাদের Bank-এ Telephone করে cheque দুখানার খবর নিত, তাহলে সবই ভেস্তে যেত। মাঝের থেকে অতগুলো টাকা লোকসান হ'ত।

দ্বিতীয়—আরে তুমিও যেমন। যে রকম ভাবে ধাপে ধাপে ঘটনাগুলো সাজান হল, তাতে করে সব ব্যাটারই মাথা ঘুরে গেল। যে লোক এ অবস্থায় মাথা ঠিক রেখে গোড়ায় Bank-এ সন্ধান নিতে যায়, সে রকম মাথাঠাণ্ডা লোক দুনিয়ায় আছে বলে আমার মনে হয় না।

প্রথম—তুমি ঠিকই বলেছ। নিজের Bank-এ খবর নেওয়া?—সে ত যখন তখনই হতে পারে। কিন্তু যে পাখী বার বার নাকের ডগার

কাছে এসে ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ করে উড়ে পালিয়ে যাচ্ছে, আগে তাকে ধরবার নেশা মানুষকে এমন করে পেয়ে বসে যে সে দিশ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ঐ পাখীর পেছনেই আর সব ভুলে গিয়ে ছুটতে থাকে। এই হল মানুষের স্বভাব!

দ্বিতীয়—আরে যেতে দাও—যত সব ইয়ে। ওটুকু risk না নিয়ে কি আর দুনিয়ায় কখনও কোন বড় কাজ করা যায়? থাক্, এখন আর এক পাত্তর ঢাল তো!

এবার বলছি অন্যরকম একদল খেলোয়াড়ের কথা।

হরিরাম সেরাওগী নামে একজন লোকের পশ্চিম বিহারের কোন এক গ্রামে বাড়ী। সেখানে গঙ্গার ধারে তার একটি লোহা ঢালাই-এর ছোট খাট কারখানা ছিল। কলকাতাতেও তার কিছু কাজকর্ম ছিল। সুতরাং সে কলকাতাতেও থাকত এবং মাঝে মাঝে দেশেও যেত। দেশে যাওয়ার সময় সে প্রতিবারই কলকাতার কালোয়ারদের কাছ থেকে পুরোনো ভাঙ্গা লোহালক্কড় কিনে নৌকোয় বোঝাই করে গঙ্গানদী দিয়ে দেশে নিয়ে যেত। এক একবার দেশে পৌঁছুতে তার পনের-ষোলো দিনও লেগে যেত। এই রকম করে মাল নিয়ে যাবার সময় একবার ভাগলপুর ছাড়িয়ে সুলতানগঞ্জের পাহাড়ে ধাক্কা লেগে তার নৌকোটি ডুবে যায়। নদীতে তখন জল কম ছিল, সবাই প্রাণে বেঁচে গেল, কিন্তু মালপত্র কিছু লোকসান হল। এই লোকসান উসুল করবার জন্যে সে এক খেলা খেলে বসল।

Triton Insurance Company বলে একটি বড় বিলিতি ইনসিওরেন্স কোম্পানী ছিল। তারা সব রকম Insurance বা বীমার কাজ করত; যেমন জীবন-বীমা, চুরি-বীমা, অগ্নি-বীমা, জলযাত্রা-বীমা ইত্যাদি। একটা মতলব ঠিক করে হরিরাম কলকাতার গঙ্গা থেকে একটি বড় নৌকো বন্দোবস্ত করে সে কালীঘাটের গঙ্গায় নিয়ে গেল। তারপর তিন দিন ধরে বলরাম বোসের ঘাটের কাছে কয়েক গাড়ী পুরোনো লোহালক্কড় ঐ নৌকোয় বোঝাই করল। ঐ মালগুলির অধিকাংশই ছিল কালীঘাট, ঢাকুরে, টালিগঞ্জ প্রভৃতি জায়গার কালোয়াররা যে সব মাল অকেজো বলে একরকম

ফেলেই দিয়েছিল, সেই সব মাল। হরিরামের দলে ৯।১০ জন লোক ছিল। তাদেরই একজন হরিরামের নামে একখানা দলিল করে দিল এই বলে যে, সে গড়িয়া অঞ্চলের এক কারখানার মালিক এবং সে তার সেই কারখানা তুলে দিচ্ছে বলে তার কারখানার যন্ত্রপাতি নগদ ৪৬,০০০্ হাজার টাকায় হরিরামের কাছে বিক্রি করেছে। হরিরামও সেইসব যন্ত্রপাতি কিনছে বলে বিল, দলিল ইত্যাদি কাগজ-পত্রে সই করে দিলে। নৌকোর দাঁড়ি মাঝি ছিল ৪।৫ জন। প্রথমে জানা যায় নি, কিন্তু পরে পুলিশ খোঁজ পেয়েছিল যে ঐ দাঁড়ি মাঝি সবাই ছিল হরিরামের দেশের লোক। বিজয় নামে একজন বাঙ্গালী ঐ নৌকোয় মাল তুলে দিয়ে বলরাম বোসের ঘাটে বসে সার্টিফিকেট লিখে দিল যে পুরো ৪৬,০০০্ হাজার টাকারই যন্ত্রপাতি সে ঐ নৌকোয় বোঝাই করিয়ে দিয়েছে। এই সমস্ত কাগজপত্র তৈরী করে হরিরাম ও জি. ডি. রমন নামে একজন লোক কালীঘাট বলরাম বোসের ঘাট থেকে হরিরামের দেশ পর্যন্ত জলযাত্রার একখানি বীমার দরখাস্ত ঐ Triton Insurance Co-র কাছে পেশ করল। ইনসিওরেন্স কোম্পানীর কাগজপত্রে অনেক রকম সার্টিফিকেট দিতে হয়। সব রকম সার্টিফিকেটই এরা দিয়ে দিল।

তখন আশ্বিন মাস। বর্ষা শেষ হয়ে গেছে। পুজো এসে পড়েছে। মহাষ্টমী কি মহানবমীর দিন ঐ নৌকোর মাঝি সাউথ ডিভিসন পোর্ট পুলিশের থানায় এজাহার লেখাল যে ৩ দিন ধরে বলরাম বোসের ঘাটে মাল বোঝাই করার পরে যেমন কালীঘাটের গঙ্গায় ভাটা পড়েছে অমনি তারা সেই ভাটায় এসে বড় গঙ্গায় পড়ে। তাদের উত্তরমুখো যাবার কথা কিন্তু ভাটার টানে বড় গঙ্গায় তাদের দক্ষিণমুখো টেনে নিয়ে যায় দেখে তারা নোঙ্গর ফেলে জোয়ারের জন্যে অপেক্ষা করে। প্রায় ৩ ঘণ্টা বাদে জোয়ার আসে, কিন্তু জোয়ারের তেজ বাড়তে বাড়তে সন্ধ্যে হয়ে যায়। সেই সময় নোঙ্গর তুলে তার নৌকো যখন প্রিন্সেপ্‌স্ ঘাটের কাছাকাছি এসে পড়েছে তখন সন্ধ্যের অন্ধকারে একটি বয়ার (Buoy) ধাক্কা লেগে তার নৌকোটি ডুবে যায় এবং সেই সঙ্গে নৌকোর মধ্যের প্রায় ৪৬,০০০্ টাকার যন্ত্রপাতি ডুবে যায়। নৌকোর মালিক সে নিজে এবং যন্ত্রপাতির মালিক বিহার নিবাসী শ্রীহরিরাম সেরাওগী।

দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে সেদিন সব আপিস, কাছারী বন্ধ ছিল। তখন

ছুটির মধ্যে জরুরী কাজের জন্যে কলকাতা পুলিশকোর্টে কয়েকদিন অন্তর অন্তর একজন করে হাকিম বসতেন। ছুটির মধ্যে এরপর যে দিন পুলিশ কোর্টে হাকিম বসলেন, ঐ মাঝি তার ঐ এজাহারের বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে ঐ হাকিমের সামনে এক Affidavit করল। সেই Affidavit-টি ও অন্যান্য Claim Papers তৈরী করে হরিরাম সেরাওগী Triton Insurance Co-র কাছে সেগুলো দাখিল করে ৪৬,০০০৲ হাজার টাকা দাবী করল—কারণ Policy-Holder সে নিজে।

এই দাবী পাওয়ার পর Triton Insurance Co. কলকাতা পোর্ট পুলিশের ডেপুটি কমিশনারের কাছে এক চিঠি লিখে জানালেন যে এ ক্ষেত্রে Policy খানা দেবার ৩।৪ দিনের মধ্যেই এই accident হয়েছে বলে ৪৬,০০০৲ হাজার টাকার দাবী করা হয়েছে। এই চিঠির শেষে লেখা ছিল—

......We shall be grateful if you will please advise us whether there is anything in the matter which would indicate the wisdom of deferring a settlement cf the claim.

Port Polic৫-এ এখন Special Staff নামে একটি টিকটিকি বিভাগ আছে। সেই বিভাগটি তখন অল্পদিন খোলা হয়েছে। এটা ১৯২৮ সালের ঘটনা। Port Police-এর Deputy Commissioner তখন Fairweather নামে একজন ইংরেজ I. P. অফিসার ছিলেন। পরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি কলকাতার Commissioner of Police হয়েছিলেন। তিনি Triton Insurance Co-র ঐ চিঠি পেয়ে তাঁর অধীনস্থ কয়েকজন Detective Office1-কে লাগিয়ে দিলেন এই ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে।

পোর্ট কমিশনারের আওতায় দু দল ডুবুরী আছে। একদল হল মাঝি শ্রেণীর লোক—তাদের বলে Skin Divers, অর্থাৎ নাঙ্গা বা উলঙ্গ ডুবুরী। এরা দম বন্ধ করে জলের নিচে থাকার অভ্যাস করেছে। এরা খালি গায়ে জলের নিচে নেমে হেঁটে নদীর তলাটা খুঁজে দেখে এবং হারান অর্থাৎ ডুবো-মাল উদ্ধার করে। আর একদল আছে—তাদের বলে Dress Divers; এরা ডুবুরীর পোষাক পরে অনেকক্ষণ পর্যন্ত জলের নিচে থেকে

ফিরে দেখতে পারে। হরিরামের যন্ত্রপাতি সমেত নৌকোডুবির ব্যাপারে খোঁজ করবার জন্যে Fairweather সাহেব এই দুদল Diver বা ডুবুরীদেরই লাগিয়ে দিলেন এবং তাদের সংগে সংগে Crane বা কপিকল-সংযুক্ত বোটও দিলেন। যেখানে কালীঘাটের গংগা এসে বড় গংগায় পড়েছে, সেখান থেকে আরম্ভ করে চাঁদপাল ঘাট পর্যন্ত সমস্ত নদীর তলাটা এই ডুবুরীর দল চষে ফেললে। যেখানে যা কিছু তারা পেল, সবই তারা হুকে আটকে দিতে লাগল এবং তা Crane-এ করে বোটে তুলে ফেলা হল। যা পাওয়া গেল তার অধিকাংশই হচ্ছে কালোয়ারদের পরিত্যক্ত ভাংগা রদ্দি মাল; যন্ত্রপাতি বলতে যা পাওয়া গেল তার দাম দু-একশো টাকার বেশী হবে না।

এই ভাংগা মালের অল্প দূরে নৌকাখানিও পাওয়া গেল—তার গায়ে ধাক্কা লাগার কোনও চিহ্নই ছিল না। দশ-পনর দিনের চেষ্টায় নদীর গর্ভে সমস্ত জায়গাটা যখন পরিষ্কার হয়ে গেল, তখন Fairweather সাহেব Triton Insurance Co.-কে লিখলেন যে নদী-গর্ভের সমস্ত মালই তোলা হয়েছে, Insurance Policy-তে বা পরে claim-এর সময় যন্ত্রপাতির যে তালিকা দেওয়া হয়েছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। অতএব Insurance Company যেন হরিরামের claim-এর টাকা না দেন; পুলিশ থেকে আসামীদের গ্রেপ্তার করার বন্দোবস্ত হচ্ছে।

প্রথমেই ডুবো নৌকোর মাঝি ও হরিরামকে গ্রেপ্তার করা হল। হরিরামের বাড়ী তল্লাসী করে কয়েকখানা কাগজ পাওয়া গেল, যা থেকে দেখা গেল যে টালিগঞ্জের এবং কাছাকাছি এলাকার কালোয়ারদের গুদাম থেকে হরিরাম কয়েক গাড়ী রদ্দি মাল কিনেছে, এবং সেই সব কাগজ থেকে রমণ আর বিজয়ের সই পাওয়া গেল ও কতকগুলি গরুর গাড়ীওয়ালার লাইসেন্স নম্বর পাওয়া গেল। রমণ আর বিজয়কেও গ্রেপ্তার করা হল। গ্রেপ্তারের পরই বিজয় এক স্বীকারোক্তি করে বসল। তাতে সে ব্যাপারটা আগাগোড়া খুলে বলল। দেখা গেল প্রথমে রমণের মারফত যে মালগুলো ঠিক করা হয়েছিল—সেগুলোর দাম সবশুদ্ধ ৪০০ থেকে ৫০০ টাকার মধ্যে। তার পরে নৌকোর মাঝি-দাঁড়িদের সংগে বন্দোবস্ত করা হল যে কালীঘাটের বলরাম বোসের ঘাটে মালগুলো বোঝাই হলে পর বড় গংগায় নৌকোখানা নিয়ে গিয়ে সেটা তারা কাৎ করে ডুবিয়ে দেবে এবং দাঁড়ি-মাঝিরা সাঁতরে উঠে পোর্ট পুলিশের থানায় গিয়ে মিছে এজাহার লেখাবে। বিজয় আরও বললে যে গরুর গাড়ীর

গাড়ওয়ানদের সে দেখিযে দিতে পারবে। কাগজপত্র থেকে যে গাড়োয়ানদের নম্বর পাওয়া গিয়েছিল, সেই গাড়োয়ানরা হরিরাম, রমণ, বিজয় ও নৌকোর মাঝি সবাইকে সনাক্ত করলে। জলের নিচে থেকে যে সব মাল উদ্ধার করা হযেছিল তারা সে সব মাল চিনতে পারলে এবং তার থেকে যে মালগুলি তারা নৌকোয় বোঝাই করেছিল সেগুলি দেখেয়ে দিলে। সে মালের তালিকার সংগে হরিরামের কাছে পাওয়া কাগজে যে সব মালের উল্লেখ ছিল, তা মিলে গেল। ফলে বিজয়কে সাক্ষী করে নিয়ে মকদ্দমা চালান হল।

প্রথমে **Chief Presidency Magistrate Mr. Roxburgh**-এর কোর্টে মামলা হয়। সেখানে সমস্ত কাগজপত্র এবং জলের নিচে থেকে তোলা লোহা লক্কড় প্রমাণ করা হল। ঐ লোহালক্কড় পুলিশ লরীতে করে নিয়ে আসত এবং তাদের হেফাজতেই থাকত। তারপর মামলা বিচারের জন্যে হাইকোর্টে দায়রায় পাঠান হল। সেখানে কলকাতার বড় বড় ইঞ্জিনীয়ারিং আপিস থেকে আলাদা আলাদা করে তিন জন ইঞ্জিনীযারকে সাক্ষী ডাকা হল। ইণ্সিওর করবার সময যে মালের তালিকা দেওয়া হযেছিল এবং যে সব মালের জন্যে **claim** দেওযা হযেছিল ঐ দু দফায একই মালের কথা ছিল এবং তার কোন মালের সংগে নদীগর্ভ থেকে তোলা কোন মালেরই মিল নেই, এটা তাঁরা প্রত্যেকে পৃথক ভাবে মিলিযে দেখে হাইকোর্টে জুরীর সামনে সাক্ষী দিলেন। তাঁরা পৃথকভাবে আরও প্রমাণ করলেন যে তল্লাসীর সময়ে হরিরামের বাডীতে পাওযা কাগজে—যাতে বিজয, রমণ প্রভৃতির নাম লেখা ছিল—যে সব মালের কথা লেখা আছে তার সংগে গংগার গর্ভ থেকে যে মাল তোলা হযেছে তার মিল আছে।

এ মামলায হাইকোর্টে জজ ছিলেন **Mr. Justice Buckland.** আসামী পক্ষে **Mr. B C. Chatterjee, Mr. S. K. Sen** প্রভৃতি খ্যাতনামা ব্যারিষ্টাররা অনেকেই ছিলেন। সরকার পক্ষ থেকে মামলা পরিচালনা করেছিলেন তখনকার **Standing Counsel Mr. Panckridge**—যিনি পরে হাইকোর্টের জজ হযেছিলেন। তখনকার দিনে কলকাতার **Junior Public Prosecutor**-কে **Public Prosecutor, High Court**-এর সমস্ত কাজই করতে হত। **High Court Sessions**-এর সব মামলাতেই তাই আমাকে থাকতে হত, এবং এ মামলাতেও আমি ছিলাম।

দেশ স্বাধীন হবার আগে **High Court**-এর যে বিভাগে দাযরা মকদ্দমা

হত তাকে Crown Side বলত। এই Crown Side-এর আপিসের মালিক যিনি থাকতেন তাঁকে Clerk of the Crown বলা হত। এখন সেখানে Clerk of the State বলে একজন Officer আছেন। একবার এক সাক্ষী মফঃস্বল থেকে হাইকোর্টে সাক্ষী দিতে এসেছিল। মামলা শেষ হবার পর তার যাতায়াতের খরচার বিল "To the Clerk of the Crown" এই নামে না লিখে, লিখে বসেছিল এইভাবে—"To the Clown of the Clerks"! সে সময় Mr. Moses নামে এক বৃদ্ধ ব্যারিস্টার Clerk of the Crown ছিলেন। যাঁরা ১৯৪৪-৪৫ সালেও হাইকোর্টের Sessions Court-এ ঢুকেছেন তাঁরা দেখে থাকবেন যে জজ সাহেবের এজলাসের ঠিক নিচেই যেখানে কোর্টের Officer-রা বসে থাকেন, তার ঠিক মাঝখানে এক সৌম্যমূর্তি, পক্ককেশ বৃদ্ধকে। ইনিই ছিলেন সেই Moses সাহেব। তিনি নিজেই আমাকে সেই 'The Clown of the Clerk'-এর নামে লেখা দরখাস্তটি দেখান। এ নিয়ে পরে আমরা অনেক হাসাহাসি করেছি। টেলিফোনেও অনেক সময়—"May I speak to the Clown of the Clerks ?"—বলে ডেকেছি। আদালতে মামলা করতে করতে অনেক সময় 'এটা আনান হোক', 'ওটা আনান হোক', 'এ কাজটা করা হোক', 'ওটা করা হোক'—এই মর্মে মৌখিক দরখাস্ত করা হত। Moses সাহেব সব সময়েই জজ সাহেবের কাছে তাঁর আপিসের অসুবিধের কথা জানাতেন—যাকে বলে 'red-tapism'-এর দরুণ অসুবিধে। ফলে সময় সময় মামলা চালানর কাজে একটু অসুবিধে হত। আমি হাইকোর্টের Public Prosecutor হিসেবে দেখেছি যে অনেক দরকারই Moses সাহেবকে আগে বলে রাখলে তিনি তাঁর Head Assistant বা Superintendent-কে ডেকে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলে আগে থেকে বন্দোবস্ত করে রাখতেন। প্রকাশ্য আদালতে জজ সাহেবের কাছে প্রয়োজনটা জানান মাত্রই জজ সাহেবের হুকুম পেতে দেরী হত না। কিন্তু বড় বড় কৌঁসুলীদের অত সময়ও নেই, অত ধৈর্যও নেই। মামলা করতে করতে যখন যেটার দরকার হল তার জন্যে এক মৌখিক দরখাস্ত করে বসলেন। এখানে বলা দরকার যে হাইকোর্টে লিখিত দরখাস্তের চেয়ে মৌখিক দরখাস্তেরই রেওয়াজ বেশী। যখনই যে দরখাস্ত হয় আর তার উপর যা হুকুম হয় সেগুলো সংগে সংগেই কোর্টের minute-এ লেখা হয়ে যায়—আলাদা দরখাস্ত আর দিতে হয় না। কৌঁসুলী

সাহেবরা হঠাৎ এ রকম দরখাস্ত করলেই Moses সাহেব উঠে জজ সাহেবের কাছে তাঁর আপিসের তরফ থেকে অসুবিধের কথা জানাতেন। তাই বড় কৌঁসুলীরা বলতেন যে Moses লোকটা কেবল বাগড়া দেবার জন্যেই আছে। ইংরেজ কৌঁসুলীরা বলতেন,—"Oh, that fellow Moses !"

হরিরামের মামলায় প্রথম দিন যখন লোহালক্কড়গুলো হাইকোর্টে আনা হল, তখন সবগুলো ওপরে তোলা সম্ভবপর হল না, কারণ তার অর্দ্ধেক মালেই Sessions Court-এর সামনের বারান্দা ভরে গেল। ঐ দেখে আমি Moses সাহেবের সঙ্গে একটু পরামর্শ করি। Sessions Court-এর নিচে দুটি হাজত ঘর আছে—যাকে বলা হয় "Prisoners' Cell" তার একটি cell পুরুষ আসামীদের জন্যে, অপরটি মেয়ে আসামীদের জন্যে। সেবারের Sessions-এ পুরুষ আসামী অনেকগুলি ছিল, কিন্তু মেয়ে আসামী একটিও ছিল না। ফলে 'Male cell' টি ভর্তিই থাকত কিন্তু 'Female cell' অর্থাৎ মেয়েদের হাজতটি একেবারে খালি পড়ে ছিল। আমি Moses সাহেবকে বলি যে এ মামলার মালগুলি রোজ আনা এবং দিনের শেষে কোর্ট থেকে ফেরৎ নিয়ে যাওয়া অত্যন্ত বেশী কষ্টকর—এবং প্রায় অসম্ভব। মাল আনতেও অন্ততঃ দুখানা Lorry লাগে। একে প্রত্যহ জেলের কালো গাড়ী আসে, তার উপর দুখানা Lorry ঢোকানর আর জায়গা থাকে না। আর মালগুলো রোজ রোজ রাস্তায় নামিয়ে কোর্টের ভিতরে আনাও সম্ভবপর নয়। সব থেকে ভাল হয় যদি Female cell-টা খুলে মালগুলো তার মধ্যে ভরে রাখা হয়। তাতে যতদিন না মামলা শেষ হয় ততদিন মালগুলোও বেশ নিরাপদে থাকে, অনেক পরিশ্রম ও অর্থ-ব্যয় বাঁচে এবং কারুরই কোন অসুবিধা হয় না। Moses সাহেব তাঁর Superintendent এর সঙ্গে পরামর্শ করে বললেন—হ্যাঁ, এটা খুবই যুক্তি সঙ্গত কথা। আপনারা কাল সকালে এই মর্মে জজ সাহেবের অনুমতি চেয়ে নেবেন ; বাকী বন্দোবস্ত আমি করে দেব।

পরের দিন সকালে আমি Panckridge সাহেবকে এই মামলার মালগুলি রোজ আনা-নেওয়ার অসুবিধের কথা জানিয়ে মালগুলি আদালতে রাখার অনুমতির জন্যে দরখাস্ত করতে বলি। কথা বলতে বলতেই জজ সাহেব এসে পড়লেন, Moses সাহেবের সঙ্গে যে এ বিষয়ে আমার

কথাবার্তা হয়েছে একথাটা Panckridge সাহেবকে জানাবার সুযোগ আর আমার হল না। জজ সাহেব বসামাত্রই Panckridge সাহেব উঠে তাঁর দরখাস্তের মর্ম জানিয়ে বললেন যে মালগুলি রোজ নিয়ে যাওয়া আসা অসম্ভব, অতএব আদালতেই কোথাও মালগুলো রাখার বন্দোবস্ত করা হোক। কৌঁসুলী সাহেবের কথা শেষ হওয়ার সংগে সংগেই Moses সাহেব উঠে আমার সংগে যে রকম পরামর্শ হয়েছিল সেই অনুসারে জজ সাহেবকে বুঝিয়ে বললেন যে 'Female Cell' এ মাল রাখার বন্দোবস্ত করা যেতে পারে। কিন্তু ইতিমধ্যে Moses সাহেবকে উঠে জজ সাহেবের সংগে কথা বলতে দেখেই Panckridge সাহেবের পিত্তি জ্বলে উঠল। তিনি ধরে নিলেন যে Moses নিশ্চয়ই বাগড়া দিচ্ছে। তিনি খুব রেগেমেগে বলে উঠলেন,—Oh, that fellow Moses! Always obstructive! এদিকে Moses সাহেবের সংগে জজ সাহেবের পরামর্শ প্রায় ৩।৪ মিনিট লেগে গেল, শেষে জজ সাহেব যখন কতকটা চেঁচিয়ে Panckridge সাহেবকে বললেন—Yes, you mean that the female cell may be used for this purpose—তখন আমার কৌঁসুলী সাহেবের এত ধৈর্য ছিল না যে তিনি জজ সাহেবের সমস্ত কথাগুলির তাৎপর্য হৃদয়ংগম করেন। তিনি বেশ রাগতভাবেই বলে ফেললেন,—I don't know, My Lord, how the sex of the cell may affect the merits of my application. আদালতশুদ্ধ সকলেই হেসে উঠল—Panckridge সাহেব ত চটেই লাল। আধা-খ্যাঁচড়া ভাবে 'Female cell' কথাটা মাত্র তাঁর কানে গিয়েছিল তাতেই তাঁর রাগ, তার উপর এই হাসি! এমন কি জজ সাহেবও হাসি চাপতে পারেন নি—তিনি ব্যাপারটা কতকটা আন্দাজ করে মোলায়েম ভাবেই বললেন-No, Mr. Standing Counsel, I am trying to accomodate you। তখন Panckridge সাহেব আশ্বস্ত হলেন, এবং সেই অনুসারে পুরান্ লোহালক্কড়গুলি 'Female Cell'-এতেই রাখা হল।

এই বিচারে হরিরাম, রমণ প্রভৃতি সব আসামীরই জেল হয়েছিল।

তারপর অনেকদিন পর্যন্ত আমরা এই 'Sex of the cell' কথাটা আলোচনা করেছি এবং হাসি ও আনন্দের খোরাক পেয়েছি।

*

এবার বলছি ভিন্নরকম একদল খেলোয়াড়ের কথা। এ খেলাও Insurance কোম্পানি নিয়ে হয়েছিল। এবারে কিন্তু আসামী প্রভৃতির নাম ধাম সবই ছদ্মনামে ঢাকা রইল; ঐটুকুই মেকি, বাকী সবই আসল—এমন কি হাকিম, জজ কৌঁসুলী প্রভৃতির নাম।

এবারকার খেলোয়াড়দের পাণ্ডা ছিলেন কলকাতার কাছাকাছি বড় সহর সীতারামপুরের একজন যাকে বলে—'মান্যিমান লোক'—তাই। নাম হেমন্ত চক্রবর্তী। সহরটি গঙ্গার ধারে। হেমন্তবাবু সীতারামপুরের জমিদার, ডাক্তার এবং অনেক বছর ধরে ওখানকার মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস্-চেয়ারম্যান। তাঁর সেখানে অগাধ প্রতিপত্তি। নিজের একখানা বড় ডিস্পেন্সারী ত আছেই, তাছাড়া আরও কয়েকটা ছোট ডিস্পেন্সারীর সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট এবং সেখানকার ডাক্তাররা তাঁর তাঁবে। এ হেন হেমন্তবাবু কিঞ্চিৎ বাড়তি আয়ের লোভে মেঘের আড়ালে নিজেকে ঢেকে কিছুদিন কাজ কারবার চালালেন, করেও ছিলেন বেশ কিছু—কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইন্দ্রজিতের মতই তাঁরও পতন হল।

নর্থ ব্রিটিশ লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানীতে কলকাতার ৩-এ, সেন লেন-এর শ্যামাচরণ সেনের নামে একখানা ৫০০০৲ টাকার জীবন বীমার পলিসি হল। প্রিমিয়ামের বন্দোবস্ত ছিল যে বছরে দুবার প্রিমিয়াম দেওয়া হবে। Proposal accepted হওয়ার আগেই প্রথম প্রিমিয়াম জমা দেওয়া হয়ে গেল। দ্বিতীয় প্রিমিয়াম দেবার সময় হবার আগেই শ্যামাচরণের বিধবা পত্নী হিসেবে ৩-এ, সেন লেন থেকে কলাবতী দেবী দরখাস্ত করলেন ইন্সিওরেন্স কোম্পানীতে এই বলে যে, তাঁর স্বামী শ্যামাচরণ সেন নিউমোনিয়া রোগে মারা গেছেন, claim papers যেন তাঁর কাছে পাঠান হয়। কোম্পানী থেকে সব রকমের claim papers এল, এবং সীতারামপুরের Honorary Magistrate-এর কাছে সই হয়ে আবার কোম্পানীতে দাখিল করা হল। ইন্সিওরেন্স কোম্পানী "A/C Payee" মার্কা চেক কলাবতী দেবীর নামে দিয়ে এই Policy-র দাবীর টাকা মিটিয়ে দিল। কোন এক Non-Scheduled Bank-এ কলাবতীর নামে এই সময় ৩০০৲ নগদ জমা দিয়ে একটি account খোলা হল, এবং সেই account এ ঐ 'A/C Payee' cheque-টি জমা দিয়ে ভাঙ্গান হল।

এই চেক জমা দেবার পরের দিনই আবার Sun Life of Canada

ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীতে ৩-এ, সেন লেন থেকে আবার শ্যামাচরণ সেনের নামে আর একখানি ৫০০০৲ হাজার টাকার জীবন বীমার Proposal দেওয়া হল। এবারেও প্রায় সংগে সংগে প্রথম ষান্মাসিক প্রিমিয়াম দেওয়া হয়ে গেল। এবারেও দ্বিতীয় প্রিমিয়াম দেবার সময় হবার আগেই শ্যামাচরণ বেচারা আবার নিউমোনিয়া রোগে মারা গেল। সংগে সংগে কলাবতী দেবীর বদলে এবার দুর্গারাণী দেবী শ্যামাচরণের বিধবা পত্নী হিসেবে Sun Life-এ মৃত্যু সংবাদ পাঠিযে claim form চাইল। এবারেও সীতারামপুরের আর একজন Honorary Magistrate-এর কাছ থেকে সব কাগজপত্র তৈরী হযে কোম্পানীতে দাখিল হল এবং দুর্গারাণীর নামে 'A/C Payee' চেক্ বের হল।

এবারেও আর একটি Non-Scheduled Bank-এ দুর্গারাণী দেবীর নতুন account খুলে তাতে এইবারের চেকটি জমা দিযে সেটিও ভাঙ্গান হল।

এই রকম আরও দু তিনটে কোম্পানী থেকে শ্যামাচরণ সেনের নামে জীবন বীমার policy বের হওযায সে বেচারাকে প্রতিবারই ৩।৪ মাসের মাথায় মারা যেতে হল! কলকাতার ৩-এ, সেন লেন বাড়ীটা প্রায় ভূতের বাড়ীই হযে পড়ল।

তারপর এই দলের লক্ষ্য হল National Insurance Company. ৩-এ, সেন লেন নিবাসী দালাল প্রাণধন প্রথমে শ্যামাচরণ সেনের নামে এক জীবন বীমার প্রস্তাব দিল। তার পরে বিভিন্ন নামে পর পর আরও কয়েকটি জীবন বীমার প্রস্তাব পাঠাল। পরে কোম্পানীতে বীমাকারীদের মৃত্যুর সংবাদ দিয়ে বিভিন্ন নামে মৃতের বিধবা পত্নীরা সীতারামপুরের Honorary Magistrate-এর কাছে কাগজপত্র complete করিয়ে সে সব কোম্পানীতে দাখিল করে চেক বার করে নিতে লাগল। প্রত্যেকবারই ভিন্ন ভিন্ন Non-Scheduled Bank-এ এক একটি ছোট account খুলে ঐ চেকগুলি ভাঙ্গান হতে লাগল। বীমাকারীর সংগে কি সূত্রে আলাপ এবং কতদিনের জানাশোনা এই প্রশ্নের উত্তরে দেখা গেল যে প্রাণধন দালাল সমানে লিখে গেছে "Met in the course of canvassing."

কোম্পানী থেকে এক বছরের মধ্যে এই রকম ৫।৬ খান চেক বের হয়ে যাওয়াতে কোম্পানী গোপনে Insurance Organiser-কে সন্ধান নিতে

বললেন। এই Organiser ছিলেন একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সান্যাল মশাই—হেমন্তবাবুরই একজন প্রতিবেশী। সান্যাল মশাই প্রথমেই শ্যামাচরণ সেনের খোঁজ করতে ৩-এ, সেন লেনে গেলেন। সেখানে গিয়ে খবর পেলেন যে ঐ বাড়ীতে শ্যামাচরণ সেন বলে কেউ কোন দিন ছিল না বা তার বিধবা পত্নী পরিচয়ে যে National Insurance Company থেকে প্রথম পলিসির টাকা তুলে নিয়েছে সে রকম কেউই ও বাড়ীতে থাকেনি বা নেই। আসলে এ বাড়ীতে থাকেন দালাল প্রাণধন রায়। সান্যাল মশাই গোপনে এই খবরটি National Insurance Company-কে জানালেন।

সীতারামপুর থেকে সান্যাল মশাই আর একটি দামী খবর জোগাড় করলেন। শেষবারে কোম্পানীতে যে claim form দেওয়া হয়েছিল তার সঙ্গে মৃতদেহ সীতারামপুরের শ্মশানে দাহ করা হয়েছে বলে এক certificate দেওয়া ছিল। সান্যাল মশাইকে তাঁর একজন অনুগত লোক খবর দিল যে যেদিন রাত্রে ঐ মৃতকে দাহ করা হয়েছে বলে শ্মশানের খাতায় দেখান আছে সে রাত্রে হেমন্তবাবুর কয়েকজন লোক শ্মশানঘাটের রেজিষ্ট্রারকে খুব মদ খাওয়ায়। তার কিছুক্ষণ বাদে আর একটি লোককে মদ খাইয়ে অজ্ঞান করে খাটিয়ায় চাপিয়ে হরিধ্বনি দিয়ে শ্মশানে নিয়ে আসে। সে মাতালটির নাম রাখাল। হরিধ্বনি করতে করতে খাটিয়া সমেত রাখালকে সামনে এনে যখন নামায় তখন খুব ঝড় বৃষ্টি হচ্ছিল। শ্মশানের রেজিষ্ট্রার মশাই-এর মৌতাত তখন বেশ জমে উঠেছে। পাছে বৃষ্টিতে বেরিয়ে লাশ দেখলে মৌতাত নষ্ট হয়ে যায়, সেই ভয়ে তিনি বাইরে না বেরিয়েই বলে উঠলেন,—"শালা এই বিষ্টিতে জ্বালাতে এসেছে। দে শালাকে কেরাসিন তেল ঢেলে আগুন দিয়ে।" সেই অবস্থায় যারা রেজিষ্ট্রার সাহেবের মৌতাতের আয়োজন করেছিল, তারা তাদের প্রয়োজনমত শ্মশান ঘাটের Death Register-এর column-গুলি ভর্তি করে নিয়েছিল। রাখালকে খাট থেকে নামিয়ে শ্মশানের বাঁধান ঘাটের ধাপে শুইয়ে রেখে যে খাটে করে তাকে আনা হয়েছিল সেই খাট কতকগুলি ছেঁড়া বালিশ কাঁথা ও খড় সমেত কেরোসিন তেলই ঢেলে বিকট শব্দে হরিধ্বনি করতে করতে পোড়ান হয়েছিল। হেমন্তবাবুর নিজের গাড়ীটি শ্মশানের একটু দূরেই দাঁড়িয়েছিল এবং খড় আর কেরোসিন সেই গাড়ীরই মাথায় চাপিয়ে ত্রিপল ঢাকা দিয়ে আনা হয়েছিল।

এই খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশে খবর দেওয়া হল। পুলিশ প্রথমেই প্রাণধনকে গ্রেপ্তার করে ও ৩-এ, সেন লেন খানাতল্লাসী করে। সেখানে **North British, Sun Life** প্রভৃতি সব বীমা কোম্পানীরই শ্যামাচরণ সেন সম্পর্কিত সব কাগজ-পত্রই পাওয়া যায়। তখন প্রাণধনের কথা অনুসারে কলাবতী ও দুর্গারাণী দুজনকেই গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের দুজনের সই নিয়ে মিলিয়ে দেখা গেল যে আট দশটি **policy**-তে বিভিন্ন নামে মৃতের বিধবা পত্নী বলে যত কাগজপত্র বীমা কোম্পানীগুলিতে দাখিল করা হয়েছিল সব গুলিতেই তাদেরই দুজনের মধ্যে একজন না একজনেব সই ছিল। এই সব সই-ই **Honorary Magistrate**-এর সামনে দেওয়া হয়েছিল। **Honorary Magistrate**-রা ভিন্ন ভিন্ন লোক ছিলেন এবং তাঁরা সকলেই প্রতিবারের বিষয়ে এই ভাবে এজাহার দিয়েছিলেন: "হেমন্তবাবু নিজে গাড়ী করে এই গরীব বিধবাটিকে আমার বাড়ীতে নিয়ে এসেছিলেন এবং হেমন্তবাবুর কথাতেই আমি ঐ বিধবাটির সই **attest** করে দিয়েছিলাম। হেমন্তবাবু অত্যন্ত দয়ালু ব্যক্তি এবং গরীবের তিনি 'মা-বাপ'। অতএব তিনি যখন নিজে সঙ্গে করে এনেছিলেন, তখন আর সন্দেহ কববার কোন কাবণই ছিল না।" তখন হেমন্তবাবুকে গ্রেপ্তার করা হল। এবং তাঁর ডিস্পেন্সাবী ও বাডী তল্লাসী কবে এ ব্যাপারে তাঁর সংশ্লিষ্টতা প্রমাণ করার মতন অনেক কাগজপত্র পাওয়া গেল; আরও দেখা গেল যে কলাবতী ও দুর্গারাণীর ঐ সব **Bank Account** থেকে মোটা টাকা হেমন্তবাবুর হাতে এসেছে।

যে সব ডাক্তার **Death Certificate**-গুলি দিয়েছিলেন, তাঁদেরও গ্রেপ্তার করা হল। পুলিশ অনুসন্ধান করে দেখতে পেল যে ঐ সব ডাক্তাররাই হেমন্তবাবুর অনুগত লোক এবং যে কয়টি ছোট ছোট ডাক্তারখানার সঙ্গে হেমন্তবাবু সংশ্লিষ্ট ছিলেন এঁরা তার কোন না কোন একটিতে বসতেন।

পুলিশ তদন্তে আরও জানা গেল যে যখন কোন একটি **policy**-র দরুণ বীমাকারীর মৃত্যু-সংবাদ দেওয়া প্রয়োজন হত, তখন হেমন্তবাবুর লোকজন পাশাপাশি কোন গ্রামের কে মারা গেল এই সন্ধান নিয়ে চৌকীদারকে দিয়ে তাদের খাতায় ঐ বীমাকারীর নাম, ধাম, বয়স প্রভৃতি লিখিয়ে দিত। এবং সেই লাশ সীতারামপুরের শ্মশানে এনে দাহ করা হত। দু-এক পাত্র

দেশী মদ খাইয়ে হেমন্তবাবুর লোকজন সীতারামপুরের শ্মশান ঘাটের রেজিষ্ট্রারকে দিয়ে সত্তর বছর বয়সে আমাশা রোগে মৃত লাশকে পাঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে নিউমোনিয়া রোগে মৃত লোকের লাশ বলে লিখিয়ে দিতে কোন অসুবিধাই বোধ করে নি। তার প্রধান কারণ ছিল ঐ রেজিষ্ট্রারের অগাধ কুঁড়েমি ও সুরা-প্রিয়তা—সামনের মদের বোতল ফেলে সে ঘর থেকে কখনও বেরুত না; অপর কারণ ছিল এই যে ঐ রকম লাশের সঙ্গে ঐ কজন ডাক্তারের মধ্যে একজন না একজনের **Death Certificate** থাকত।

কলকাতার **Chief Presidency Magistrate**-এর এজলাসে হেমন্তবাবু প্রাণধন ও আরও দশজনের বিরুদ্ধে মামলা চালান দেওয়া হয়েছিল। তখন **Hon'ble S. K. Sinha** ছুটি নিয়ে ইউরোপ ভ্রমণে বেরিয়েছেন—তাঁর জায়গায় যিনি বর্তমানে দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনার অধ্যক্ষ (**Chairman, D. D. A**) সেই শ্রীসুকুমার সেন **I. C. S.** কাজ করছিলেন। ঐ বার জন আসামীর মধ্যে ৩ জন ডাক্তার এবং দুর্গারাণী ও কলাবতীও ছিল। সরকার পক্ষের সাক্ষী আরম্ভ হওয়ার পরে কলাবতী এক লম্বা বিবৃতি দিয়ে কবে কি কাগজে তাকে দিয়ে সই করান হয়েছে সব বিষয়ে এক স্বীকারোক্তি করে হাকিমের কাছে এক দরখাস্ত করে বললে যে হেমন্তবাবুর কথাতেই সে ঐ সব কাগজে সই করে দিয়েছে; সেও জাতিতে ব্রাহ্মণ এবং হেমন্তবাবুরই দূর আত্মীয়া; সে সীতারামপুর ছেড়ে কোনদিন যায় নি, ৩-এ সেন লেন-এর বাড়ীতে কোন দিন থাকে নি ইত্যাদি ইত্যাদি। সে আরও বললে যে **Bank**-এ যখন তার নামে **account** খোলা হয়েছিল তখন সে নিজে কোন টাকাই দেয় নি—হেমন্তবাবুর কথাতেই কাগজ-পত্র সব সই করে দিয়েছিল। হেমন্তবাবুরই কথামত কয়েকবার চেক সই করে হেমন্তবাবুর হাতে দিয়েছে—হেমন্তবাবু সে টাকা পেয়ে কি করেছেন সে জানে না—এবং প্রত্যেক **Policy**-র **claim** বাবদ হেমন্তবাবুর কাছ থেকে সে ২০০৲ কি ৩০০৲ করে টাকা পেয়েছে মাত্র। তার স্বামী অনেকদিন আগেই মারা গেছেন। হেমন্তবাবুর কথাতেই সে **Honorary Magistrate**-দের সামনে গিয়ে ভিন্ন ভিন্ন লোকের বিধবা পত্নী বলে নিজের পরিচয় দিয়েছে কারণ সে বহুদিন যাবৎ হেমন্তবাবুর আশ্রিতা, এবং হেমন্তবাবুর কথার অন্যথা করবার মত সামর্থ্য তার ছিল না। সব শেষে তার দরখাস্তে লেখা ছিল যে তার অপরাধ মাফ করে তাকে রাজ-সাক্ষী করে নেওয়া হোক। বলা বাহুল্য

যে এরপর কলাবতীকে রাজ সাক্ষী করে নেওয়া হয়েছিল—এবং তারপর মামলাটি বিচারের জন্যে হাইকোর্ট দায়রায় পাঠান হয়েছিল।

আগে রাখাল বলে যে মাতালটির কথা বলেছি তাকেও সাক্ষী ডাকা হয়েছিল। তার যখন জবানবন্দী হয় তখন জুরীমহলে বেশ একটু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল। ঐ বার জন আসামীর মধ্যে দুর্জয় ও মহাদেব নামে হেমন্তবাবুর দুজন অনুগত লোক ছিল। রাখাল তার সাক্ষীর জবানবন্দীতে বললে,—দুর্জয় আমার পরিচিত লোক। একদিন বিকেলবেলায় সে আমাকে বাড়ী থেকে ডেকে আড্ডায় নিয়ে যায়। সেখানে সে আমাকে ইচ্ছে মত মদ খেতে দেয়। মদ খেতে খেতে আমি আড্ডাতেই শুয়ে পড়ি। তখনও দুর্জয় আমার মুখে আরও মদ ঢেলে দিতে থাকে। তারপরে আমি একেবারে বেহুঁস হয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। হুঁস হতে দেখি যে আমি শ্মশান ঘাটের বাঁধান সিঁড়িতে শুয়ে আছি—আমার মাথাটা উঁচু দিকে, পা দুটো জলের দিকে। খুব ঝড় বৃষ্টি হযে গেছে এবং আমার পরণের জামা-কাপড়, গা-মাথা সব ভিজে সপ্ সপ্ করছে। ওদিকে জোয়ার এসে আমার হাঁটুর ওপর পর্যন্ত ডুবিয়ে দিয়েছে। আমি কোন রকমে জল থেকে উঠে ওপরে আসি। এসে দেখি দুর্জয়, মহাদেব ও আরও কজনে মিলে কতকগুলো কাঁথা, বালিশ, খড় এই সব পোড়াচ্ছে, আর 'হরিবোল' দিচ্ছে। আমাকে দেখে ওরা বলে উঠল,—শীগ্‌গির পালিয়ে যা শালা, নইলে তোকে শুদ্ধু এর মধ্যে পুরে পুড়িয়ে দেব।' তারপর আমি বাড়ী ফিরে এসে ৩।৪ দিন জ্বরে শয্যাগত ছিলাম।

এই সাক্ষীর জবানবন্দী যখন হচ্ছিল তখন জুরীগণ বড় আমোদ অনুভব করছিলেন। এই মামলার বিচারে জজ ছিলেন Mr. Justice Panckridge—যিনি Triton Insurance কোম্পানীর Case-এর সময় Standing Counsel ছিলেন। সরকারের তরফে মামলা চালিয়েছিলেন তখনকার Standing Counsel—যিনি এখন Advocate General—Sir S. M. Bose; আমি Public Prosecutor হিসেবে তাঁর সহায়তা করেছিলাম। হাইকোর্টে কথাবার্তা, সাক্ষীর জবানবন্দী ইত্যাদি সব কিছুই ইংরেজীতে হয়। যে সব সাক্ষী ইংরেজী জানে না তাদের জবানবন্দী তর্জমা করে দেবার জন্যে হাইকোর্টে কয়েকজন Interpreter বা দো-ভাষী আছেন। তাঁরা প্রশ্ন শুনে সাক্ষীর নিজের ভাষায় সেগুলিকে অনুবাদ করে বলেন এবং সাক্ষীর

জবাবগুলিও ইংরেজীতে তর্জমা করে আদালতকে জানান। অরবিন্দবাবু বলে হাইকোর্টে একজন বিচক্ষণ Interpreter ছিলেন। ইংরেজী, বাংলা, হিন্দী তিনি অনায়াসে এমনভাবে বলে যেতেন যে এই তিনটির কোনটি যে তাঁর মাতৃভাষা সেটা সব সময় বোঝা যেত না। আজ আর তিনি বেঁচে নেই। অনেক সময় দেখা যায় যে literal translation অর্থাৎ শব্দানুযায়ী তর্জমা করতে গেলে আসল অর্থটা ঢাকা পড়ে যায়; কিন্তু অরবিন্দবাবুর বিশেষত্ব ছিল যে তাঁর তর্জমা literal হত, কিন্তু তাতে মূলের আসল অর্থটি তিনি বেশ ভালভাবেই প্রকাশ করতে পারতেন। তারই একটি উদাহরণ দিচ্ছি। এই মামলায় আসামী-পক্ষে অনেক বড় বড় কৌঁসুলী ছিলেন—তার মধ্যে আমি কেবলমাত্র নিশীথ সেন মশাই-এর নামই করব। তিনি আইন-ব্যবসা ও রাজনীতি-ক্ষেত্র—দুজায়গাতেই স্বর্গীয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মশাই-এর সহকারী ছিলেন। তিনি এক সময়ে কলকাতা সহরের মেয়রও ছিলেন।

তাঁর বক্তৃতা ও জেরার প্রণালী দুইই অপূর্ব ছিল। তিনি এই মামলায় যখন রাখালকে জেরা করতে উঠলেন, আদালতের মধ্যে এমন এক পরিবেশের সৃষ্টি হল যে মনে হল সেটা যেন আদালতই নয়, কোন হাসি তামাসার আড্ডা। তিনি রাখালকে প্রশ্ন করলেন,—How many pegs can you stand? রাখাল ত ইংরেজী জানে না, সে জন্যে Interpreter অরবিন্দ বাবু সঙ্গে সঙ্গে ঘাড়টি বেঁকিয়ে বেশ টেনে টেনে এবং একটু সুর করে রাখালের দিকে তাকিয়ে তর্জমা করলেন—বলি, ক'পাত্তর টানতে পার? আদালত শুদ্ধ সকলে হেসেই অস্থির। জজ সাহেব অবিশ্যি হাসির কারণটা বুঝতে পারেন নি—তাই জিজ্ঞাসা করলেন,—What is the amusement about? নিশীথ সেন মশাই জবাব দিলেন,—The most literal but effective translation.

বিচারে ২।৩ জন বাদে সকলকেই দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। যতদূর মনে পড়ে, হেমন্তবাবুর পাঁচ বছর জেল হয়েছিল।

এবার আমাদের সান্যাল মশাই সম্বন্ধে দুএকটি কথা না বললে এ কাহিনী অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, ইংরেজী বিশেষ জানতেন না—কিন্তু প্রতি কথায় ইংরেজী শব্দ ব্যবহার না করেও থাকতে পারতেন না। তিনি তাঁর নিজের কাজ খুব ভাল বুঝতেন, কিন্তু তাঁর সময়ের জ্ঞান

একেবারেই ছিল না। একদিন সকাল ৭টায় আমার বাড়ীতে তাঁর আসবার কথা ছিল। বেলা ১০॥০ টার সময় হাঁপাতে হাঁপাতে আমার আফিসে এসে উপস্থিত হলেন। অপরাধের মধ্যে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম,—এত দেরী? তিনি খুবই রেগে ছিলেন; জবাব দিলেন,—যাঁরা গাড়ী চড়েন, তাঁরা কেউ যেন দয়া করে **Mechanics Driver** না রাখেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, —**Mechanics driver**-এর অপরাধ? তিনি ঠাণ্ডা না হয়েই বললেন,—আরে মশাই, **Mechanics** ব্যাটাদের চেয়ে সাধারণ **driver** অনেক ভাল। তারা কথা শোনে, কাজকর্ম করে। আর এ ব্যাটারা সব একটা নবাব; তাদের কিছু বলবার জো নেই। খালি নিজেদের **impotency** দেখাতেই ব্যস্ত! বুঝলাম **importance** কথাটা তাঁর পাল্লায় পড়ে অতটা বিকৃত হয়ে গেছে। তাঁকে সে কথা না বলে, অন্য কথাবার্তা বলে সেদিন বৃদ্ধকে ঠাণ্ডা করি। দেখেছি, তাঁর ইংরেজী কথার একটা সম্পূর্ণ নিজস্ব অলিখিত অভিধান ছিল। তাঁর সে অভিধানের সংগে আমার পরিচয় না থাকায় অনেক সময় তাঁর কথা বোঝা আমার পক্ষে কষ্টকর হত। তিনি প্রায়ই বলতেন,—এ **case**-এর গোড়ায় আদত **investment** আমিই করেছি। আমার **investment** না হলে পুলিশ বাকী **investment**-টুকু করতে পারত না। প্রথম দিন আমি ঐ **investment** কথার মানে বুঝতে গিয়ে ধাঁধায় পড়েছিলাম। কারণ **Insurance Company**-র **case**, তিনি কোথায় কি **investment** করলেন ঠিক বুঝতে না পেরে তাঁকে দু'একটি প্রশ্ন করে বসেছিলাম সেই মর্মে। কিন্তু সোজা রাস্তায় চলতে গিয়ে তাঁর ইংরেজীর বস্তায় ধাক্কা খেয়ে আমার প্রাণ অস্থির হয়ে উঠেছিল। তারপর অনেক কসরতের পর বোধগম্য হল যে তিনি বলতে চাইছিলেন **investigation**—**investment**-টা সান্যাল মশাই-এর নিজস্ব বিকৃতি!

Anglo-Indian Nurse-টির কাহিনী বলবার সময় আমি আগেই আমার আফিসের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছি। এক কথায় বলতে গেলে, আফিসটিতে একটি বড় হল, তিন-চারটি কামরা, অনেকগুলি চেয়ার টেবিল, কয়েকটি **Type-writer**, ৭।৮ জন কেরাণী, এবং ৬।৭ জন চাপরাসী ছিল। তা ছাড়া **brief** ও কাগজ-পত্রের র‍্যাক এবং অনেকগুলি বই-ভর্তি আলমারীও ছিল। **Public Prosecutor** পুরো কথাটা কিম্বা তার মানে বোধহয় তিনি জানতেন না, কিম্বা হয়ত কোথাও জায়গার অভাবে ছোট করে কথাটা

লেখা আছে দেখেছিলেন। তিনি আমার আফিসের ঘরে ঢুকে চার দিকে প্রশংসার সংগে নজর বুলিয়ে বলেছিলেন,—বাঃ, এইটি বুঝি এখানকার Public Pros-এর ঘর? চমৎকার ত! আমাদের দেশে Public pros-এর ঘর দেখেছি,—সেটা এ রকম নয়। আমি অবশ্য অত্যন্ত বিনয় সহকারে নিবেদন করেছিলাম,—আপনাদের মত মহৎ লোকের কৃপা থাকলে আরও কত বড় হবে, তা কি বলা যায়? আমার কথা শুনে বৃদ্ধ খুসী হয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন এই বলে,—তা বই কি, তা বই কি, নিশ্চয়ই অনেক বড হবে।

সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে আর এক শ্রেণীর খেলোয়াড় দেখতে পাওয়া যায়। তারা যাকে বলে Public servant তাই—অর্থাৎ জনসাধারণের সেবাই তাদের কাজ; জনসাধারণের সেবার জন্যেই সরকার তাদের নিযুক্ত করেছেন। অতএব জনসাধারণের সুবিধা করে দেওয়া কিংবা তাদের অসুবিধার সৃষ্টি করা—দুটোই তাদের আয়ত্তের মধ্যে। লোকে সাধারণত চায় যে তাদের সুবিধা হোক বা অসুবিধা দূর হোক, এবং দরকার হলে তার জন্যে গোপনে কিছু বাড়তি পয়সা খরচ করতেও তারা পিছপাও হয় না। খেলোয়াড Public servant-রা সেটি বেশ ভাল রকম জানে এবং সুযোগ বুঝে দাঁও মারবার চেষ্টা করে থাকে। এই দাঁও মারাটাকে চলতি ভাষায় ঘুস খাওয়া বলে। এই রকম ঘুষ খাওয়ার মামলা অনেক আমার হাতে এসেছে। এইবার তারই একটি মামলার কথা বলছি।

শোনা যায় যে একটি ভারতীয় মেধাবী ছাত্র যখন উচ্চশিক্ষার জন্যে বিলেত যান, তখন নাকি তিনি Civil Service পরীক্ষা দেবার জন্যে যান নি। এও শোনা গেছে যে ভদ্রলোক নাকি F. R. C. S. পাশ করে Surgeon হয়েছিলেন বা হবার চেষ্টা করছিলেন। তিনি নাকি একদিন বন্ধুবান্ধবদের সংগে বসে জোরের সংগে বলেছিলেন যে দুনিয়ায় এমন কোন পরীক্ষাই নাই যেটা তিনি পাশ করতে পারেন না। তখন তাঁর

বন্ধুবান্ধবরা তাঁকে বললেন,—তুমি তা হলে বলতে চাও যে তুমি ইচ্ছে করলে এবারের I. C. S. পরীক্ষা দিয়ে পাশ করতে পার! তার জবাবে তিনি নাকি বলেছিলেন,—I. C. S. পরীক্ষার মতন সহজ পরীক্ষা খুব কমই আছে। তখনই হিসেব করে দেখা গেল যে তার পরের ছমাসের মধ্যে যে I. C. S. পরীক্ষাটা হবে সে পরীক্ষায় হাজির হতে না পারলে তাঁর ঐ পরীক্ষা দেওয়ার বয়স উত্তীর্ণ হয়ে যাবে এবং তিনি আর জীবনে I. C. S. পরীক্ষা দেবার সুযোগ পাবেন না। নিজের ক্ষমতার ওপর তাঁর এত অগাধ বিশ্বাস ছিল যে তিনি সেইখানে বসেই বাজি রাখলেন এবং ছমাসের মাথায় I. C. S. পরীক্ষা পাশ করলেন। তারপর এক বছরের শিক্ষানবিশী করে ১৯৩৪ সালে ভারতে ফিরে আসেন। এই অসাধারণ মেধাবী যুবকের নাম—T. A. Menon.

১৯৩৪ সালে Indian Civil Service-এ ভর্তি হয়ে Mr. Menon বাংলা দেশে আসেন। ১৯৪৩ সালে তিনি মেদিনীপুরের Additional District Magistrate ছিলেন। সে সময় তাঁর এলাকাধীন খড়গপুরের Bengal Nagpur Railway Hospital-এর Sub-Assistant Surgeon Dr. Panda-র বিরুদ্ধে এক ঘুষ নেওয়ার মামলা রুজু হয়। এই মামলার তদন্তের ভার পড়ে Mr. Menon-এর উপর। এই সূত্রে তাঁকে একাধিকবার খড়গপুরে যেতে হয়। কিন্তু এ মামলার কাজ শেষ হবার আগেই তাঁকে কলকাতায় বদলি করা হয়। মামলার বিবরণে প্রকাশ যে তিনি তাঁর এক নিকট-আত্মীয় N. C. Menon-কে তাঁর অধীনে কেরাণী নিযুক্ত করেছিলেন। Mr. Menon কলকাতায় এসে ঝাউতলা রোডে তাঁর এক বন্ধুর বাড়ীতে উঠেছিলেন। আরও প্রকাশ যে তাঁর আত্মীয় ও কেরাণী N. C. Menon-কে খড়গপুরে পাঠিয়ে Mr. Panda-র কাছে প্রস্তাব করেছিলেন যে Dr. Panda যদি Mr. Menon-কে ৫০০৲ দিতে পারেন তবে তিনি Dr. Panda-র বিরুদ্ধে মামলাটি ফাঁসিয়ে দেওয়ার বন্দোবস্ত করবেন। Dr. Panda কিন্তু এই প্রস্তাবটি শুনে গোপনে সে খবর কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছে দিলেন।

ঘুষ দেওয়া ও ঘুষ নেওয়ার কাহিনী আবহমান কাল থেকেই চলে আসছে। কিন্তু সে সব কাহিনীর কতটা সত্যি কতটা মিথ্যে তা বিচার করা অনেক সময়ই শক্ত হয়ে পড়ে—বিশেষ করে যিনি ঘুষ চান বা নেন

তিনি যদি উচ্চ-পদস্থ সরকারী কর্মচারী হন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই রকম ঘুষ নেওয়ার গল্প এত বেশী ছড়িয়ে পড়ল যে ঘুষের তদন্তকারী সরকারী কর্মচারীরা Trap-করা অর্থাৎ ফাঁদ-পাতা প্রণালী অবলম্বন করলেন। এই প্রণালীতে যে ঘুষ নিতে চাইত তাকে হাতে-নাতে ধরা খুব সহজ হয়ে পড়ল। যার কাছে ঘুষ চাওয়া হত, সে কর্তৃপক্ষকে খবর দিলে তাকে শিখিয়ে দেওয়া হত যে সে যেন ঘুষ দিতে রাজী হয়, তারপর টাকার অংক ও টাকা দেওয়ার সময় ও স্থান ঠিক করে। তারপর পুলিশ থেকে ঘুষ চাওয়া টাকার অংক অনুযায়ী Currency Note স্থানীয় Magistrate-এর কাছে নিয়ে গিয়ে ঐ নোট-এর নম্বরগুলি একটি কাগজে লিখে সেটি সেই Magistrate-কে দিয়ে সই করিয়ে নেওয়া হত এবং নোটগুলিতেও Magistrate কোন চিহ্ন দিয়ে রাখতেন। তারপর নির্ধারিত দিনে পুলিশ, একজন Magistrate এবং দুজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে, যার কাছে ঘুষ চাওয়া হয়েছে সেই লোকটিকে নির্দিষ্ট জায়গায় নিয়ে যেত। সেই লোকটিকে এমন একটি সংকেত করতে শিখিয়ে দেওয়া হত যা দেখলে দূর থেকেই বোঝা যাবে যে ঘুষের টাকা আসল লোকই নিয়েছে। এই সংকেত ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন রকমের হত। যেমন, এক ক্ষেত্রে হয়েছিল—ডান হাত দিয়ে মাথা চুলকান; অন্য জায়গায় হয়েছিল—বাঁ হাত দিয়ে মাথা চুলকান; একবার হয়েছিল—রুমাল বার করে তা দিয়ে নাক মোছা; অপর একবার ছিল—চোখের চশমা খুলে আবার পরা। এই সংকেতগুলিই অধিকাংশ সময় ব্যবহার হত যখন ঘরের ভিতর ঘুষের টাকা দেওয়া হত। খোলা জায়গায় কিংবা রাতের অন্ধকারে যখন ঘুষের টাকা দেওয়া হত তখন টাকা দেবার পরই সিগারেট ধরান সংকেতটারই বেশী প্রচলন ছিল। নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে সেই লোকটিকে ঘুষের টাকা দেবার জন্যে পাঠিয়ে দিয়ে পুলিশ এবং আর 'সকলে এমন জায়গায় এবং এমন ভাবে এক বা একাধিক দলে ভাগ হয়ে অপেক্ষা করত যে যার জন্যে ফাঁদ পাতা হয়েছে সে কিছুই টের পেত না। অথচ সব এমন জায়গায় থাকতেন যে আগে থেকে ঠিক করা সংকেতটি পাওয়া মাত্র কর্তারা দৌড়ে গিয়ে "বাছাধনের" কাছ থেকে চিহ্নিত নোট-গুলি উদ্ধার করে সঙ্গের Magistrate ও সম্ভ্রান্ত সাক্ষীদের সামনে হাজির করতেন ও আসামীকে গ্রেপ্তার করতেন।

কতৃর্পক্ষ যখন জানতে পারলেন যে একজন দশ বছরের পুরান District Magistrate I. C. S. Officer ঘুষ নিতে প্রবৃত্ত হয়েছেন, তখন তাঁরাও একটি বড় রকমের ফাঁদ পেতে বসলেন। Dr. Panda-কে ঝাউতলা রোডে Mr. Menon-এর কাছে পাঠিয়ে ঠিক হল যে ১৯৪৩ সালের ২০শে ডিসেম্বর রাত্রে Dr. Panda খড়গপুর থেকে নগদ ৫০০৲ নিয়ে এসে ঝাউতলা রোডের বাড়ীতে Mr. Menon-এর সংগে দেখা করতে চাইবেন, Mr. Menon Dr. Panda-কে রাস্তায় ডেকে নিয়ে কথাবার্তা বলবেন, এবং রাস্তার একটু অন্ধকার জায়গায় দাঁড়িয়ে টাকা দেওয়া হবে। তখন Black out চলছিল, রাস্তাত প্রায় সবটাই অন্ধকার; Black out-এর আইনে কোনও বাড়ীর দরজা জানালা দিয়ে সামান্য আলোও রাস্তায় পড়তে পেত না। D. I. Rules তখন পুরোদমেই চলছে। তার উপর ১৯৪৩ সালের ডিসেম্বর মাসে দিনের বেলাতেই জাপানী বোমারু বিমান মেটেবুরুজে বোমা ফেলে ধ্বংসলীলা করে গেছে। এ ঘটনা মাত্র ৮।১০ দিন আগেই ঘটে গেছে, সুতরাং সহরে তখনও থমথমে ভাব।

আলীপুরের District Magistrate তখন একজন ইংরেজ I. C. S. Officer। তাঁর হুকুম নিয়ে পুলিশ নির্ধারিত দিনে ও সময়ে আর একজন ইংরেজ I. C. S. Officer ও আরও কয়েকটি ভদ্রলোককে সংগে নিয়ে মার্কা করা ৫০ খানা দশ টাকার নোট Dr. Panda-র হাতে দিয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হল। আগের বন্দোবস্ত মত সেই টাকা সংগে নিয়ে Dr. Panda রাত্রি আন্দাজ ৮৷৷০ টা ৯টার সময় Mr. Menon-এর ঝাউতলারোডের বাড়ীতে হাজির হল। Menon যুগল—অর্থাৎ Mr. T. A. Menon নিজে এবং তাঁর আত্মীয় ও কেরাণী N. C. Menon সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এদিকে পুলিশ প্রভৃতি একটু দূরে দাঁড়িয়ে ওৎ পেতে অপেক্ষা করছিলেন। Dr. Panda যাওয়ার সংগে সংগেই মেনন যুগল বেরিয়ে এলেন এবং তাঁদের বাড়ীর দরজা থেকে একটু দূরে চলে এলেন। Mr. Menon নিজেই Dr. Panda-কে জিজ্ঞাসা করলেন, টাকা এনেছেন? "হ্যাঁ, এই যে টাকা"—বলে Dr. Panda মার্কা-করা নোটের বাণ্ডিলটি Mr. Menon-এর হাতে দিয়েই একটি সিগারেট ধরালেন। দিয়াশলাই-এর আলো জ্বলে ওঠা মাত্রই একসংগে ৪।৫ টি টর্চের আলো সেখানে পড়ল। দেখা গেল যে Mr. Menon একটি বাণ্ডিল

রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সহজ ভাবে হেঁটে তাঁর বাড়ীর দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। কাঁদপাতা ব্যাধের দল দৌড়ে গিয়ে মেননদ্বয়কে গ্রেপ্তার করলেন এবং রাস্তা থেকে নোটের বাণ্ডিলটি কুড়িয়ে নিলেন।

আগেই বলেছি, এ ব্যাপার ঘটেছিল ১৯৪৩ সালের ২০শে ডিসেম্বর। তারপরেই গভর্ণমেণ্টের অর্ডার বেরুল যাতে Mr. Menon-কে suspend করা হল। মামলার তদন্ত শেষ হতে প্রায় দেড় বছর লেগেছিল: ১৯৪৫ সালে গভর্ণমেণ্ট সিদ্ধান্ত করেন যে এই মেনন-যুগলের মামলা তখনকার কলকাতার Chief Presidency Magistrate Mr. W. J. Palmer I. C. S.-এর কাছে হবে। এই অবস্থায় এই মামলার কাগজ-পত্র সব আমার কাছে আসে। প্রথম দিন মামলা ডাক হওয়া মাত্র আসামী-পক্ষ থেকে আপত্তি করা হ'ল এই বলে যে ফৌজদারী কার্যবিধি আইনের ১৯৭ ধারা অনুসারে Mr. T. A. Menon-এর বিচারের স্থান নির্দেশ করার অধিকার বাংলা সরকারের থাকলেও N. C. Menon সম্বন্ধে ওরকম নির্দেশ দেবার অধিকার কারও নাই। ঘটনার স্থান ঝাউতলা রোড, অতএব মামলা হওয়া উচিত আলিপুর কোর্টে। এ বিষয়টি অতি সূক্ষ্ম আইনের কথা। আসামী পক্ষ থেকে এই আপত্তি দেওয়ার পরে কলকাতার Chief Presidency Magistrate-এর আদালতে আর এ মামলা না চালিয়ে তখন আলিপুরে First Tribunal বলে যে Special Tribunal গঠিত ছিল মেনন যুগলের মামলার ভার সেই Tribunal-এর হাতে দেওয়া হ'ল।

১৯৪৬ সালের ২৫শে এপ্রিল Mr. Menon-এর জেল হল এবং তাঁকে সরকারী চাকরী থেকে বরখাস্ত করা হল। Mr. Menon প্রথমে High court-এ এবং পরে Privy Council পর্যন্ত Appeal করেছিলেন। কিন্তু কোথাও বিশেষ সুবিধে করতে পারেন নি।

ঘুষ নেওয়ার মামলা করা ছাড়া অনেক ক্ষেত্রে সে রকম মামলা চলে কিনা এ বিষয়ে আমাকে মতামত প্রকাশ করতে হ'ত। একবার সেরকম opinion

দিতে গিয়ে আমাকে এক সঙ্গে সর্ষেফুল ও ধোঁয়া দেখতে হয়েছিল। সেক্ষেত্রে সাক্ষ্য প্রামাণের মধ্যে ছিল এক Union Board-এর একটি মাত্র ফাইল। সে ফাইলে মোকদ্দমার বিবরণ, সাক্ষ্য প্রভৃতি লিখে President Board-এর রায় লিখে দিয়েছিলেন এই বলে যে মোকদ্দমাটি মিথ্যা এবং এ বিষয়ে সব মেম্বারই "একমত" হয়েছেন। কিন্তু ঠিক তার নিচে আর একজন মেম্বারের হাতে লেখা এই কথাকয়টি দেখা গেল :

"প্রেছিডেণ্ট ছায়েব ৪০টি টাকা, ১০টি মুরগী, /৫ সের ঘি ও ২০টি ডিম পাইয়াছেন। আমাকে মোটে ২টি টাকা ও ৪টী ডিম দিয়া ঐক্য হইতে বলিতেছেন। ঘি বা মুরগী কিছুই দেন নাই—আমি ঐক্য হইতে পারিলাম না।"

যতই পড়ি, ততই যেন আমার সব গোলমাল হয়ে যেতে লাগল। Public Prosecutor হিসেবে opinion দিতে গিয়ে জীবনে এমন বিপদে কখনও পড়ি নাই। পুরো ব্যাপারটাই বা কি এবং ঘুষের মামলাই বা কটা এবং কার কার বিরুদ্ধে চলতে পারে, বা কারও বিরুদ্ধে চলতে পারে কিনা,—এই সব ভাবতে ভাবতে কিছুই ঠিক করতে না পেরে ফাইলটা বন্ধ করে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম!

Trap করে বা ফাঁদ পেতে ঘুষ ধরার অনেক মামলাই করেছি। তার মধ্যে আর একটি মামলা যেটির আসামী Privy Council পর্যন্ত appeal করেও ছাড়ান পান নি, এবার সেই মামলাটির কথাই বলছি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতবাসীদের যত রকম অসুবিধে হয়েছিল তার মধ্যে একটি প্রধান অসুবিধে ছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যে মাল চলাচল প্রায় বন্ধ হওয়া। গোটা ভারতবর্ষটাকে ভিন্ন ভিন্ন Region বা তল্লাটে ভাগ করে প্রত্যেকটি Region-এর জন্যে এক একজন Regional Controller of Priorities নিযুক্ত হয়েছিলেন। মাল পাঠাবার জন্যে wagon বা মালগাড়ীর বরাদ্দ করা Railway Station-এর Station মাস্টারদের এক্তিয়ারে তখন আর ছিল না। Regional Controller

of Priorities-এর কাছে wagon পাবার জন্যে আগে থেকে দরখাস্ত দিতে হত। সেই দরখাস্ত যথানিয়মে আফিসে রেজিস্ট্রী করে রাখা হত এবং তারপর নানারকমের তদন্ত করে স্থির করা হত—কোন দরখাস্ত আগে মঞ্জুর করা হবে। দরখাস্ত মঞ্জুর করার মালিক অবশ্য ছিলেন Regional Controller নিজে। কিন্তু তাঁকে কাজ করতে হত নানা রকম তদন্তের রিপোর্টের ওপর। এই তদন্তের ভার থাকত সেই কাজের জন্যে নিযুক্ত Inspector-দের ওপর।

১৯৪৫ সালে লড়াই যখন পুরোদমে চলছে, সোহনলাল নামে একজন লোক উত্তর-প্রদেশ থেকে কলকাতায় মাল আনবার জন্যে দুখানি wagon বা মালগাড়ী চেয়ে Regional Controller of Priorities, Eastern Region-এর Fairlie Place-এর আফিসে এক দরখাস্ত করেন। একটি wagon আসবে Allahabad থেকে এবং অপরটি আসবে Benares থেকে। এই দরখাস্ত সংক্রান্ত তদন্তের ভার পড়ে ফণীন্দ্রচন্দ্র নিয়োগী নামে এক Inspector-এর ওপর। এসব ক্ষেত্রে যা হয়ে থাকে—Inspector সাহেবের হাতে অগাধ ক্ষমতা। যাতে নিজের নিজের দরখাস্ত তাড়াতাড়ি 'pass' করিয়ে নিতে পারে, সেজন্যে অনেক উমেদার তাদের পেছনে ধর্ণা দিত। এমন সুযোগ ছাড়া বড় শক্ত। ফণীবাবু সোহনলালের কাছে মোটা টাকা ঘুষ চেয়ে বসলেন। দুএকদিন ঘোরা-ফেরার পর ঘুষের অঙ্ক ৫০০৲ টাকায় ধার্য হল। এদিকে সোহনলাল গোপনে পুলিশে খবর দিল। পুলিশ থেকে যথানিয়মে সোহন লালের হাতে Magistrate-এর মার্কাকরা Note দিয়ে ফাঁদ পেতে ১৯৪৫ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর ফণীবাবুকে ঐ Note সোহনলাল মারফৎ ফণীবাবুরই আফিসে ঘুষ দিয়ে এবং তারপরেই ঐ চিহ্ন-করা Note তার পকেট থেকে উদ্ধার করে ফণীবাবুকে গ্রেপ্তার করা হল। যথাসময়ে কলকাতার Chief Presidency Magistrate-এর এজলাসে এ-মামলার বিচার হল এবং ফণীবাবুর এক বছর জেল হল।

আগেই বলেছি, ফণীবাবু প্রথমে High Court, পরে Privy Council পর্যন্ত appeal করেছিলেন, কিন্তু কোন ফল হয় নি।

এবার খেলোয়াড়ের যে গল্প বলছি সেটি আমার শোনা, নিজে দেখা নয়। কিন্তু এ কাহিনী আমি সম্পূর্ণ সত্যি বলেই বিশ্বাস করি, যিনি এটা তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বলে বর্ণনা করেছিলেন আমার কাছে, তাঁর সত্যবাদিতা সম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই, এবং এটি খেলোয়াড়টির অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের নিদর্শন—এই তিন কারণে আমি পাঠক-পাঠিকাকে এটি উপহার না দিয়ে পারছি না, যদিও ব্যাপারটি কলকাতা থেকে অনেক দূরে ঘটেছিল।

লড়াই যখন চলছে, তখন মিলিটারী স্টোর্সের মাল এত চুরি হত যে তা নিয়ে মিলিটারী পুলিশ অফিসারদের প্রায় রোজই আমার সঙ্গে নানা বিষয়ে পরামর্শ করবার জন্যে আমার আফিসে আসতে হত। তাঁরা এক একজন অনেক সামরিক কেন্দ্র ঘুরেছেন—নানারকম তাঁদের বিচিত্র অভিজ্ঞতা। আগেই বলা ফণীন্দ্র নিয়োগীর ঘুষের মামলাটি যখন চলছে তখন এই জাতীয় একজন বহুদর্শী মিলিটারী পুলিশ অফিসার পরামর্শের জন্যে আমার আফিসে আসেন। তিনি অবশ্য নির্ধারিত সময়েই এসে আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন, কিন্তু সেদিন ঐ মামলাটির শুনানী একটু বেশী সময় নেওয়ায় আমার নিজের আফিস কামরায় ফিরতে অন্য দিনের চেয়ে একটু দেরী হয়ে গিয়েছিল। ইংরেজীতে যাকে বলে apology for having kept him waiting তাই করে আমি কথায় কথায় তাঁকে এক্ষেত্রে ফাঁদ পেতে ঘুষ ধরার গল্পটি বললাম। তখন তিনি তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার একটি গল্প আমায় বললেন—যা শুনে আমি অবাক হয়ে মনে মনে বললাম,—ওরে বাবা, কোন হাটে ছুঁচ বেচতে গেছি!

ঘটনাটি হল এই। উত্তর-পশ্চিম পাঞ্জাব অঞ্চলে মিলিটারী কাজে নিযুক্ত একটি Engineer-এর আফিস ছিল। Engineer সাহেবের নিজের বসবার কামরা যেটি সেখানে প্রবেশের পথ একটি মাত্রই ছিল, এবং সেটি ছিল আফিসের ভিতর দিয়েই। আফিসে প্রায় জন কুড়ি Overseer, Draftsman ইত্যাদি কাজ করত। এরপর Engineer-এর কামরাটিকে আমরা 'ছোট ঘর' বলব এবং আদত আফিসটিকে 'বড় ঘর' বলব। ঐ বড়ঘর আর ছোটঘরের মাঝে একটি full size spring-এর দরজা ছিল। Engineer সাহেব ছোটঘরের শেষ প্রান্তে spring-এর

দরজার দিকে মুখ করে বসতেন। কেউ তাঁর সংগে দেখা করতে এলে তাকে বড়ঘরের ভিতর দিয়ে গিয়ে spring-এর দরজার দিকে পিছন ফিরে Engineer সাহেবের মুখোমুখি হয়ে বসতে হত। মাঝখানে একটি বড় Secretariat table এবং তার তিন দিকে আগন্তুকদের বসবার জন্যে কয়েকখানি চেয়ার ছিল। এই মিলিটারী পুলিস অফিসারটি একদিন খবর পেলেন যে একজন মিলিটারী কন্ট্রাকটরের কাছে Engineer সাহেব ১০,০০০৲ টাকা ঘুষ চেয়েছেন। খবর পাওয়া মাত্রই trap করার অর্থাৎ ফাঁদ পাতার বন্দোবস্ত হয়ে গেল। কন্ট্রাকটরটিকে মার্ককরা ১০,০০০৲ হাজার টাকার নোট দিয়ে সংগে গিয়েছিলেন দুজন বড় মিলিটারী অফিসার, এই মিলিটারী পুলিশ অফিসার নিজে, স্থানীয় Superintendent of Police, এবং স্থানীয় I. C. S. Additional Deputy Commissioner। সে সময় একটি নতুন মিলিটারী Project-এর বিচার বিবেচনা চলছিল। একজন Overseer-এর হাতে সেই Project-এর Plan drawing-এর ভার ছিল। এই Overseer-টি যখন মাপজোপ করতে গিয়েছিলেন তখন এই দলেরই একজন মিলিটারী অফিসারের সংগে তাঁকে ঘুরতে হয়েছিল। মিলিটারী কণ্ট্রাকটর ছাড়া বাকী সকলে বড় ঘরে পেঁৗছে, যেন সেই project আর plan-এর সম্বন্ধেই কথা বলতে সদলবলে এসেছেন সেই রকম ভান করে সেই মিলিটারী অফিসারটি তাঁর বন্ধুদের নিয়ে সেই Project ইত্যাদির সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করে দিলেন। সেখান থেকে বড় ঘর ও ছোট ঘরের মাঝখানের Spring-এর দরজাটি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। আগের বন্দোবস্ত অনুযায়ী কণ্ট্রাকটরটি যেন এঁদের কাউকেই চেনে না এই রকম ভাব দেখিয়ে Engineer সাহেবের সংগে দেখা করবার জন্যে ছোট ঘরের দিকে গেল। Engineer সাহেব প্রস্তুত হয়েই অপেক্ষা করছিলেন ; চাপরাশীকেও এ বিষয়ে আগে থেকেই নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন মনে হয়, কারণ দেখা গেল কণ্ট্রাক-টরটি ছোট ঘরের দরজার কাছে যাওয়া মাত্রই চাপরাশী Spring-এর দরজা ফাঁক করে দিলে এবং কণ্ট্রাকটরটি ভিতরে ঢুকে গেল। এ ক্ষেত্রে নির্ধারিত সংকেত ছিল 'রুমাল দিয়ে নাক মোছা'। এক মিনিটের মধ্যেই কণ্ট্রাকটরটি রুমাল দিয়ে নাক মুছতে মুছতে Spring-এর দরজা ঠেলে বেরিয়ে এল, আর সংগে সংগে 'আক্রমনকারী দল' দৌড়ে গিয়ে Spring এর দরজাটি ঠেলে ছোট ঘরের ভিতরে ঢুকবার চেষ্টা করল। সবেমাত্র একজন ছোটঘরে পা দিয়েছেন,

Spring-এর দরজাটি তখনও তাঁর হাত দিয়ে ধরা, আর বাকী অফিসার কজন তাঁর পিছনে সার বেঁধে Engineer সাহেবের দিকে তাকিয়ে, ঠিক এই মুহূর্তে Engineer সাহেব যেন নিতান্তই ভয় পেয়ে গেছেন এই রকম ভাব দেখিয়ে সামনের দিকে আঙ্গুল বাড়িয়ে চিৎকার করে উঠলেন,—Why that Revolver? হঠাৎ এমন একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়ে গেল যে সেই ঝানু অফিসারগুলির প্রত্যেকেরই মনে হল যে ঠিক তাঁরই পিছনে কে একজন একটি revolver উঁচিয়ে আছে। তাঁরা সকলেই সন্ত্রস্ত হয়ে পিছন ফিরে তাকালেন, আর সেই অবসরে সেই অতি বড় খেলোয়াড় Engineer সাহেব সবাইকে বোকা বানাবার কাজটি বেমালুম সেরে ফেললেন। অফিসার-এর দল যখন কোন revolver দেখতে না পেয়ে মুখ ফিরিয়ে ছোট ঘরের ভিতর দাঁড়ালেন, তখন তাঁরা দেখতে পেলেন যে তাঁদেরই পায়ের কাছে চিহ্নিত নোটের বাণ্ডিলটি মাটিতে পড়ে আছে,—আর Engineer সাহেব ঘরের শেষ প্রান্তে নিজের চেয়ারে বসে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করছেন,—Why this intrusion into an important office like this? রুমাল দিয়ে নাক-মোছার সঙ্কেত সত্ত্বেও মার্কা-করা নোটের বাণ্ডিলটি Engineer সাহেবকে কেউ ছুঁড়ে ফেলতে দেখে নি বলে এই ঘুষ নেওয়ার মামলা চালান সম্ভব হয় নি। চরম সংকটের মুহূর্তে এমনভাবে পরম ঠাণ্ডা মাথায় বিদ্যুৎ-গতিতে বুদ্ধি খেলিয়ে কাজ করতে পারার কথা আমি কখনও দেখিওনি, শুনিওনি।

এই ঘুষ দেওয়া কি ঘুষ নেওয়া যে কত রকমে হয়, তার ইয়ত্তা নেই। আর এ সম্বন্ধে প্রচলিত যত রকমের গল্প আছে, তাও বলে বা লিখে শেষ করা যায় না। দারোগাবাবুর "পান খাওয়ার" জন্যে সের পাঁচেক ঘি এবং একটি নধর ও সুপুষ্ট ছাগ-কুলতিলক না নিয়ে গেলে যে থানায় ডায়েরী লেখান হয় না, এটা বাংলা দেশে কিম্বদন্তী হয়ে রয়েছে। দারোগাদের অসীম ক্ষমতা, দোর্দণ্ড প্রতাপ এবং সুপ্রচুর অর্থাগম (অর্থাৎ উপরি পাওনা) সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের বদ্ধমূল ধারণা কি রকমের, বহু-প্রচলিত 'বুড়ি ও জজ সাহেবের' গল্প থেকেই তার আভাষ পাওয়া যায়। একটি বুড়ির নাতিকে একটা ষাঁড় তেড়ে মারতে যাচ্ছিল। জজ সাহেব ঘোড়ায় চড়ে সে সময় সেইখান দিয়ে যাচ্ছিলেন;

তিনি ঘোড়ার চাবুক দিয়ে ষাঁড়টাকে দুএক ঘা মারতেই ষাঁড়টা উল্টো দিকে মুখ করে চোঁ চাঁ দৌড়। সাহেবের দয়ায় ছেলেটা সে যাত্রা এই ভাবে বেঁচে গেল দেখে বুড়ি দিদিমা দুহাত তুলে প্রাণ খুলে জেলার জজ সাহেবকে আশীর্বাদ করে বলেছিল,—"সাহেব, তুমি দারোগা হও"। আজকাল তবু এ সব গল্পের রেওয়াজ কমে গেছে। বহু পূর্বে মাঝে মাঝে কাগজে পড়া যেত যে অমুক দারোগা ঘুষ খাওয়ার অপরাধে জেলে গিয়েছে। কিন্তু গত কুড়ি পঁচিশ বছরের মধ্যে দেখা গেছে যে যতগুলি ঘুষের মামলা হয়েছে তাতে দারোগা-আসামীর সংখ্যা প্রায় নেই বললেই হয়; অন্য নানা জাতীয় কর্মচারীরা প্রায়ই ঘুষ নেওয়ার অপরাধে অভিযুক্ত ও দণ্ডিত হচ্ছেন। তার মানে এ নয় যে দারোগারা আর কেউ ঘুষ নেন না এবং সকলেই সাধু বনে গেছেন এই কবছরের মধ্যে। অবশ্য এই সময়ের মধ্যে অনেক শিক্ষিত ভদ্র-সন্তান দারোগার কাজ নিয়েছেন, এবং তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজন তাঁদের সারা কর্ম-জীবনে একটি পয়সাও ঘুষ হিসেবে নেন নি বা অন্য কোন অসদুপায়ে টাকা অর্জন করেন নি। এরকম পুলিশ অফিসারদের অন্য দারোগারাও শ্রদ্ধা করেন, অনেক সময় ভয় করে চলেন—জনসাধারণের ত কথাই নাই। এঁদের উন্নতিও হয়। কিন্তু আমার মনে হয় আগে ঘুষ নেওয়ার প্রথা, যেটা দারোগাদের মধ্যেই প্রায় সীমাবদ্ধ ছিল, সে পাপ-প্রথা এখন ব্যাপকভাবে নানা স্তরের কর্মচারীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। এমন কি প্রাদেশিক মন্ত্রী পর্যন্ত তার প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারেন নি, এর প্রমাণও পাওয়া গেছে। বিন্ধ্য-প্রদেশের মন্ত্রী রাও শিববাহাদুর সিং সেখানকার Minister of Industries ছিলেন। তিনি ও তাঁর সেক্রেটারী ঘুষ নেওয়ার অপরাধে দণ্ডিত হয়ে শেষ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টে আপীল করেন। আপীলের ফলে ১৯৫৪ সালের ৫ই মার্চ সুপ্রিম কোর্ট সেক্রেটারীকে খালাস দেন, কিন্তু রাও শিব বাহাদুর সিং-এর আপীল ডিস্‌মিস্‌ হয় এবং তাঁর দণ্ডাদেশ বহাল থাকে। অত উঁচুতে যদি ও পাপ ঢুকতে পারে—অন্যে পরে কা কথা!

আমি সওদাগরী আফিসের এক বড়বাবুর কথা শুনেছিলাম; তাঁর হাতে

অনেক চাকরী ছিল। তিনি একদিকে যেমন অত্যন্ত ভক্তবৎসল ছিলেন, তেমনি অন্যদিকে ভক্তির অভাবকে নাস্তিকতার সামিল ধরে নিয়ে সেই ভক্তিহীনের উপর সব সময় বিমুখ ও বাম হয়ে থাকতেন। তাঁর কাছে ভক্তির প্রমাণ ও মান—দুইই ছিল প্রণামী। একদিকে উপযুক্ত প্রণামী পেলে তিনি যেমন তুষ্ট হতেন, অন্যদিকে তেমনি প্রণামীর অভাব তাঁকে একেবারে রুষ্ট করে তুলত। তাঁর অধীনস্থ এক কর্মচারী আফিসের কাজেই একবার সাহেবের সঙ্গে কাশ্মীর অঞ্চলে গিয়েছিলেন। কাশ্মীর থেকে ফেরবার পরদিন ভোরবেলা বড়বাবুকে প্রণাম করতে যান; সঙ্গে প্রণামী নিয়ে গিয়েছিলেন—একটি বড় আনারস, এক ঝুড়ি আপেল ইত্যাদি কাশ্মীরি ফল, এক জোড়া ইলিশ মাছ, এবং একখানি কাশ্মীরি শাল—তার গায়ে পিন দিয়ে আটকান একখানি ১০০৲ টাকার নোট। বড়বাবু বাইরে আসতেই জিনিষগুলি বড়বাবুর পায়ের কাছে নামিয়ে রেখে ভক্তিভরে প্রণাম করলেন। বড়বাবু চোখ বড় বড় করে বললেন,—এ সব আবার তুমি কি করেছ হ্যা। ভদ্রলোক অতি বিনীত ভাবে বললেন,—ও কিছু না বড়বাবু, এগুলি সবই আমার গাছের; কাল সন্ধ্যেবেলা ফিরিছি কিনা, তাই ভাবলাম একেবারে আফিসে দেখা না করে আগে বাড়ীতে দেখা করে আপনার পায়ের ধুলোটা নিয়ে যাই। ভদ্রলোকের আশ্চর্য বৃক্ষ-প্রসূত এই দ্রব্য-সম্ভারের প্রণামী পেয়ে বড়বাবু এত প্রসন্ন হলেন যে, যাকে বলে একেবারে বত্রিশপাটি দন্ত বিকশিত করে সোজা জিজ্ঞেস করে বসলেন—কেউ আছে না কি হ্যা? ভদ্রলোক হাত কচ্‌লাতে কচ্‌লাতে হেঁ—হেঁ করে মিহি সুরে বললেন,—আজ্ঞে-এ-এ, আমার বড় শালাটি-ই-ই-ই—। বড়বাবু আবার দন্ত বিকশিত করে জিজ্ঞেস করলেন—B. A. পাশ করেছে ত? ভদ্রলোক আবার মুখ কাঁচু মাঁচু করে হাত কচ্‌লাতে কচ্‌লাতে টেনে টেনে বললেন—আজ্ঞে-এ—বড়বাবু-উ—, সেইটেই কিনা একটু-উ-উ ইয়ে-এ-এ, মানে-এ-এ—। বড়বাবু তখন চোখ বুজে গম্ভীর হয়ে মিনিট খানেক ভুরু কুঁচকে কি যেন চিন্তা করলেন। ভক্তবৎসল বোধ হয় মনে মনে ভক্তের মঙ্গল কামনাই করলেন। তারপর চোখ খুলে আরও গম্ভীর মুখে বললেন,—তোমার কুটুম্ব যখন, তখন আমায় করতেই হবে। তবে—B. A. পাশ তো নয়। —নতুন সাহেব ব্যাটা কি রকম পাজী জানই ত।···যাক আরও ১০০৲ টাকা নিয়ে ছোকরাকে সঙ্গে

করে ১০টার মধ্যে একেবারে আফিসেই এস। বড়বাবুর দয়া এ জীবনে ভুলব না—বলতে বলতে আর একবার বড়বাবুর পায়ের ধুলো নিয়ে ভদ্রলোক তখনকার মত বিদেয় নিলেন।

এবারের ১০০৲ টাকা গাছের হবে কি পুকুরের হবে, সে বিষয়ে দুজনের একজনও কোন কথা বললেন না। মনে হয়, এরকম ভুল হওয়া খুবই স্বাভাবিক!

মনুষ্য-জাতির মধ্যে ঘুষ নেওয়ার প্রবৃত্তিটা ক্ষুধারই একটি রূপ। এই ক্ষুধা এবং সেই ক্ষুধার তৃপ্তি ওরফে তুষ্টি—এই দুটোকে অপরাধ মনে করার মতন মহাপাপ আর হতে পারে না! তাই আমি ভক্তিভরে করজোড়ে বলি :—

"যা দেবী সর্বভূতেষু ক্ষুধা-রূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।"

* * *

* *

"যা দেবী সর্বভূতেষু তুষ্টি-রূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।"

* * *

* * *

মার্কণ্ডেয় পুরাণের রচয়িতা যদি এ যুগে জন্মাতেন, তাহলে মনে হয় উপরের দুটি শ্লোকের মাঝামাঝি কোথাও লিখতেন :—

"যা দেবী সর্বভূতেষু মুদ্রা-রূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।"

এ যাবৎ যত রকমের খেলার কথা বলে গেছি, সে সবই psychological অর্থাৎ মনস্তত্ত্ব জগতের খেলা। এ খেলা আমি অনেক দেখেছি। কিন্তু স্থূল জগতের খেলা—যাতে দৈহিক ব্যায়াম ও শারীরিক উন্নতি

হয়, যেমন ফুটবল, ক্রিকেট ইত্যাদি—তার সংগে আমার সম্পর্ক খুব অল্প বয়সেই কেটে গেছে। কলেজ ছাড়ার পরে ত একেবারেই নেই। তার প্রধান কারণ—১৯২০ সালে জানুয়ারী মাসে অফিসে ঢুকে কর্ম জীবন আরম্ভ করি। বেলা ১০টা থেকে সন্ধ্যে ৬টা পর্যন্ত অফিসের হাজরে ত ছিলই, অধিকাংশ দিন কাজ সেরে অফিস থেকে ৭টা ৭॥০টার আগে বেরুতে পারতাম না। তা ছাড়া সকালে ও রাত্রে হয় Senior-দের বাড়ীতে নয় নিজের বাড়ীতে মামলা-মোকদ্দমা সংক্রান্ত কাজকর্ম বা পড়াশুনো করতে হত। প্রথম ৫ বৎসর আবার তার উপর পরীক্ষার পড়াও ছিল। সেই জন্যে খেলাধুলা বা সিনেমা ইত্যাদি কোন জগতের সংগে আমার পরিচয় ছিল না। ফলে একদিন আমাকে বড় বিপদে পড়তে হয়েছিল—সেই কথাই বলছি।

মনে পড়ছে—সেটা ১৯২৫ সালের আগষ্ট মাস। আমি তখন হাই-কোর্টের এ্যাটর্নি, Orr Dignam কোম্পানীর অফিসে চাকরী করি। একটি বিশেষ মামলার কাজে সেদিন আমার অফিস থেকে বেরুতে ৭টা বেজে গিয়েছিল। অনেক সময় অফিস থেকে হেঁটে আমার ভবানীপুরের বাড়ীতে আসতাম, কারণ ঐটুকুই ছিল আমার অঙ্গ চালনা ও মোকদ্দমার কাজ থেকে বিশ্রাম। এদিনও আমি সেই মতলব নিয়ে Dalhousie Sq. থেকে হেঁটে Mayo Road-এর ভিতর দিয়ে Park Street-এর মাথায় Chowringhee-তে এসে উঠলাম, এমন সময় খুব জোরে বৃষ্টি এল। ভবানীপুরগামী একখানা ছোট Bus—সে সময় অনেক ছোট বাস চলত—৩।৪ জন যাত্রী নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াতেই তাতে উঠে পড়লাম। যাত্রীদের মধ্যে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক—বোধ হয় অফিস-ফেরতা—হাতে একটি ইলিশ মাছ এবং একটি ঝাড়নে বাঁধা কিছু তরিতরকারী, একটি বেঞ্চে বসে ছিলেন। আমি বসবার আগেই আমাকে প্রশ্ন করে বসলেন—মশাই, Wari-Worcestershire-এর খবর কি? আমি ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে না পেরে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম—কি বলছেন? ভদ্রলোক আবার তাঁর সেই প্রশ্নই করলেন। আমি তখনও ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে বললাম—আপনি কি বলছেন ঠিক বুঝতে পারছি না। তখন ভদ্রলোক নিতান্ত রেগে গিয়ে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে হাত নেড়ে বলে উঠলেন—Wari-Worcestershire,

Wari-Worcestershire। আর যে ২।৩ জন যাত্রী ছিলেন তাঁদের ঠোঁটের কোণে হাসি দেখে বুঝলাম যে তাঁরা আমাদের কথাবার্তায় বেশ একটু আমোদ অনুভব করছেন। বৃদ্ধের অহেতুক রাগ দেখে কিন্তু আমার কৌতুক করার প্রবৃত্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। আমি বললাম—ছেলেবেলায় Geography-তে পড়েছিলাম যে Worcestershire হচ্ছে সুদূর সাগর পারে ইংলণ্ডের একটি জায়গা; আর যতদূর জানি Wari হচ্ছে ঢাকা সহরের উপকণ্ঠে একটি স্থান। এই দুটো জায়গার মধ্যে আপনি যে কি একটা সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করছেন, সেটা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। আমার কথা শুনে অন্য কজন যাত্রী হো হো করে হেসে উঠলেন। বৃদ্ধ কিন্তু খুবই রেগে কতকটা অভিমান ও কতকটা হতাশা-মেশান স্বরে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে কতকটা স্বগত-ভাবেই বললেন—দিব্যিত খেলাটি দেখে Waterproof-খানা গায়ে চাপিয়ে হেলতে দুলতে এসে বাসে চাপলেন। বুড়ো মানুষ—না হয় ইংরিজি কায়দা না জেনে খেলার খবর জিজ্ঞেস করে বসেছি—তাতে এত ব্যঙ্গ কেন? আমি বললাম—মাফ করবেন মশাই, পরের চাকরী করি। একটু আগেই অফিস থেকে বেরিয়েছি—বৃষ্টির জন্যে বাসে উঠেছি। আজ Wari-Worcestershire-এর খেলা ছিল আপনার কাছে তা এই প্রথম শুনলাম। আমি ব্যঙ্গ মোটেই করি নি। ও খবর জানতাম না বলেই আপনার প্রশ্ন বুঝতে পারি নি। এমন সময় বাসটি Stoppage-এ দাঁড়াতেই বৃদ্ধ—ন্যাকা আর কি? খবরের কাগজখানাও যেন পড়েন না—বলতে বলতে তাঁর মাছ-তরকারীর পুঁটলি নিয়ে নেমে গেলেন। তাঁর রকম দেখে মনে হল যেন তিনি আমার ওপর রাগ করে তাঁর নামবার Stoppage-এর দুএকটা Stoppage আগেই নেমে গিয়ে আমার মত বেয়াদবের হাত থেকে পালিয়ে বাঁচলেন।

আমি ও বিষয়ে না হয় সম্পূর্ণ নিরামিষ বলে ও রকম বিপদে পড়েছিলাম আর মনে মনে ঠকে গিয়েছিলাম। কিন্তু আপনারা যে ২৫৲ কি ৩৫৲ টাকা কিম্বা তার ওপরেও ব্ল্যাক-মার্কেটের দাম দিয়ে টিকেট কিনে কত কষ্ট সহ্য করে Test Match দেখে থাকেন, আপনাদিকে আমি যদি একটা সামান্য প্রশ্ন করি ঐ বিষয়েই, মনে হয় প্রায় সকলেই ঠকে যাবেন। আমার প্রশ্নটি হচ্ছে—বলতে পারেন Official Test Match সর্বপ্রথম বাংলাদেশে কবে খেলা হয়েছিল?—সঠিক জবাব পাচ্ছি বলে মনে হচ্ছে না, তাই তারিখটা আমিই

জানিয়ে দিচ্ছি—5th of January, 1934। ১৯৩৩ সালের বড়-দিনের ছুটির পর ১৯৩৪ সালে জানুয়ারী মাসে যখন কোর্ট-কাছারী খুলল, তখন Government থেকে এই Order-টি পেয়েছিলাম—

"5th of January, 1934, is declared to be a public holiday being the opening day of the first Test Match between England and India ever to be played in Bengal."

এমনই বরাত করেছিলাম যে public holiday থাকা সত্ত্বেও ঐ দিনের খেলা দেখার সুযোগ করে উঠতে পারি নি।

আবার মনস্তত্ত্ব জগতের খেলায় ফিরে আসা যাক। দুনিয়ায় যত রকমের খেলোয়াড় আছে, তার মধ্যে যেগুলি আমার কাজের আওতায় এসেছে, সেগুলির মধ্যে দেখেছি সবারই উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের লাভ। তার মধ্যে আবার এক দল ছিল যারা নিজেদের লাভের জন্যে প্রতারণা ত করতই, তার উপর তারা মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতেও পেছপা হত না এবং তাদের দরকার হলে মানুষের জীবন নিতেও কুণ্ঠাবোধ করত না। গণিকাদের বিপদ সম্বন্ধে আগেই হাড়কাটা গলির ব্যাপারটিতে কিছু আভাষ দিয়েছি। তাদের কাছে যারা আসত তাদের দশজনের মধ্যে নজন হয়ত শুধু লালসা চরিতার্থ করতেই আসতো কিন্তু বাকী একজনের লক্ষ্য থাকত হতভাগিনীর টাকা গয়না ইত্যাদি,—তার দেহ নয়। এবার যে ঘটনার কথা বলছি, এটা হয়েছিল চিৎপুর অঞ্চলের গণিকা-পল্লীতে।

ঐ জায়গায় একটি বাড়ীর রাস্তার দিকের দোতলার ঘরে থেকে একটি ঐ জাতীয় মেয়ে তার ব্যবসা চালাত। তার ঘরের সামনে রাস্তার ওপর একটি ছোট্ট বারাণ্ডা ছিল। রাস্তার ওপরে একটি চায়ের দোকান ছিল—মেয়েটি রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠে ঐ বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে চা পাঠিয়ে দেবার জন্যে চা-ওয়ালাকে বলত। চা-ওয়ালার একটি বাচ্ছা চাকর তখন এক গ্লাস গরম চা মেয়েটির ঘরে দিয়ে যেত। একদিন রাত্রে মেয়েটি একটি অপরিচিত লোককে নিয়ে তার ঘরের দোর বন্ধ করল। পর দিন সকাল বেলা চায়ের দোকানের সেই বাচ্ছা চাকরটা অস্বাভাবিক কিছু দেখে সেই বাড়ীর বাড়ীওয়ালীকে

চিৎকার করে ডাকল। বাড়ীওয়ালী বেরিয়ে এলে ছেলেটি তাকে দেখাল যে মেয়েটির বারাণ্ডার রেলিং থেকে দুখানা শাড়ী মাঝে গিঁট বাঁধা অবস্থায় লম্বা হয়ে ঝুলে রাস্তায় লুটিয়ে পড়েছে। বাড়ীওয়ালী তখন ঐ বাড়ীর অন্যান্য মেয়েদের ডেকে নিয়ে সেই মেয়েটির ঘরের দরজা ঠেলে দেখে যে মেয়েটি অকাতরে ঘুমুচ্ছে, কাছেই একটি বিয়ারের বোতল ও দুটি গ্লাস রয়েছে, এবং ঘরের আলমারী বাক্স প্রভৃতি সব খোলা ও কাপড়-চোপড় সব চারদিকে ছড়ান। মেয়েটির নিঃশ্বাস বইছে দেখে তার চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে একটু ঠেলাঠেলি করতেই মেয়েটি উঠে বসল। ইতিমধ্যে একজন থানায় খবর দিয়েছিল—পুলিশও এসে পড়ল। পুলিশের কাছে মেয়েটি তার গয়না-গাঁটি, টাকাকড়ির যে ফর্দ ও হিসেব দিল, দেখা গেল সে সবই উধাও হয়েছে। বাড়ীওয়ালী এ কথা জানাল যে সে রোজ রাত্রি ১২টা নাগাদ সদর দরজায় ভেতর থেকে তালা দিয়ে চাবি নিজের কাছে রাখে এবং ঘটনার দিন রাত্রেও সে তাই করেছিল। এই দিন সকালে সে চায়ের দোকানের বাচ্ছা চাকরটির চেঁচামেচিতে নিজে হাতে তালা খুলে বেরিয়ে আসে। তাতে বোঝা গেল গতরাতের শয়তানটি বিয়ারের সঙ্গে কোনও ওষুধ খাইয়ে মেয়েটিকে অজ্ঞান করে প্রথমে তার গয়নাগাঁটি টাকাকড়ি হাতায়, তার পর ঘরের দরজা খুলে প্রথমে সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করে। সদরের তালা বন্ধ দেখে আবার মেয়েটির ঘরে ফিরে এসে দরজাটি খালি ভেজিয়ে রেখে রেলিঙের সঙ্গে দুখানা শাড়ী বেঁধে সেই শাড়ী বেয়ে রাস্তায় নেমে পালিয়েছে। পুলিশ খুঁজতে খুঁজতে মেয়েটির ঘরের এক কোণে একটি Chloral Hydrate-এর শিশি পেল। Chloral জিনিসটা বিষ হলেও ডাক্তাররা অনেক সময় রোগীকে ঘুম পাড়াবার জন্যে Chloral খেতে দেন। Chloral-এর কাজ খুব শীগ্‌গির মাথার ওপর আরম্ভ হয়, এবং ফলে রোগী ঘুমিয়ে পড়ে। Chloral-এর ক্রিয়া সম্বন্ধে ডাক্তারী বইতে লেখে,—"Depression of the central nervous system, which first shows itself by a general diminution of objective perception, or diminished consciousness, and so a tendency to sleep." তবে এ ওষুধটি বেশীক্ষণ পাকস্থলীতে থাকে না। মেয়েটির কথায় জানা গেল যে সে রাত্রি ১১টা ১১৷৷০ টার মধ্যেই বিয়ার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে, তারপর থেকে সে আর কিছুই জানে না।

পুলিশের সরজমিনে তদন্ত শেষ হতে হতে বেলা প্রায় দশটা বাজল। তারপরে থানায় গিযে Report ইত্যাদি লেখা হবার পর বেলা ১২টা নাগাদ মেয়েটিকে হাসপাতালে পাঠান হল। হাসপাতালের নিয়মিত প্রথা অনুসারে বেলা প্রায় ১টার সময় মেয়েটির পাকস্থলী থেকে পাম্প করে কতকটা জলীয় পদার্থ বার করা হল, এবং সেটা Chemical Examiner-এর কাছে পরীক্ষার জন্যে পাঠান হল। পরীক্ষায Chloral বিষ সেই জলীয় পদার্থের মধ্যে পাওযা গেল।

তদন্ত করতে করতে সন্দেহ করে একটি লোককে গ্রেপ্তার করা হল। মেয়েটিও তাকে সনাক্ত করল। আরও খবর পাওযা গেল যে আগেও ২।৩ বার বেশ্যা-মহলে Chloral খাইযে অজ্ঞান করে টাকা-পযসা ও গয়না নিযে পালাবার সন্দেহে পুলিশ এই লোকটাকেই গ্রেপ্তার করেছিল, কিন্তু সেসব মামলায় কেউই লোকটাকে সনাক্ত করতে পারে নি,—তাই তাকে ছেড়ে দিতে হয়েছিল। এবার কিন্তু মেযেটি লোকটাকে চিনে ফেলল।

আমার কাছে মোকদ্দমার কাগজপত্র এলে দেখলাম যে :

(১) সেই ঘরের জিনিষপত্রে (যেমন বিযারের বোতল, কাঁচের গ্লাস, আলমারির হাতল ইত্যাদিতে) যে সব আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে, তাদের মধ্যে একটিও workable নয়—অর্থাৎ সে আঙুলের ছাপ যে কার তা বোঝা যায় না।

(২) ডাক্তারী কেতাবে বলে যে রাত্রি ১১টা কি ১২টার সময় Chloral Hydrate খেলে যদি কোন লোকের মৃত্যু না হয, তা হলে পরের দিন বেলা ১টার সময় তার পাকস্থলীতে Chloral-এর কোন সন্ধান পাওয়া যাবে না।

(৩) Chloral খাওয়ার পর ১ ঘণ্টা কি বড় জোর ২ ঘণ্টার মধ্যে Stomach Pump না নিলে তারও পরের Chemical Examination-এ Chloral ধরা পড়বে কি না খুবই সন্দেহ।

(৪) এই ক্ষেত্রে Stomach Pump নেওয়ার অন্তত ৭ ঘণ্টা আগে থেকে মেয়েটি পুলিশের হেফাজতে ছিল, এবং সজ্ঞানে পুলিশের তদন্তে বরাবর সহায়তা করে এসেছে—কোন সময়েই যে তার ঘুমের আমেজ পর্যন্ত দেখা গিয়েছিল, সে রকম প্রমাণ কোথাও ছিল না।

আমি উপরের বিষয় কয়টির প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে পুলিশের কতৃপক্ষকে জিজ্ঞাসা করে পাঠাই :

(ক) হাসপাতালে যাবার কতক্ষণ আগে মেয়েটি Chloral Hydrate খেয়েছিল এবং সেই Chloral Hydrate সে কোথায় পেয়েছিল—এই অনুসন্ধানটি তাঁরা করবেন কি ?

(খ) আমি যে চারটি বিষয় উপরে লিখেছি, সেগুলির সম্বন্ধে Police Surgeon-এর মতামত নেবেন কি ?

বলা বাহুল্য, এর পর আর ও মামলার কাগজপত্র আমার কাছে ফিরে আসে নি। অতএব আমার আর কিছু ও বিষয়ে করবার থাকে নি।

তারপর অনেকবার আমি এ বিষয়ে ভেবেছি—এবং গভীর-ভাবেই ; কিন্তু এ ক্ষেত্রে আদত খেলাটি কি এবং আসল খেলোযাড়টি কে—এ আমি অনেক চিন্তা করেও ঠিক করতে পারি নি।

এবার খেলোযাড়দের আর একরকম খেলার খবর বলছি।

এক সময়ে কয়েকটি বাঙ্গালী যুবক মারাত্মক রকমের কুপথে গিয়ে কলকাতার বেশ্যা-মহলে হুলুস্থুল কাণ্ড বাধিয়ে বসেছিল। তারা ঘুরে ঘুরে আগে সন্ধান নিত কোন গণিকার ঘরে একসঙ্গে বেশী টাকাকড়ি ও গয়নাপত্র পাওয়া যেতে পারে। তারপর সেই হতভাগিনীকে লক্ষ্য স্থির করে দলের একজন রাজা কি জমিদারবাবু সাজত ও বাকী কজন তার বন্ধু ও মোসাহেব সাজত, এবং সেইভাবে তারা Taxi চেপে সেই মেয়েটির ঘরে গিয়ে উঠত। তাদের কাপ্তেনিব বিভিন্ন ধরণ ছিল—কখনও তারা মেয়েটির ঘরে গানের জলসা বসিয়ে দিত, কখনও Taxi-তে করে joy-ride-এ বেরুত—পরে বেশী রাত্রে ফিরে এসে কোন দিন সকলে চলে আসত ; আবার কোনদিন বন্ধুবান্ধব ও মোসাহেবরা চলে আসত, জমিদারবাবু মেয়েটির ঘরে থেকে যেত। ৪।৫ দিন এই রকম হৈ হুল্লোড় করাতে মেয়েটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ও অন্তরঙ্গতা তাদের খুব বেড়ে যেত। তার পর হঠাৎ একদিন সকালে দেখা যেত যে মেয়েটি মরে পড়ে রয়েছে—ঘরের ভিতর বিয়ারের বোতল ও কাচের গ্লাসের ছড়াছড়ি, কিন্তু মেয়েটির গায়ে বা ঘরের কোথাও সোনা-দানা হীরে-জহরৎ বা টাকাকড়ির

চিহ্নমাত্র নেই। খবর পেয়ে পুলিশ এসে মেয়েটির লাশ ময়না-তদন্তে পাঠাত। আর Finger Print Bureau থেকে expert এসে বোতল, গ্লাস, আয়না প্রভৃতি থেকে অনেকগুলি করে workable finger impression বা কার্যকর আঙুলের ছাপের ফটো নিয়ে প্রত্যেকখানি ফটোর পেছনে সে Case-এর reference লিখে রাখতেন এবং তাঁদের Register-এও দিনের দিন সেই সব particulars record করে রাখতেন। পরে কোন বোতলের বা কোন গ্লাসের থেকে কোন আঙুলের ছাপের ফটো পাওয়া গেছে সেটা বোঝাবার জন্যে সেই বোতল ও গ্লাসের ওপর নম্বর ও মার্কাদেওয়া লেবেল এঁটে বোতল ও গ্লাসগুলি পুলিশের হেফাজতে রাখার জন্যে ফেরৎ দিয়ে দিতেন।

এখানে বলে রাখতে চাই যে তখনকার দিনে এই Finger Print Bureau ছিল Bengal C. I. D.-র একটি scientific investigation section অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক তদন্তের বিভাগ—এটা Calcutta Police বা District Police-এর অধীন ছিল না। এটি জানিয়ে রাখলাম এই জন্যে যাতে কেউ ভুলেও ধারণা করতে না পারেন যে Finger Print-গুলির রেকর্ডপত্র স্থানীয় পুলিশের প্রয়োজনমত করান বা বদলান সম্ভবপর হত।

যাক, যা বলছিলাম। এই ধরণের খেলায় এক বছরের ভেতর বাগবাজার থেকে টালিগঞ্জের মধ্যে কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে ৬ জন অভাগিনীর জীবনের অবসান ঘটল। সব জায়গাতেই প্রণালী একই—বিয়ারের সঙ্গে বিষ মেশান। ঐ ৬ জায়গারই জমিদারবাবু ও মোসাহেবদের চেহারার বিবরণ যা পাওয়া গেল তা থেকে বোঝা গেল যে একই দল এই সব কটি খুন করেছে—খালি জমিদার সাজাটা তাদের মধ্যে by turn হয়েছে—অর্থাৎ একবার যে জমিদার সেজেছে পরেরবার সে দলের অপর একজনকে জমিদার সাজিয়ে নিজে মোসাহেব হয়েছে। কিন্তু সব জায়গাতেই বিশেষত্ব ছিল এই যে—যে গ্লাসে মেয়েটির হাতের ছাপ থাকত সে গ্লাসে Potassium Cyanide সব ক্ষেত্রেই পাওয়া গিয়েছিল এবং সব কটি মেয়েরই Stomach washing পরীক্ষা করে তার মধ্যে alchohol ও Potassium Cyanide-এর অস্তিত্ব পাওয়া গিয়েছিল। এই ছটি খুনের ঘটনা নিয়ে একটি ষড়যন্ত্র ও খুনের মামলা হয়েছিল—যাকে সাধারণত Cyanide Poisoning Case বলা হত। Cyanide বিষটির বিশেষত্ব হল এই যে সামান্য একটুখানি Pot. Cyanide ভেতরে গেলেই যে গিলল সে সঙ্গে সঙ্গে দম-বন্ধ হয়ে মারা যাবে—কোন রকম আওয়াজ বা

চিৎকার করা তার পক্ষে অসম্ভব। যে ছজন অভাগিনীর কথা বলছি—যাদের একমাত্র অপরাধ ছিল এই যে তারা তাদের ব্যবসার মেয়েদের মধ্যে অনেকের চাইতে বেশী গয়না-গাঁটি টাকাকড়ি সঞ্চয় করতে পেরেছিল—তাদের কেউ-ই এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার আগে চিৎকার করা দূরে থাক, একটি টুঁ শব্দ পর্যন্ত করতে পারে নি।

এই খুনী আসামীর দলটিকে ধরবার জন্যে Police Gazette-এ নানা রকমের বিজ্ঞপ্তি দিয়ে অনেক রকম অনুসন্ধানের ব্যবস্থা হল, কিন্তু কোথাও কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। পুলিশ অবশ্য ভেতরে ভেতরে আসামীদের সন্ধানে রইল।

একদিন সন্ধ্যার সময় কলকাতা পুলিশের একজন Detective Inspector কোন খবরের ওপর নির্ভর করে ছদ্মবেশে কালীঘাটের মন্দিরের পশ্চিমে 'ডালা'র দোকানগুলির ওপর নজর রাখলেন। সন্ধ্যার পর যখন মার মন্দিরে আরতি হচ্ছে, তখন দেখা গেল যে আগেকার জমিদারবাবু ও মোসাহেবদের বর্ণনার সঙ্গে মেলে এমন ৪ জন যুবক এ.স ।/৫ আনা করে ডালা কিনছে। ছদ্মবেশে আরও ৩।৪ জন Police Constable ও জমাদার সেখানে ছিল—Inspector-টির চোখের ইসারা পেয়েই এই ছোকরা ৪ জনকে তারা গ্রেপ্তার করে ফেললে। তল্লাসী নিয়ে তাদের দুজনের পকেটে Potassium Cyanide-এর শিশি পাওয়া গেল। পরে তাদের আঙুলের ছাপ নিয়ে দেখা গেল যে ঐ ছয়টি খুনের সব কটিতেই এদের হাত ছিল, কারণ এদের হাতের ছাপ প্রত্যেকবারের ঘটনারই বোতল গ্লাসে পাওয়া গেল। এরা সকলেই স্বীকারোক্তি করল—এবং বাকী আরও দুজন সহজেই ধরা পড়ে গেল। Test Identification Parade করা হল, তাতে প্রত্যেক ঘটনার বাড়ী থেকে ১৫।১৬ জন করে সাক্ষী এদের চিনতে পারল। আমি যত মামলা করেছি তার মধ্যে প্রমাণের এত প্রাচুর্য আমি খুব কম মামলাতেই পেয়েছি।

পুলিশ-তদন্ত শেষ হলে মোকদ্দমা Magistrate-এর কাছে আরম্ভ হল, এবং সেখান থেকে আসামীরা হাইকোর্ট দায়রায় সোপর্দ্দ হল। হাইকোর্ট দায়রায় ৩১ দিন ধরে মামলাটি চলে। জজ ছিলেন Mr. Justice S. C. Mallik। সরকারপক্ষে মামলা চালিয়েছিলেন যিনি তিনি ক্রমে বাংলাদেশের Advocate General এবং ভারত স্বাধীন হওয়ার আগে Viceroy's Executive Council-এ Law Member ছিলেন

—Sir Asoka Roy। সরকার পক্ষে সাক্ষীর সংখ্যা ছিল ১২০ জনের ওপর —তার মধ্যে ৬০ জনের বেশী ছিল গণিকা।

মোকদ্দমা প্রমাণ করতে হলে natural witness থাকা চাই অর্থাৎ সাক্ষী স্বাভাবিকভাবে ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকলে তবেই আশা করা যায় যে সে সাক্ষী যথাযথ প্রমাণ দেবেন। Chance witness—অর্থাৎ দৈবাৎ কোন সাক্ষী শিয়ালদার লোক হয়ে মালদায় গিয়ে কিছু দেখে ফেললে—এমন সাক্ষীর জবানবন্দীর ওপর নির্ভর করা শক্ত ও বিপজ্জনক। এক্ষেত্রে অর্ধেকের বেশী সাক্ষী ছিল বেশ্যা—তারাই ছিল natural witness বা 'স্বাভাবিক সাক্ষী'—কারণ বেশ্যা-বাড়ীতে খুন ডাকাতি ও লাম্পট্যের প্রমাণ দিতে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বা শিরোমণি মশায়কে পাবার কথা নয়। ইংরেজীতে একটা কথা আছে—"You cannot expect the Archbishop of Canterbury to be a natural witness for proving a drunken brawl in a brothel"। কিন্তু আবার এটাও ঠিক যে এই জাতীয় সাক্ষীকে সহজেই হাত করা যায়—সত্যের প্রতি অনুরাগ তাদের কাছ থেকে সব সময় আশা করা যায় না। তার কিছু নমুনা এই মামলারই বর্ণনায় একটু পরে পাবেন।

হাইকোর্টে যখন এই মামলা আরম্ভ হল তখন প্রথম ২।১ দিন সব কজন সাক্ষীকেই নিয়ে আসা হয়েছিল। কিন্তু তাতে বড়ই একটা গোলমালের সৃষ্টি হতে লাগল। অতগুলি বিভিন্ন চরিত্রের পুরুষ সাক্ষী—তার মধ্যে অতগুলি ঐ চরিত্রের মেয়েছেলে—হাইকোর্টের বারাণ্ডায় যেন এক Pandemonium বা দানব-সভার সৃষ্টি হতে লাগল। তাই আমরা বন্দোবস্ত করে নিলাম যে এক একটি ঘটনা ধরে সেই বাড়ীর খুনের সাক্ষীদের খালি আনা হবে—এবং তাতে করে এক একদিনে ১৫।১৬ জনের বেশী সাক্ষীকে হাজির থাকতে হবে না। এইভাবে মামলা চলতে লাগল।

ঘটনাগুলির মধ্যে একটিতে যে মেয়েটি খুন হয়েছিল তার 'মানদা' বলে খুব একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল। মানদা ঐ খুন হওয়া মেয়েটির ঠিক পাশের ঘরেই থাকত। সে একাধিকবার আসামীদের দলের সঙ্গে গানের জলসাতেও উপস্থিত ছিল—তাদের সঙ্গে Taxi করে বেড়াতেও গিয়েছিল। সে বাড়ীতে 'জমিদার' সাজা আসামী অতুলকে মানদা সঠিক

চিনেছে—বাকী আসামীদের চিনতেও তার একটুও ভুল হয় নি। অতএব তার সাক্ষ্য ছিল অত্যন্ত মূল্যবান। খালি মেয়েটি খুন হওয়ার সময় মানদা সে ঘরে ছিল না—বাকী সবই তার প্রমাণ করবার কথা।

মামলা কয়েকদিন ধরে চলবার পর একদিন বিকেলে আমি এই মোকদ্দমার ভারপ্রাপ্ত Inspector-কে বললাম,—"কাল মানদাদের বাড়ীর সাক্ষীদের সব নিয়ে আসবেন, কাল ওই বাড়ীর ঘটনাটি প্রমাণ করা হবে।" Inspector-টি একটু মাথা চুলকে আমায় বললেন—"Sir, বড় একটা মুস্কিল হয়ে গেছে।" আমি জিজ্ঞাসা করলাম—"কি আবার মুস্কিল হল?" Inspector ভদ্রলোক খুব মুখ কাঁচুমাঁচু করে আমায় জবাব দিলেন—"আসামী অতুলের কাকা, Sir, মাস খানেক হল দেশ থেকে এসে মানদাকে বাঁধা রেখেছে। রোজ সন্ধ্যের সময় মানদার ঘরে অন্য সাক্ষীদের নিয়ে ওদের জটলা হয়।" সংবাদটা একটু চিন্তিত করে তুলল, কারণ মানদা আর সে বাড়ীর সাক্ষীরা ভেঙে গেলে মামলার বিশেষ ক্ষতি হবার সম্ভাবনা। Inspector-কে বললাম—"দেখুন, আইনে ত কোন রাস্তা নেই যা দিয়ে এর বিধান করা যায়। তা ছাড়া আপনি আমাকে যে সংবাদ এখন দিলেন, সেটা আপনি কোন মতে প্রমাণ করতে পারবেন না। আর যত দিন যাবে সাক্ষীরা তত বেশী গোলমাল করে বসবে, অতএব যত শীগ্‌গির এই সাক্ষীগুলি শেষ হয়ে যায় ততই ভাল, আপনি তারই বন্দোবস্ত করুন।" প্রথম দুদিনে ছোট ছোট সাক্ষী কতকগুলি হয়ে গেল। তৃতীয় দিনে সকাল ১০টার সময় Inspector-টি আমায় বললেন—"Sir, যেমন করেই হোক আজকে Tiffin এর আগে মানদার সাক্ষ্যটি শেষ করে দেবেন।" জিজ্ঞাসা করলাম—কেন, হঠাৎ আবার কি হল?" Inspector মাথা নীচু করে আমায় জবাব দিলেন—"কাল সন্ধ্যের সময় অতুলের কাকাকে 'Fifty-four'-এ arrest করিয়েছি। এখনও জামীন পায় নি। আজ বেলা দুটোর সময় Chief Presidency Magistrate-এর ঘরে তাকে হাজির করা হবে—তখন সে সঙ্গে সঙ্গে হাকিমের কাছ থেকে জামীন পেয়ে যাবে। সে যতক্ষণ জামীন না পায় ততক্ষণ মানদা প্রভৃতি অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে আছে ও থাকবে এবং সব সত্যি কথাই বলবে।"

মনে হয় উপরের 'Fifty-Four' সম্বন্ধে একটু পরিষ্কার করে বলা দরকার। Criminal Procedure Code-এর Sec. 54-এ অর্থাৎ ফৌজদারী

কার্যবিধি আইনের ৫৪ ধারায় বিনা warrant-এ পুলিশকে গ্রেপ্তার করবার অধিকার দেওয়া হয়েছে। কোনও অপরাধের প্রমাণ না থাকলেও যদি পুলিশের মনে যুক্তিসংগত সন্দেহ হয় যে কোন লোক কোন গুরুতর অপরাধ করেছে, তাহলে পুলিশ তাকে Sec. 54-এ গ্রেপ্তার করতে পারে। এই Sec. 54-এ কলকাতা পুলিশ যাদের সন্ধ্যের পর গ্রেপ্তার করে জামীনে খালাস দেয় না, তাদের পরের দিন সকাল ১১টার সময় Deputy Commissioner of Police-এর কাছে হাজির করে। তারপর বেলা দুটোর সময় কোর্টে হাকিমের কাছে হাজির করে। মামলার সাক্ষী ভাংগান অবশ্য একটি গুরুতর অপরাধ। কিন্তু এ অপরাধের জন্যে Sec. 54-এ আসামীকে গ্রেপ্তার করবার অধিকার পুলিশের নেই।

এ কথা অবশ্য মানতেই হবে যে এই Inspector-টি একটু বেআইনি কাজই করেছিলেন—অধর্ম করেছিলেন কি না জানি না। কারণ আর এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে, এমন একটা জলজ্যান্ত নৃশংস খুনের সত্যি মামলাটি অতুলের কাকার খেলোয়াড়ী চালে নষ্ট হয়ে যাবে এটা যদি Inspector-টি কোন মতে বরদাস্ত করতে না পেরে "শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ" এই নীতির আশ্রয় নিয়ে থাকেন সত্যেরই বিকাশের জন্যে, তা হলে তাঁকে খুব দোষ দেওয়া যায় কি? কোন কাজ যদি 'ফলেন পরিচীয়তে' হয়, তাহলে বলতে পারা যায় যে এ কাজ বিশেষ খারাপ হয় নি কারণ ফল খুব ভালই হয়েছিল—মানদা সাক্ষী সেদিন বেশ ভালই দিয়েছিল এবং সে ভয় পেয়ে সব সত্যি কথাই বলেছিল, যে সত্যি কথা সে তার খুন হওয়া অন্তরংগ বন্ধুর প্রতি ভালবাসা ও কর্তব্যের খাতিরেও বলতে চাইছিল না। কিন্তু তার পরের দিন দেখা গেল যে সে বাড়ীর অন্য সাক্ষীগুলো সব উল্টোপাল্টা বলতে আরম্ভ করেছে—কারণ অতুলের কাকা জামীনে বেরিয়ে গিয়েছিল!

এর পর একে একে ঘটনার সাক্ষীগুলি শেষ হয়ে গেল। তারপর Police Surgeon এসে প্রমাণ করলেন যে এই ছটি মেয়েদের প্রত্যেককেই বিয়ারের সংগে Potassium Cyanide খাইয়ে মেরে ফেলা হয়েছে। Potassium Cyanide-এর আস্বাদ তেতো, একমাত্র বিয়ারের সংগেই সামান্য একটু মিশিয়ে খাওয়ান যেতে পারে। কিন্তু যে খেল সে দম-বন্ধ হয়ে মারা যাবে। পরে সাক্ষী দিলেন Finger Print Bureau থেকে একজন Expert বা বিশেষজ্ঞ এসে। তিনি প্রত্যেকটি বোতল ও গ্লাসের ওপরে brush-এ করে Grey

Powder লাগিয়ে দেখিয়ে দিলেন যে যেখানে আপাততঃ কিছুই দেখা যায় না সেখানে কি রকম ভাবে আঙ্গুলের ছাপগুলো লুকিয়ে আছে। ঐ powder লাগানতে সেগুলো ফুটে উঠল। Expert তখন প্রতিটি ছাপের ছবিগুলির সঙ্গে মিলিয়ে দেখিয়ে দিলেন যে কবে কোন বাড়ী থেকে কোন বোতল বা গ্লাস নিয়ে তার ছবি নেওয়া হয়েছে, এবং তাঁর Register থেকে আরও দেখিয়ে দিলেন যে যেদিন যেদিন ঘটনাগুলি ধরা পড়েছে সেই সেইদিনই ছবি নেওয়া হয়েছে। আরও দেখা গেল যে যেদিন ওই Register ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে দাখিল করা হয় তার অল্পদিন আগে পর্যন্ত প্রায় তিন বছর ধরে Finger Print Bureau-তে যত ছবি নেওয়া হয়েছে তার সবগুলোর বিবরণই দিনের পর দিন case-এর নম্বর তারিখ প্রভৃতি দিয়ে লেখা রয়েছে ঐ Register-এ।

৩১ দিন মামলা চলার পর ৯জন জুরী প্রায় ৪।৫ ঘণ্টা ধরে নিজেদের মধ্যে এই মোকদ্দমার বিষয় নিয়ে বিবেচনা ও গবেষণা করলেন। তারপরেও তাঁরা ৫ জনের বেশী একমত হতে পারলেন না। High Court সম্বন্ধে আইন হচ্ছে যে এরকম অবস্থায় জুরীদের রায় জজসাহেব গ্রহণ করতে পারেন না—অন্ততঃ ৬ জন একমত না হলে জুরীর রায় গ্রহণযোগ্য হয় না। সে ক্ষেত্রে 'Re-trial' বা মামলা পুন-র্বিচারের হুকুম দেওয়ার অধিকার জজ সাহেবের আছে। কিন্তু জজ সাহেব বিবেচনা করে দেখলেন যে এ জাতীয় মোকদ্দমায় পুনর্বিচারে কোনই লাভ হবে না। কেবলমাত্র অযথা গোলমালের সৃষ্টি হবে। তাই তিনি আসামীদের হাজত থেকে মুক্তি দিলেন।

এ পর্যন্ত গেল খেলোয়াড়ের কথা। কিন্তু মনুষ্য-চরিত্রের সম্বন্ধে আর একটি কথা না বলে আমি এই প্রসঙ্গটি শেষ করতে পারছি না। এই মামলায় জুরীদের এ রকম রায় হওয়া অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় এবং কেন যে এ রকম রায় হল তা আমরা কেউই বুঝে উঠতে পারি নি। জুরিদের মধ্যে 'retire' করবার পর যে আলাপ-আলোচনা হয় তা একান্তই গোপনীয়, কারুরই তা জানবার অধিকার নেই। কিন্তু জুরীদের মধ্যে একজন তাঁর বন্ধুকে যে কথা বলেছিলেন, সে খবরটি পরে জানতে পারি। এই জুরর ভদ্রলোক নাকি রাজনৈতিক ব্যাপারে বৃটিশ আমলে পুলিশের হাতে অনেক নির্যাতন ভোগ করেছিলেন। তাঁর মতে সরকার পক্ষ থেকে যে আঙ্গুলের ছাপ প্রমাণ করা

হয়েছিল —তা নিতান্তই বাজে। তাঁর theory হল যে এই ছোকরা কটিকে যখন পর পর ধরা হল তখন তাদের ওপর নানা রকম অত্যাচার করা হয়েছিল এবং নিশ্চয়ই দীর্ঘকাল ধরে এক ফোঁটাও জল খেতে দেওয়া হয় নি। এই অবস্থায় তারা যখন তেষ্টায় বুকফেটে মরে যাচ্ছে সেই সময় পুলিশ তাদের যত অপরিষ্কার বোতল ও গ্লাসে করে জল খেতে দেয়। তারা প্রাণের দায়ে দুহাতে সেই বোতল ও গ্লাস ধরে ঢক্ ঢক্ করে সেই জল খেয়ে ফেলেছে এবং কাজে কাজেই তাদের হাতের ছাপ সেই বোতল ও গ্লাসে পড়েছে, এবং এইরকম ভাবে ঘটনাস্থলের জিনিষপত্রে আসামীদের আঙ্গুলের ছাপ নেওয়া পুলিশের পক্ষে অত্যন্ত সহজ কাজ ; এই রকম প্রমাণের ওপর নির্ভর করে ৫।৬টি বাঙালীর ছেলেকে ফাঁসীতে চড়ান নিতান্ত অন্যায়—এবং প্রায় খুনের সামিল। আসামীরা অবশ্য কেউই কোন সময়ে ও রকম কোন কথা আভাষে ইঙ্গিতেও বলে নি—বা তাদের তরফ থেকে জেরায়ও এ রকম কোন Suggestion পর্যন্ত ছিল না ; কিন্তু তা হলে কি হয়, ওই জুরর-পুঙ্গব অন্য জুরীদের মধ্যে তাঁর ঐ নিজস্ব মতবাদ প্রচার করে করে আরও জন জুররকে শেষ পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে একমত করাতে পেরেছিলেন। তাঁর বন্ধুটি তাঁর কাছ থেকে শুনে ওয়াকিবহাল মহলে আবার এই খবরটি পরিবেশন করেন—সেখানেই আমার এ কথা শোনা। এ খবরের সত্যি মিথ্যে বিচারের শক্তি একমাত্র সেই ৯ জন জুরি ছাড়া আর কারুরই নেই। তবে এটা ঠিক যে এই মামলার সব অকাট্য প্রমাণ কাটিয়ে আসামীকে খালাস দেওয়া বড় সহজ ছিল না।

তবে একটা কথা বলা যেতে পারে যে জুরীরা অনেক সময় ঘটনাচক্রে পড়ে বা দয়াপরবশ হয়ে—অর্থাৎ যে খুন হয়েছে সে ত গেছেই, আবার এক বা একাধিক জনকে এ পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার সহায়তা করি কেন এই রকম মনোভাব নিয়ে—নানা রকম অদ্ভুত রায় দিয়ে থাকেন। তার একটি উদাহরণ আমি এবার দিচ্ছি।

একবার কলকাতার High Court Sessions-এ একটি খুনের মামলা ছদিন ধরে চলেছিল। নজন জুরীর মধ্যে একজন ছিলেন কোন কলেজের প্রফেসর—বাকী ৮ জন যে কি করতেন আমি জানি না।

প্রফেসর জাতটি সাধারণতঃ সত্যপরায়ণ এবং কোনও অন্যায় বরদাস্ত করতে পারেন না। এই ভদ্রলোকও ছিলেন সেই শ্রেণীর। মামলার আরম্ভে যখন সরকারী কৌঁসুলী 'case open' করে মামলার বিবরণ বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন, তখন যেভাবে ইনি ঘাড় নাড়ছিলেন আর ডেস্কের ওপর ঘুঁসি মারছিলেন, তা দেখে মনে হচ্ছিল যে তিনি যেন সরকারী কৌঁসুলীর বিবরণ মাত্র শুনে সাক্ষী-সাবুদ না জেনেই আসামী বেচারাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেবার রায় দেবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছেন। তাঁর সে সময়কার আচরণ সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং সেই কারণেই ভদ্রলোকটি কে এবং কি করেন ইত্যাদি সংবাদ জানবার কৌতুহল অনেকেরই হয়েছিল।

প্রথম দুদিন যে সব সাক্ষী এসেছিল তাদের জবানবন্দীর সময় ভদ্রলোক সমানে ঘাড় নেড়েছিলেন এবং ডেস্ক চাপড়েছিলেন। তৃতীয় দিন থেকে ভদ্রলোক ক্রমশঃ কেমন যেন অসাধারণ গম্ভীর হয়ে গেলেন। বিচারের পঞ্চম দিনে সরকারী পক্ষের কৌঁসুলী ও আসামীর কৌঁসুলী দুজনেই যাঁর যাঁর বক্তৃতা শেষ করলেন। ষষ্ঠ দিনে বেলা ১টার মধ্যে জজ সাহেব জুরীকে 'চার্জ' দেওয়া শেষ করলেন। বেলা ১টার সময় জুরীগণ 'retire' করলেন, অর্থাৎ তাঁদের রায় কি হবে সেটা ঠিক করবার জন্যে তাঁদের জন্যে নির্দিষ্ট কামরায় ঢুকলেন। জুরীরা একবার সে ঘরে ঢুকলে যতক্ষণ তাঁদের বিচার শেষ না হয় ততক্ষণ তাঁরা বের হতে পারেন না, সে ঘর বন্ধ করে রাখা হয়। এক্ষেত্রে জুরীদের বেরিয়ে আসতে অস্বাভাবিক রকম দেরী হতে লাগল। তাঁরা বেরিয়ে এলেন বেলা প্রায় ৫টার সময়। সকলেরই মুখ গম্ভীর—তবে প্রফেসর ভদ্রলোকটির 'হাঁড়িমুখ' বিশেষ দ্রষ্টব্য ছিল। জুরীদের রায় জিজ্ঞাসা করাতে তাঁদের Foreman জবাব দিলেন যে তাঁরা সকলেই একমত যে আসামী 'নির্দোষ'। আসামী খালাস পেল।

বিচার শেষ হয়ে যাবার পর এই প্রফেসর ভদ্রলোক তাঁর বন্ধুমহলে যে গল্প করেছিলেন তার সারমর্ম হচ্ছে এই। প্রথম যখন তিনি সরকারী কৌঁসুলীর মুখে বিবরণটি শুনলেন তখন তিনি একজন নৃশংস হত্যাকারীর বিচারের ভার পেয়েছেন বলে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করেছিলেন, এবং মনে মনে স্থির করে ফেলেছিলেন যে ন্যায়-বিচার কাকে বলে তিনি একাই দেখিয়ে দেবেন। এই মনের ভাব নিয়ে তিনি প্রথম দিন হাইকোর্ট থেকে বাড়ী ফেরেন। তাঁর স্ত্রী জলখাবার এনে দিলেন, এবং তাঁর মা এসে

খাবারের থালার সামনে বসলেন। খেতে খেতে তিনি মা ও স্ত্রীকে মামলার গল্পটি বললেন। রাত্রেও স্ত্রী খাবার এনে দিলে মা পাখা হাতে থালার সামনে বসলেন। তখনও সেই মোকদ্দমার কথা। রাত্রে শুতে এসে স্ত্রী জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে আসামীর কি সাজা হবে। তিনি নির্বিকারভাবে জবাব দিয়েছিলেন,—"কেন ফাঁসি। এত বড় নৃশংস হত্যা—এতে ফাঁসি ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।"

পরের দিন সকালে তিনি দেখলেন যে বাড়ীর আবহাওয়াটা যেন বেশ গম্ভীর ও থমথমে। কোর্টে বেরোবার আগে যখন খেতে বসলেন মা পাখা করতে করতে বার-বার বললেন—"দেখিস বাপু, আমার ছেলে-পিলের ঘর। তুই কখনও ফাঁসি দিতে রায় দিস্‌নে যেন।" ভদ্রলোক মনে মনে বলেছিলেন যে মেয়েছেলের বুদ্ধিতে চলতে গেলে পুরুষ-জাতের আর কোন কাজই করা যায় না—এবং মনে মনেই হেসেছিলেন। প্রকাশ্যে তিনি ব্যাখ্যা করে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন যে জুরীতে বসবার সময় তিনি হলপ নিয়েছিলেন এই বলে—"shall give a true verdict according to the evidence", এবং আরও বলেছিলেন যে বিচারের কাজটা হচ্ছে রাজার কাজ, রাজ্যশাসন করতে গেলে অপরাধীকে দণ্ড দিতেই হবে, নইলে সমাজের ও রাষ্ট্রের শৃংখলা বজায় রাখা অসম্ভব হয়ে পড়বে। মা যখন তাতেও বললেন—"লোকটা যদি বাস্তবিকই খুন করে থাকে, ভগবানই তাকে তার সাজা দেবেন, তুই কেন বাপু এর মধ্যে যাস্?" তখন তিনি হেসে মাকে বলেছিলেন যে তিনি 'রাজকার্য' করতে যাচ্ছেন, সেখানে অপরাধীকে ছেড়ে দিলেই অপরাধ করা হবে। এই বলে তিনি নীচের শ্লোকটি মাকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন :—

"ক্ষমা শত্রৌ চ মিত্রে চ
যতীনামেব ভূষণম্।
অপরাধিষু সত্ত্বেষু
নৃপাণাং সৈব দূষণম্।"

সেদিন কোর্টে তাঁর ব্যবহারটা এমনই হয়েছিল যে যেন তিলমাত্র দেরী না করে আসামীটাকে তখনই ফাঁসি দেওয়াতে পারলে তিনি নিশ্চিন্ত হন। সেদিন কোর্ট থেকে যখন বিকেলে বাড়ী ফেরেন তখন

দেখলেন যে তাঁর মা ও স্ত্রী অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়ে রাস্তার ধারে এসে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছেন। সেদিন দুদিক থেকে তাঁর ওপর এমন আক্রমণ হতে লাগল যে তাঁর কর্ত্তব্য-বুদ্ধি, দায়িত্ব-জ্ঞান সবই যেন ভেসে যেতে লাগল। রাত্রিতে শোবার ঘরে একটু যেন কান্নাকাটিও হয়েছিল। পরের দিন সকালে বড়ই মানসিক অশান্তির সংগে ভাত খেতে বসলেন। একদিকে মায়ের হুকুম ও স্ত্রীর কান্না, অপর দিকে তাঁর নিজের কর্তব্য-জ্ঞান। তাঁর অবস্থা হল :—

"ইত্যেকপক্ষাশ্রয়বিক্লবত্বাৎ
আসীৎ স দোলাচলচিত্তবৃত্তিঃ।"

—অর্থাৎ কোন পক্ষ আশ্রয় করবেন সেটা স্থির করতে না পেরে তাঁর মনটা অনিশ্চয়তার দোলায় দুলতে লাগল।

ভদ্রলোক খুব মাতৃভক্ত ছিলেন। প্রতিদিন কাজে বেরুবার সময় মাকে প্রণাম করে বেরুতেন। সেদিন কোর্টে বেরুবার সময় যখন মা'কে প্রণাম করতে গেছেন, মা ভদ্রলোকের ৫ বছরের ছেলেটিকে কাছে এনে বললেন —"দ্যাখ্, যে গেছে সে ত' গেছেই। তুই কেন আর একজনের মরার ভাগী হবি? খোকনের মাথায় হাত দিয়ে তুই বলে যা যে তুই কিছুতেই লোকটার ফাঁসির হুকুম দিবি নি।" ভদ্রলোক প্রথমে একটু বিপন্ন হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু একটু পরেই মনস্থির করে মাকে বলেছিলেন— "মা, তোমাকে আমি কথা দিচ্ছি যে এ মামলায় আমি ফাঁসি হতে দেব না।" তারপরে বাকী কদিন তিনি একটু একটু করে নিজের রাস্তা তৈরী করছিলেন। জুরীদের মধ্যে অনেক সময়েই দু'একজন থাকেন যাঁরা ধরে নেন যে পুলিশ যে মামলা এনেছে সেটা একেবারেই মিথ্যে। এক্ষেত্রেও জুরীদের মধ্যে সে রকম দু'একজন ছিলেন। তাঁদের সহায়তায় বিচারের শেষ দিনে ঘন্টার পর ঘন্টা তাঁদের retiring room-এ তর্কাতর্কি করে বহুকষ্টে অন্য জুরীদের রাজী করে আসামীকে "নির্দোষ" বলে ছিলেন। কিন্তু ব্যাপারটিতে ভদ্রলোক নিজে এতটা বিরক্ত ও দুঃখিত হয়েছিলেন যে মামলা শেষ হবার পরেই তিনি তাঁর বন্ধুবান্ধবের কাছে তাঁর দুঃখের কথা জানিয়ে নিজেকে কতকটা হাল্কা করেছিলেন। অতি অল্পদিনের মধ্যেই গল্পটি শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত হয়ে হাইকোর্টে পৌঁছায়। আমি সেখানেই শুনি।

মনস্তত্ত্বের দিক থেকে গল্পটি একটু অদ্ভুত ধরণের ; তাই আপনাদের উপহার দিলাম।

জুরী-বিচার-বিভ্রাটের আর একটি কাহিনী বলছি। কলকাতার পার্ক স্ট্রীট অঞ্চলে কোন একটি বাড়ীর লাগাও একটি out-house ছিল। বাড়ীর মধ্যে অনেক ঘর ভাড়াটে ছিল—এবং ঐ out-house-এ সে বাড়ীর দারোয়ান, বেয়ারা, আয়া প্রভৃতি থাকত। একদিন ঐ out-house-এর একটি ঘরে একটি নেপালী বেয়ারা অন্যঘরের আট বছরের একটি মেয়ের ওপর পাশবিক অত্যাচার করে। মেয়েটির একেবারে রক্তারক্তি হয়ে গিয়েছিল। সে বেচারা যখন কাঁদতে কাঁদতে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে তখন তার চিৎকার শুনে আশেপাশের সব লোকজন এসে ঐ বেয়ারাটাকে ধরে ফেলে তাকে পুলিশে দেয়। যথারীতি তদন্তের পর মামলা চালান হয়, এবং আসামী দায়রা সোপর্দ হয়ে High Court Sessions-এ জুরীর সাহায্যে তার বিচার হয়।

এ সব মামলায় মেয়ে পুরুষ দু'পক্ষেরই কাপড়চোপড় পরীক্ষার জন্যে Chemical Examiner-এর কাছে পাঠান হয়। কতকগুলি জিনিষ Chemical Examiner নিজেই বিচার করে ঠিক করেন, কিন্তু রক্ত প্রভৃতি বিষয়ে সূক্ষ্মতর বিচারের জন্যে Serologist-এর কাছে দেন। পরে Serologist-এর report পেলে তাঁর নিজের report ও Serologist-এর report দুটো একসঙ্গে করে পাঠিয়ে দেন। এই মামলায়ও ঐ দুটি report একসঙ্গে ছিল—কিন্তু report দু'টির একটু বিশেষত্ব ছিল। মেয়েটি যে কাপড় পরেছিল সে-সময় তাতে রক্ত প্রভৃতি সব কিছুই ছিল। আসামী যে প্যান্টটি পরেছিল সেটির পরীক্ষা সম্বন্ধে Chemical Examiner লিখেছিলেন—"Blood not found." কিন্তু ঐ কথা ক'টির পরই একটি "*" এই ভাবের তারকা-চিহ্ন দিয়েছিলেন। ঐ report-এর কাগজেরই নীচের দিকে ঐ তারকা-চিহ্নের কৈফিয়ৎ দেওয়া ছিল এইভাবে—"* Small brownish stains not examined. Sent to Imperial Serologist. Vide Annexed Report." Serologist-এর report-এ ছিল যে সেই ছোট ছোট বাদামী রঙের

দাগগুলি হচ্ছে Human blood বা নর-রক্তের দাগ। অতএব প্রমাণের দিক থেকে এই মামলায় কোন ত্রুটি বা সন্দেহের অবসর ছিল না। সাধারণতঃ দেখা গেছে যে নারী-ধর্ষণ বা পাশবিক অত্যাচারের মামলায় জুরী-বিচারে আসামীর খালাস পাওয়া বড় কঠিন।

মামলার শেষের দিকে জজ সাহেব যখন এই মামলার সাক্ষীসাবুদ ইত্যাদি জুরীদের বুঝিয়ে দিলেন তখন Chemical Examiner-এর report প্রসঙ্গে তিনি জুরীদের দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে আসামীর প্যান্ট সম্বন্ধে লেখা আছে—"Blood not found"—কিন্তু তার পরের তারকা-চিহ্নটি বা তার কৈফিয়ৎটি সম্বন্ধে তিনি তাঁর 'Charge to the Jury'-তে কোন উল্লেখ করলেন না। তাঁর 'charge' দেওয়া শেষ হতেই জুরীরা তাঁদের নিজেদের ঘরে 'retire' করলেন। সরকার পক্ষ থেকে আমরা তখন ঐ তারকা-চিহ্নটি ও তার কৈফিয়ৎ এবং Imperial Serologist-এর Report-এর প্রতি জজসাহেবের মনযোগ আকর্ষণ করলাম। এ ব্যাপারটি জজ সাহেব গোড়া থেকেই জানতেন; হঠাৎ কোন কারণে জুরীদের মামলা বোঝাবার সময় এটি তাঁর নজর এড়িয়ে যায়। তিনি তৎক্ষণাৎ আমাদের সঙ্গে একমত হয়ে বললেন যে এটি অত্যন্ত দরকারী বিষয়, এর উল্লেখ বাদ যাওয়া অনুচিত এবং জুরীদের এটি বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। জুরীদের আবার জজ সাহেবের কথামত ডেকে আনা হল এবং দুখানি report-ই তাঁদের হাতে দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া হল যে যে কথাগুলি আপাত-দৃষ্টিতে পরস্পরবিরুদ্ধ বলে মনে হচ্ছে, একটু চিন্তা করলেই দেখা যাবে যে ঐ দুখানি Report-এর মধ্যে অসঙ্গতি বা বিপরীত ভাব কিছুই নেই। আসল কথা হচ্ছে যে আসামীর প্যান্টে দাগগুলি খুব ছোট ছিল বলে Chemical Examiner নিজে আর সেগুলিকে পরীক্ষা করেননি, সুক্ষ্মতর বিচারের জন্যে তা Imperial Serologist-এর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এই ব্যাপারটি জজ সাহেব বেশ বিশদ ও পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়ে দিয়ে জুরীদের নির্দেশ দিলেন তাঁদের নিজেদের রায় নির্ধারণ করতে।

জুরীরা ফের তাঁদের নিজেদের ঘরে গেলেন বটে, কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে এলেন—বোধ হয় দু'মিনিটের বেশী তাঁরা ঘরে থাকেন নি। তাঁরা ফিরে এসেই জজ সাহেবকে জানালেন যে তাঁরা ন'জন একমত

হয়ে সিদ্ধান্ত করেছেন যে আসামী 'নির্দোষ'। জুরীদের 'unanimous verdict' 'accept' করে জজ সাহেব আসামীকে খালাস দিলেন।

এইবার আসল গল্পটি শুনুন। জুরীদের অগ্রণী অর্থাৎ Foreman আমার প্রতিবেশী ছিলেন। তিনি পাড়ায় একটু মুরুব্বি গোছের লোক ছিলেন, এবং আমরা অনেকেই তাঁকে "দাদা" বলে ডাকতাম। যেদিন ঐ মামলার রায় হ'ল সেইদিনই রাত্রে পাড়াতে একটি বিয়ে ছিল। আমি নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে দেখি যে পাড়ার অনেকেই জমায়েৎ হয়েছেন। ভিড়ের ভেতর থেকে পরিচিত গলার আওয়াজ পেলুম—"এই যে ভায়া!" তাকিয়ে দেখি আমাদের সেই জুরীর Foreman-দাদাটি। আমি তাঁর দিকে এগিয়ে যেতেই বলে উঠলেন—"কেমন, শিক্ষা হয়েছে ত?" আমি সত্যিই অবাক হয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম,—"কিসের শিক্ষা?" তিনি বললেন,—"শিক্ষা নয়? তুমি একেবারে পুলিশ বনে গেছ দেখছি। লজ্জা করে না?" তখনও ব্যাপারটা সঠিক বুঝতে না পেরে বললাম—"জানেনই ত' দাদা যে আমি চিরকালই একটু নির্লজ্জ ও বেহায়া। কিন্তু উপস্থিত অপরাধটা কি করলাম?" তিনি বললেন—"দেখ ত' ইংরেজ I. C. S. জজ কি রকম fair। আমরা নিজেদের ঘরে 'retire' করেছিলাম, তিনি সেখান থেকে আমাদের ডেকে আনিয়ে একই বিষয়ে দুখানা report-এর মধ্যে কি রকম discrepancy (বৈপরীত্য) থাকতে পারে তা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিযে দিলেন। দুজনেই Government servant; কিন্তু এক ব্যাটা লিখলে—'Blood not found', আর এক শালা কিনা বলে বসল—'Human Blood'! এ সবই ঐ পুলিশের কীর্তি। জজসাহেব ত' একরকম তোমাদের মুখের ওপরেই আমাদের বলে দিলেন যে মামলাটি মিথ্যে।" —এই বলে 'দাদা' কুঁথিয়ে কুঁথিয়ে আত্মপ্রসাদের হাসি হাসতে লাগলেন।

এবার আমি সত্যিই অবাক হলুম। এতগুলি শিক্ষিত ও উচ্চপদস্থ ভদ্রলোক যে কি করে একসঙ্গে ও একমত হয়ে এজাতীয় বুদ্ধিহীনতার পরিচয় দিতে পারে, সেটা আমার মত স্থূলবুদ্ধি লোকের ধারণার অতীত—বুদ্ধির অগম্য ত' বটেই। তবে এটাও ঠিক যে আমাদের এই পুণ্য ভারত ভূমি ত' খালি আমার মত মাথা-মোটা লোকের জন্যেই নয়। আমাদের এ দেশই ত' এককালে দেবতাদের লীলাভূমি ও ঋষিদের তপস্যার স্থান ছিল। তাঁরা ত আর আমার মত ক্ষুদ্র-দৃষ্টি ছিলেন না। তাঁরা কত যুগ আগে

ধ্যানে বসে বুঝতে পেরেছিলেন যে সুদূর ভবিষ্যতে এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বুদ্ধি ও চিন্তাধারা মাঝে মাঝে ভ্রান্তির পথেই চালিত হবে। সেই বুঝেই তাঁরা দেবতাদের মুখ দিয়ে তখনই গেয়েছিলেন—

"যা দেবী সর্বভূতেষু বুদ্ধি-রূপেন সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।

"যা দেবী সর্বভূতেষু ভ্রান্তি-রূপেন সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।"

আর একবার জুরী-বিচারের পরে জুরীদের অদ্ভুত রায় দেবার কারণ এবং সে সময়কার তাদের মনোভাব জানবার সুযোগ পেয়েছিলাম।

কলকাতার **Presidency Small Causes Court**-এ (যাকে চলতি কথায় "ছোট আদালত" বলে) **Mr. Remfry** নামে একজন **Chief Judge** ছিলেন। তাঁর কোর্টে একবার এক বাদী ২০০০৲ টাকা দাবী করে এক মামলা রুজু করেছিল। প্রতিবাদী একখানা ২০০০৲ টাকার রসিদ দাখিল করে প্রমাণ করবার চেষ্টা করে যে বাদী তার পাওনার সব টাকা বুঝে পেয়ে **stamp**-এর ওপর সই করে ঐ রসিদ তাকে দিয়েছে; অতএব তার দাবী মিথ্যে। উভয় পক্ষের সাক্ষীসাবুদ নিয়ে জজসাহেব সাব্যস্ত করেন যে ঐ রসিদখানি জাল ও টাকা শোধ দেওয়ার গল্পটি সম্পূর্ণ মিথ্যে এবং সেই কারণে তিনি প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে ২০০০৲ টাকার ডিক্রী দেন। তাছাড়া মিথ্যে-সাক্ষী দেওয়া ও জাল রসিদ দাখিল করার জন্যে তিনি প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে কলকাতার **Chief Presidency Magistrate**-এর কাছে লিখিত নালিশ পাঠালেন, কারণ আইনের বিধান এই যে এ রকম অপরাধে অপরাধীকে অভিযুক্ত করতে হলে যে হাকিমের কাছে এই সব অপরাধ হয়েছে তাঁকে **'written complaint before a Magistrate'** করতে হবে। **Remfry** সাহেবের **'written complaint'**-এ মামলা রুজু হল। এ সব মামলায় আসামীকে দায়রা-সোপর্দ করতে হয়। তাই মামলাটি কলকাতা **High ourt Sessions**-এ আসে।

ছোট আদালতের মামলার নিয়ম যে সাক্ষীর জবানবন্দীর সারমর্ম খুব সংক্ষেপে রেকর্ডে লিখে রাখা হয়। বিস্তারিত জবানবন্দী লিখে রাখার বিধান আইনে নেই। এটা হল অবশ্য কলকাতার ছোট আদালতে প্রযোজ্য বিশেষ ব্যবস্থা। জজেদের নিজ নিজ **private notes** থাকে ; তাতে তাঁদের প্রয়োজনমত অনেক কিছুই লেখা থাকে।

হাইকোর্টে বিচারের সময় আসামী অনেক নতুন নতুন কথা বললে যার সম্বন্ধে ছোট আদালতের **Suit**-এর রেকর্ডে কোন ইঙ্গিতই ছিল না। তখন জজ সাহেব নির্দেশ দিলেন যে **Remfry** সাহেব যেন তাঁর **private notes** নিয়ে এসে সে মামলায় কি কি হয়েছিল তা প্রমাণ করেন। **Remfry** সাহেব সেই মত হাইকোর্টে হাজির হয়ে নিজের **private notes** দেখে যা যা ঘটেছিল তাঁর কোর্টে সে বিষয়ে সাক্ষ্য দিলেন। আমরা মনে করলাম যে মামলাটি এতে বেশ ভালভাবেই প্রমাণ হয়ে গেল।

জজ সাহেব জুরীদের মামলাটি বুঝিয়ে দেবার পর জুরীরা নিজেদের ঘরে চলে গেলেন। মামলাটি হাইকোর্টে ৫।৬ দিন চলেছিল, কিন্তু জুরী-মহোদয়গণের দেখলাম সিদ্ধান্তে উপনীত হতে ৫ মিনিটও লাগল না। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা বেরিয়ে এসে ন'জনই একমত হয়ে রায় দিলেন—"আসামী নির্দোষ।"

কিছুদিন বাদে ঐ জুরীদের মধ্যে একজনের সঙ্গে আমার দেখা হয়। তাঁর সঙ্গে আমার মোটামুটি রকমের পরিচয় ছিল। সঙ্কোচের বালাই কাটিয়ে ঐ রকম মামলায় ঐ জাতীয় অদ্ভুত রায় দেবার কারণ জিজ্ঞাসা করে বসলাম। ঐ মামলা হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ৭।৮ বছর আগে। তখন প্রকাশ্যভাবে স্বজাতি-প্রীতি কিংবা ইংরেজ-বিদ্বেষ প্রচার এ দেশের অনেকের কাছেই ভয়ের কারণ ছিল। দেখলাম, এই ন'জন জুরী যেটা বাইরে বলতে ভয় পেতেন ঘরে দরজা বন্ধ করে নিজেদের মধ্যে শুধু তা প্রকাশই করেন নি, একেবারে সে মনোভাবের চরম অবস্থার পরিচয় দিয়েছেন এবং প্রাণখুলে নিজেদের গায়ের ঝাল মিটিয়ে নিয়েছেন। তাঁর ভাষার স্রোতে আমি ত প্রায় ভেসেই গেলাম ; সুতরাং কথোপকথনটি প্রায় একতরফাই রয়ে গেল। তিনি বেশ একটু রেগে গিয়ে অনর্গল বলে যেতে লাগলেন :—

"আরে মশাই, রসিদখানা ত' জাল বটেই। আদালতে মামলা করতে গেলে কে আবার কবে সত্যি কথা বলে? বিশেষতঃ লোকটার নামে যখন

দু'হাজার টাকার দাবী করে নালিশ হয়েছে, তখন সত্যি কথাটা বললে তক্ষুনি ত' কর্‌করে টাকা বের করে দিতে হয়। জজ সাহেব কি টাকা দেওয়ার জন্যে চার ছ' মাস সময় দিতেন ?···ইংরেজ জাতটাই native-hater। তুইই ত' বাপু দু'-হাজার টাকার ডিক্রী দিয়েছিস।······তাতেও সন্তুষ্ট নয়। আবার ওপরপড়া হয়ে নিজে থেকে Magistrate-এর কাছে written complaint করে বসল। কি ভয়ানক vindictive এই···ইংরেজ জাত।... শুধু নালিশ করেই সন্তুষ্ট নয়।···আবার বুক চিতিয়ে সাক্ষী দিতে এলেন। তুই···ত open court-এ বসে বিচার করিস, তোর আবার private notes-এর বই কি রে···? আমরা ন'জনই merchant office-এ কাজ করি, —ইংরেজ জাতটাকে হাড়ে হাড়ে চিনি। টাকা নিয়ে 'টাকা নিই নি' কিংবা 'ফেরৎ দিয়েছি' এ কথা ত' সবাই বলে থাকে। তার জন্যে আবার ভদ্রলোকের ছেলেকে জেলে পাঠানর চেষ্টা কেনরে বাপু? বাঙ্গালী না হয়ে এক···ইংরেজ যদি একাজটি করত, তুই···কি এরকম ভাবে তার নামে নালিশ করতিস, না এমনি ভাবে এগিয়ে এসে সাক্ষী দিতিস ? তখন···-র private notes-এর বই কোথায় যে গায়েব হয়ে যেত তার ঠিক নেই! আর যদি ইংরেজ জুরী বসত, সে ..-রাই কি ইংরেজ আসামীকে "Guilty" বলত ?"

উপরের ফাঁকগুলি ভদ্রলোকের "শালা" ও "ব্যাটা"-য় ভর্তি ছিল। জানিনা এটা তাঁর মুদ্রা-দোষ, না আর কিছু! আমি ওগুলো বাদ দিলাম এইজন্যে যে যাঁরা Remfry সাহেবকে চিনতেন, তাঁরা তাঁকে নিরপেক্ষ ও বিচক্ষণ বিচারক বলেই জানতেন, যার জন্যে তিনি পরে High Court-এর Judge হয়েছিলেন।

আমি ভদ্রলোকের ইংরেজ-বিদ্বেষ ও বাঙ্গালী-প্রীতির আতিশয্যে একেবারে অভিভূত হয়ে চুপ করে গেলাম! এখনও আমার এক এক সময় সন্দেহ হয়, এই নব-রত্নের ভয়েই ইংরেজ চুপি চুপি এ দেশ ছেড়ে পালায় নি ত' ?

জুরীর সাহায্যে বিচারের প্রথা তুলে দেবার জন্যে আজ অনেকেই বদ্ধ-পরিকর হয়েছেন। ও প্রথা ভাল কি মন্দ সে বিচার করতে বা সে বিষয়ে

কোন মতামত প্রকাশ করতে আমি বসি নি। আমি শুধু আমার জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে কয়েকটি জুরীর Type বর্ণনা করে আপনাদের জানাতে চেয়েছি যে 'এ রকমও হয়', 'এও সম্ভব'—এই পর্যন্ত মাত্র। সাধারণ জুরীদের বাদ দিলে যে সব অল্পবিস্তর অসাধারণ জুরী দেখেছি তাদের এই ভাবে ভাগ করতে পারি :

(১) একদল জুরী দেখেছি যাঁরা পুলিশ যা বলবে বা সরকারী তরফ থেকে যা বলা হবে সেটাকেই ধ্রুব সত্য বলে মেনে নেবেন, তাঁদের কাছে আসামীর পক্ষ-সমর্থনের কোনও সার্থকতা নেই। তাঁদের ধারণা, যেহেতু পুলিশ মামলা এনেছে, সেটা সত্যি হতে বাধ্য এবং তার জবাবে যা কিছু বলা হবে সে সবই নিশ্চিত মিথ্যে এবং সাজান কথা।

(২) তেমনি আবার তার উল্টোটাও দেখেছি। এই শ্রেণীর জুরীদের বিশ্বাস যে পুলিশ বা সরকার পক্ষের সাক্ষী কখনও সত্যি কথা বলতে পারে না, এবং পুলিশ যখন মামলা এনেছে, তখন তা মিথ্যে হতে বাধ্য।

(৩) আর এক শ্রেণীর জুরী দেখেছি যাঁদের বদ্ধমূল ধারণা যে আদালতে কেউ কখনও সত্যি কথা বলে না বা বলতে পারে না এবং সেই কারণেই সাক্ষীরা যা বলবে সেটাই তাঁদের কাছে মিথ্যে ও শেখান কথা হবে। তবে একদিক দিয়ে তাঁরা পক্ষপাতিত্ব-শূণ্য ; সরকার পক্ষের সাক্ষীদের কথাও তাঁদের কাছে যেমন মিথ্যে, সরকার পক্ষের সাক্ষী শেষ হলে আসামী পক্ষ যদি সাক্ষী ডাকে তখন শেষের দলের কথাও এই জুরীদের কাছে মিথ্যে হয়ে যাবে।

(৪) আবার একদল জুরী দেখেছি যাঁরা নিজেদিকে এক একজন Sherlock Holmes বলে মনে করে থাকেন। সরকার পক্ষ ও আসামী পক্ষ যে সব কথা জানেন না বা কল্পনাও করেন নি, এই Sherlock Holmes-এর দল সেগুলো খুঁজে বার করেন বা করবার চেষ্টা করেন।

কলকাতা সহরে Special Jury-র সাহায্যে বিচার সাধারণতঃ সন্তোষজনকই হয়ে থাকে। এই শ্রেণীর জুরীরা সব ব্যাপারেই common sense view নিতে চেষ্টা করেন। অনেক বড় বড় মামলা আমি দেখেছি যেখানে কলকাতা সহরের শীর্ষস্থানীয় লোক আসামী হয়ে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছিলেন ; সে সব ক্ষেত্রেও এই Special Jury-র প্রশ্নাবলী, বিচার ও রায় দেখে আমি অনেক সময় মুগ্ধ হয়ে গিয়েছি। এরকম একটি মামলা হল Bengal National

Bank-এর মামলা—যাতে ঐ Bank-এর Managing Director এবং Auditor (তখনকার একজন খ্যাতনামা ইংরেজ Chartered Accountant) দুজনেই আসামী ছিলেন। Triton Insurance Company-র নৌকা ডুবানর মামলা, হেমন্ত চক্রবর্তীর Insurance Fraud case—যে মামলাগুলির কথা আগেই বলেছি—এই সব মামলা Special Jury-র সাহায্যে বিচার হয়েছিল।

ভেবে দেখতে গেলে এই জুরীর সাহায্যে বিচারের প্রথায় জুরীদের যে কত অসুবিধে হয় তা বলে শেষ করা কঠিন। যাঁরা আফিসে চাকরী করে দিনগত পাপক্ষয় করেন, তাঁদের না হয় জুরীতে বসা পোষায়। কিন্তু ব্যবসায়ী লোকদের জুরীতে বসতে গেলে হাজার রকম অসুবিধে ও ক্ষতির মধ্যে পড়তে হয়। বেচারাদের নাম ডাকার জন্যে দিনের পর দিন হাজির হতে হয়। গিয়ে হয়ত দেখলেন যে সেদিন তাঁর ডাকই হল না। এ রকম ৫।৭ বার ফিরে আসবার পর যে দিন তাঁর নাম ডাকা হল, সেদিন যদি তিনি বরাতক্রমে একটি বড় মামলায় empanelled হয়ে গেলেন ত ব্যস।—কাজকর্ম ফর্সা। একাদিক্রমে দিনের পর দিন তাঁকে during business hours অর্থাৎ বেলা ১০টা থেকে ৪৷৷০টা পর্যন্ত কোর্টে হাজির থাকতেই হবে। তার আগে পরে নিজের কারবার সংক্রান্ত কতটা কাজকর্ম তাঁর পক্ষে করা সম্ভব, সেটা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। Bank-এর সংগে ত কোন কাজ-কারবার হতেই পাবে না। কার্যসূত্রে অন্যান্য আফিসের সংগে সংযোগ রাখাও অসম্ভব। তারপর আবার যথাসময়ে হাজির হতে না পারলে এবং গরহাজিরের জন্যে উপযুক্ত কৈফিয়ৎ দিতে না পারলে জরিমানার ভয় আছে। এই সব নানা কারণে অনেক সময়ে জুরীর কাজ থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্যে দরখাস্ত পড়ে। এরকম একটু অসাধারণ রকমের দুখানি দরখাস্তের কথা নীচে বলছি।

(১) Special Jury-তে কলকাতার একজন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর পাণ্ডিত্য, চরিত্র-বল প্রভৃতির খ্যাতি দেশ-বিদেশে রাষ্ট্র ছিল। তিনি একবার দরখাস্ত করে বসলেন এই বলে যে তিনি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের লোক, তাঁর ধর্মমত অনুসারে অপরাধীর শাস্তি দেওয়ার মালিক একমাত্র ভগবান, তাঁর ধর্ম—জীবে দয়া ও ক্ষমা, এবং সেজন্যে তিনি কোনও আসামীকে দোষী বলতে পারেন না; অতএব জুরীর লিস্ট থেকে

যেন তাঁর নাম কেটে দেওয়া হয়। জজ সাহেব এ দরখাস্ত পড়ে বললেন যে প্রকাশ্য আদালতে এ রকম কথা বলা contempt of court বা আদালত অবমাননার সামিল; অতএব এ দরখাস্ত না-মঞ্জুর হল। আমরা—অর্থাৎ সরকার-পক্ষ—কিন্তু এ ভদ্রলোকটিকে চিনে রাখলাম। তারপর যতবার ভদ্রলোকের নাম ডাকা হয়েছে, সরকার পক্ষ থেকে তাঁকে challenge করা হয়েছে। Challenge করা মানে সে যাত্রা ভদ্রলোক আর জুরীতে বসতে পাবেন না। এই ভাবে তাঁকে আর কখনও জুরীতে বসবার সুযোগ দেওয়া হয় নি।

(২) আর একবার Clive Street-এর এক বড় সাহেব খুব বড় এক ইংরেজ Ear, Nose & Throat Specialist-এর certificate দাখিল করে দরখাস্ত করলেন এই বলে যে তিনি একেবারে কানে শোনেন না, অতএব কে কি বলছে বুঝতে পারেন না; এ অবস্থায় তাঁর পক্ষে conscientiously জুরীর কাজ করা অসম্ভব, অতএব জুরীর List থেকে তাঁর নাম যেন কেটে দেওয়া হয়। তাঁর দরখাস্ত যখন পেশ হল, তখন তাঁকে ডেকে জজ সাহেব গোটাকতক প্রশ্ন করলেন এই ভাবে—

১। আপনি এই দরখাস্ত করেছেন?

বড় সাহেব কানের পেছনটা হাত দিয়ে চেপে কানটাকে সামনের দিয়ে এগিয়ে এনে, যেন—কি বলা হয়েছে বুঝবার চেষ্টা করছেন, এই রকম একটা ভাব দেখিয়ে জিজ্ঞাসুভাবে ঘাড় নেড়ে এমন একটা ভঙ্গি করলেন যার একমাত্র অর্থ এই দাঁড়ায়—'আপনি কি বলছেন আমি ঠিক শুনতে পাচ্ছি না—দয়া করে আর একবার বলবেন কি?' তারপর জজ সাহেব আরও ৭।৮টা সাধারণ প্রশ্ন করলেন, ভদ্রলোক সত্যিই কালা কিনা পরীক্ষা করবার জন্যে। প্রশ্নগুলি এই রকম ছিল:—

(২) আপনার আফিসের ঠিকানা কি?

(৩) আপনি আজ কটার সময় কোর্টে এসেছেন?…ইত্যাদি ইত্যাদি। জজ সাহেবের প্রতিটি প্রশ্নের পরেই কিন্তু ভদ্রলোক কোন জবাব না দিয়ে ঐ একই ধরণের জিজ্ঞাসা-সূচক ভঙ্গি করে জানালেন যে তিনি কিছুই বুঝতে পারছেন না। মিনিট দশেক ধরে এরকম পরীক্ষার পরে জজ সাহেব যেন কতকটা হতাশ ভাবেই আগে যে ভাবে ও স্বরে কথা বলছিলেন সেই ভাবেই বললেন—I see you are really deaf—অর্থাৎ আমি বুঝতে পাচ্ছি যে

আপনি বাস্তবিকই বধির। জজ সাহেব একথা বলামাত্রই ভদ্রলোকের মুখ খানা খুব উৎফুল্ল হয়ে উঠল এবং তিনি চেঁচিয়ে ঘাড় নেড়ে বলে উঠলেন—**That is so, my Lord**—অর্থাৎ হুজুর, একথা খাঁটি সত্য। সঙ্গে সঙ্গে কোর্টের মধ্যে হাসির রোল পড়ে গেল—জজ সাহেবও সেই হাসিতে যোগ দিয়ে ভদ্রলোককে বললেন—আপনার দরখাস্তটি মিথ্যা এবং তা না-মঞ্জুর হল।

সেই দিনই সেই বড় সাহেবের নাম ডাকা হয়েছিল এবং তার পর একাদিক্রমে ৭।৮ দিন তাঁকে মুখ হাঁড়ি করে জুরীতে বসতে হয়েছিল। সেটি একটি খুনের মামলা ছিল এবং জুরীরা একমত হয়ে আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করেছিল।

High Court-এ জুরীদের নাম ডাকার ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলি। **Government Office, Merchant Office,** কলেজ, স্কুল প্রভৃতি থেকে সেখানকার লোকজনের নাম, ধাম, শিক্ষা-দীক্ষা, রোজগার ইত্যাদির বিস্তারিত বিবরণ সংগ্রহ করা হয়। তারপর সেই নাম থেকে বেছেকুছে ২টী **List** করা হয়। উচ্চ-শিক্ষিত কিম্বা উচ্চ-পদস্থ লোকদের নাম লিখে **Special Jury List** প্রস্তুত হয়, আর বাকী লোকের নাম **Common Jury List**-এ থাকে। প্রত্যেক লোকের নামে একটি আলাদা নম্বর দেওয়া হয়, এবং সেই নামের একটি করে **Card** লেখা হয়। প্রত্যেক নম্বরের জন্যে আবার একটি করে হাড়ের বা **Ivory**-র **Counter** অথবা **Disc** রাখা হয়। **Sessions**-এর কাজ আরম্ভ হবার কিছুদিন আগে প্রত্যেক **Sessions**-এর জন্যে একটি করে ছোট **List** করা হয়। সেই জুরীদের নম্বরের যে **Counter** বা **Disc** আছে, সেগুলিকে **Lottery**-র মতন করে **draw** করা হয় অর্থাৎ টানা হয়। যে নম্বরটি উঠল, **Jury-List** থেকে সেই নম্বরের জুরীর নাম লেখা হল। প্রত্যেক **Sessions**-এর জন্যে যে কজন জুরীর দরকার হবে ঐ **Counter** বা **Disc 'draw'** করে ততগুলির নম্বর তোলা হল। তারপর সেই সেই নম্বরের জুরীদের সমন পাঠান হয়। এবং তাদের নামের **Card**-গুলি আলাদা করে রাখা হয়। সেই সমন পেয়ে জুরীরা নির্ধারিত দিনে আদালতে হাজির হন। তখন ঐ আলাদা করে রাখা **Card**-গুলি নিয়ে দ্বিতীয়বার **draw** করা হয়। **Draw** করার নিয়ম—ঠিক যেমন একজোড়া তাস **Shuffle** করে বা ফাটায় সেই ভাবে **Clerk of the**

State ঐ card ক'খানা নিয়ে কয়েকবার নিজে হাতে চালাচালি করে নেন। যেমন যেমন এক একখানা card ওঠে, সংগে সংগে সেই card-এর নামটা তখন ডাকা হয়।

এই 'নাম ডাকা' নিয়ে England-এর একটি মজার গল্প পড়েছিলাম। এক কারবারী ভদ্রলোকের নাম Jury-list-এ ছিল। তিনি একবার কোন এক গুরুতর অপরাধের জন্যে আদালতে অভিযুক্ত হন। Sessions Court-এ তাঁর বিচার হবার কথা। জুরীদের নাম ডাকের আগে তাঁকে আসামীর কাঠগড়ায় বন্ধ করা হয়েছে। এ দেশের মত বিলেতেও Draw করে জুরীর নাম ডাকা হয়। সেই মামলার বিচারের জন্যে জুরী মনোনীত করার সময়কার প্রথম Draw-তে তাঁর নাম উঠেছিল এবং সেইমত যথা নিয়মে তাঁর নামে সমন গিয়েছিল। দ্বিতীয়বারের Draw-তেও তাঁর নাম উঠল—যার অর্থ হচ্ছে এই যে এবার তাঁকে Jury-Box-এ বসতে হবে। প্রকাশ্য আদালতে যখন ভদ্রলোকের নামটি ডাকা হল, অমনি তিনি আসামীর কাঠগড়ার রেলিং টপকে Jury Box-এ ঢুকলেন। সকলে ত অবাক। কিন্তু আসলে Court Officer-এর ভুলের জন্যে আসামীর নিজের নাম জুরী হিসেবে ডাকা হয়েছে, সে কথাও ত ঠিক। জজ সাহেব বললেন—Your name was called out by mistake. You can't try your own self. Why are you getting into that Box? অর্থাৎ তোমার নাম ভুলক্রমে ডাকা হয়েছে। তুমি ত নিজের বিচার নিজে করতে পার না। তবে জুরী-বক্সে তুমি ঢুকলে কেন? জবাবে আসামী বলেছিল···My lord, when my name was called out, I really thought it was a stroke of luck. অর্থাৎ —হুজুর, জুরীর নাম ডাকা হতে আমি ভেবেছিলাম যে আমার বরাতটা বুঝি ফিরে গেল।

॥ কয়েকটি অসংশ্লিষ্ট ঘটনা

১৯২৬ সালের নভেম্বর মাসে আমি **Orr Dignam** কোম্পানীর আফিস ছেড়ে কিছুকাল স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী মশায়ের সংগে কাজ করি। তাঁর নাম বাংলা দেশের সবাই জানেন,—তবে লোকে সাধারণত তাঁর **public life**-এর সংগেই পরিচিত। কিন্তু তিনি হাইকোর্টের একজন খ্যাতনামা **Attorney** ছিলেন এবং **Incorporated Law Society of Calcutta**-র **President** ছিলেন। তিনি অধিকাংশ সময় রাজনৈতিক ও অন্যান্য নানাবিধ ব্যাপারে জড়িয়ে থাকতেন বলে সবসময় তিনি কলকাতায় কেন, ভারতবর্ষেও থাকতেন না—বাইরে বাইরে ঘুরতেন। অথচ তাঁর আফিসটিও চালু ছিল এবং সেখানে মামলা-মোকদ্দমার কাজ হত। ১৯২৬ সালের নভেম্বর থেকে ১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত প্রায় দুবছর কাল আমি তাঁর সহকারী হযে তাঁর আফিসেব কাজকর্ম দেখাশুনা করতাম। সে সময় তাঁর আফিসে বসেই আমার নিজের কাজকর্মগুলিও করতাম। আমাদের দুজনের বসবার ঘরের মাঝখানে একটি কাঠের **partition** ছিল।

একদিন আমার ঘরের টেবিলে বসে আমি কাজ করছি, এমন সময এক ভদ্রলোক কতকগুলি কাগজপত্র নিয়ে এলেন। তাঁর কাগজপত্র দেখে আর কথাবার্তা শুনে বুঝলাম যে তাঁরা চার ভাই, বাপ কয়েকখানি বাড়ী ও কোম্পানীর কাগজ রেখে মারা গেছেন এবং সব-শুদ্ধ ঐ পৈত্রিক সম্পত্তির দাম হবে তখনকার দিনে প্রায় ৪ লাখ টাকা। একখানি ছোট বাড়ী ছাড়া সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তিই তাঁরা আপোষে ভাগ করে নিতে প্রস্তুত। যত গোল সব হল ঐ ছোট বাড়ীটি নিয়ে—ঐ খানার ওপরেই চার ভাইয়ের সকলেরই রোখ চেপে গেছে, কেউ সেখানকার দখল ছাড়বেন না। হাজার অসুবিধে সত্ত্বেও চার ভাইই সেই বাড়ীতে থাকেন এবং দিন-রাত খুঁটিনাটি-

ব্যাপার নিয়ে পরস্পরকে গালাগালমন্দ করেন ও ঝগড়া করেন। ভদ্রলোকের সংগে কথাবার্তা বলে বা তাঁর কাগজপত্র দেখে এরকম মনোবৃত্তির কোন কৈফিয়ৎই খুঁজে পেলাম না। বাড়ীখানার দাম ২৫।২৬ হাজার টাকার বেশী হবে না। আমি ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলাম—এই বাড়ীর ভিতে কি আপনারা কেউ গুপ্তধন আছে বলে মনে করেন? ভদ্রলোক "না" বলতে আমি তাঁকে বোঝালাম যে partition-এর মামলা দায়ের করলে প্রথমে একজন Commissioner নিযুক্ত হবেন, তারপরে Engineer সব মাপজোপ করে valuation অর্থাৎ মূল্য-নির্ধারণ করবেন। এবং বাঁটোয়ারার খসড়া প্রস্তুত করবেন—এ সবে অনেক টাকা বেরিয়ে যাবে। তাছাড়া পরস্পরের মধ্যে যে রকম ঝগড়া দেখা যাচ্ছে তাতে মনে হয় প্রত্যেক পক্ষই অপর তিনজনকে অপদস্থ করবার জন্যে বড় বড় কৌঁসুলী নিযুক্ত করবেন এবং তাতে করে এক এক দিনেই এক এক ভাইয়ের মামলার খরচ সাত আটশ টাকার বেশী পড়ে যাবে। আমি ভদ্রলোককে হিসেব করে দেখিয়ে দিলাম যে প্রথম কোর্টেই প্রত্যেক পক্ষের ৩।৩॥০ হাজার টাকা করে—অর্থাৎ চার ভাইয়ের মিলে মোট ১৩।১৪ হাজার টাকা খরচ হবে। তারপরে **Appeal,** তারও পরে **Privy Council**—এ সব ত আছেই; তাতেও আরও ১০।১২ হাজার টাকা। শেষে ৪ ভাইয়ের এক ভাই যেদিন বাড়ীখানা পাবেন, সেদিন হিসেব করলে দেখতে পাবেন যে বাড়ীখানার দাম কিম্বা তার চেয়েও বেশী টাকা মোকদ্দমা খরচ বাবদ ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। তার চেয়ে ভাইদের মধ্যে ৩ জন যদি ঐ ছোট বাড়ীখানার ওপর নিজের নিজের দাবী ছেড়ে দেন, তাহলে লোকসান ত হবেই না উপরন্তু লাভটা হবে এই :

১। একটি পয়সাও মামলা খরচ হবে না—তার মানে ২৬ হাজার টাকা বেঁচে যাবে।

২। যাঁরা ঐ বাড়ী পাবেন না, সেই তিন ভাই প্রত্যেকে ৬।৬॥০ হাজার করে নগদ টাকা পাবেন।

৩। যাঁরা বাড়ীখানা ছেড়ে দেবেন, সে তিন ভাইয়ের এটাই যথেষ্ট পরিতৃপ্তির কারণ হবে যে তাঁদেরই মায়ের পেটের এক ভাই বাড়ীখানার মালিক হয়ে ভোগ-দখল করছেন।

৪। ঝগড়া-ঝাঁটি মিটে গেলে সকলেই মনে মনে শান্তি-লাভ করবেন।

মনে হল ভদ্রলোক যেন আমার কথায় রাজী হয়ে গেলেন। আমি অবিশ্যি তাসত্ত্বেও বললাম—ভেবে দেখুন। আর যদি না মেটে, আমরা ত আছিই। যখনই হুকুম করবেন মামলা ঠুকে দেব,—এ আর বেশী কথা কি?

ভদ্রলোক বেরিয়ে যাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সর্বাধিকারী মশাই তাঁর পাশের কামরায় Easy Chair-এ শুয়ে শুয়ে আমাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন—বলি, ও বিনোদ, এ spiritual lecture-টি কাকে দিলে? আমি তাঁর ঘরে গিয়ে দেখলাম যে তিনি হাসছেন। বললেন—তোমরা ছেলেমানুষ। এইটে এখনও বুঝলে না যে যতক্ষণ মিট-মাটের সম্ভাবনা থাকে, ততক্ষণ কি কেউ ঘরের কেলেঙ্কারী বাইরের লোকের কাছে প্রকাশ করে? যে একেবারে কাগজপত্র নিয়ে তৈরী হয়ে এসেছে মামলা রুজু করবে বলে—সে কি আর খরচের ভয়ে পেছপাও হবে,—না দুটো আধ্যাত্মিক কথা শুনে বিবাগী হয়ে সংসার ছেড়ে চলে যাবে? আমি বললাম—না স্যার, আমার মনে হয় লোকটি তার ভুল বুঝতে পেরেছে এবং বাড়ী ফিরে গিয়ে তার ভাইদের সঙ্গে ব্যাপারটি মিটিয়ে ফেলবে। এবার তিনি জোরে হেসে উঠে বললেন—তুমি ঠিক দেখবে যে সাত দিনের মধ্যেই সে অন্য Attorney-কে দিয়ে মামলা রুজু করে দিয়েছে—মাঝ থেকে তুমি একটি বড় মামলা ছেড়ে দিলে।

সাত দিনও গেল না! তিন দিন বাদে চার দিনের দিনই দেখলাম যে আমার আফিসের প্রায় সংলগ্ন অপর এক Attorney আফিস থেকে সেই ভদ্রলোক মামলা রুজু করে দিয়েছে!

ভাইয়ে ভাইয়ে অনেক মামলাই দেখেছি এবং তাতে করে কতকগুলি বর্ধিষ্ণু পরিবারকে একেবারে নষ্ট হয়ে যেতেও দেখেছি। একবার এরকম একটি মামলা যখন হাইকোর্টে চলছিল, তখন আমি সে কোর্টে উপস্থিত ছিলাম। জজ সাহেব ইংরেজ হলেও দু'পক্ষের কৌঁসুলীদের বললেন—"এ মামলায় ত' দেখছি এ কোর্টের বড় বড় কৌঁসুলী প্রায় সবাই রয়েছেন। আপনারা সকলে মিলে এ মামলাটি মিটিয়ে দিয়ে এতবড় একটা বনেদী

ঘরকে নষ্ট হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করতে পারেন না?" তখন কৌঁসুলীদের মধ্যে একজন হাসতে হাসতে জবাব দিলেন—"হুজুর, মিটমাটের চেষ্টা বহুদিন বহুরকমেই হয়েছে। কিন্তু এ মামলা ত' আর মেটবার জন্যে আদালতে আসে নি।" তার কারণ হিসেবে তিনি নিজের ভাষায় বলেছিলেন—"Your Lordship will be pleased to remember that when brothers come to Law, they mutually become brothers-in-law."

আর একবার Court থেকে মামলা মেটাবার চেষ্টা দেখেছিলাম।

মেছোবাজার অঞ্চলে একটা গলির মধ্যে এক ভদ্রলোকের কয়েকখানা পৈত্রিক বাড়ী ছিল। গলিটি বড় রাস্তা থেকে খানিকটা উত্তরমুখো গিয়ে একটি সমকোণ হয়ে পশ্চিমে ঘুরে গেছে। মনে করুন ভদ্রলোকের নাম "বাঁড়ুয্যে মশাই"। গলির পূব দিকে প্রথম তিনখানি বাড়ী তাঁর। তারপর আবার পশ্চিমে বেঁকে গলির উত্তর দিকের দুখানা বাড়ী তাঁর। সমকোণের ঠিক কোণের বাড়ীখানি অন্যলোকের ছিল। এই বাড়ীখানি হাইকোর্টের নীলামে ওঠে। সেসময় বাড়ীখানি কেনবার জন্যে 'বাঁড়ুয্যে' মশাই নীলাম ডাকতে গিয়েছিলেন; কিন্তু অন্য পাড়ার এক 'মুখুজ্যে' মশাই নীলাম ডেকে নিলেন—বাঁড়ুয্যে মশাই পারেন নি অতদূর ডাকতে?

তারপর মুখুজ্যে মশাই যখন বাড়ীখানি মেরামত করবার জন্যে মিস্ত্রি লাগালেন তখনই গোলমাল আরম্ভ হল; বাঁড়ুজ্যে মশাই নানারকম বাধা বিঘ্নের সৃষ্টি করতে লাগলেন। গালাগালমন্দ ত দিনরাত লেগেই ছিল। বাঁড়ুজ্যে মশাইয়ের বয়স ছিল পঞ্চাশের ওপর; আর মুখুজ্যে মশাইয়ের দুটি ভাগ্নে ছিল—তাদের বয়স ২০ বছরের বেশী ছিল না। তাদের একজনের নাম ছিল 'কেষ্ট'। একদিন মুখুজ্যে মশাইয়ের অর্ডার মত একটি নতুন গঙ্গাজলের Cistern দোকান থেকে মুটের মাথায় এসেছিল—কিন্তু পরে সেটির আর কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। শেষে কেষ্ট বাঁড়ুজ্যে মশাইয়ের বৈঠকখানার মধ্যে ঢুকে গিয়ে Cistern-টি টেনে বার করে নিয়ে আসে। তাইতে বাঁড়ুজ্যে মশাই কেষ্টকে মেরেছিলেন—কিন্তু ফলে কেষ্টর হাতে এমন মার খেয়েছিলেন যে ডাক্তার ডাকতে হয়েছিল।

এ ঘটনা হয়েছিল ১৯৩৪ সালের আগে—যখন ব্যাঙ্কশাল কোর্ট ও জোড়াবাগান পুলিশ-কোর্ট আলাদা আলাদা ছিল। ঐ ঘটনার পর দুপক্ষই গিয়ে জোড়াবাগান পুলিশ-কোর্টে নালিশ করল। হাকিম বাঁড়ুজ্যে মশাইকে ধমকে বলেছিলেন,—"আপনি বুড়ো মানুষ, প্রথমে এদের Cistern চুরি ত করেইছেন, তারপর আবার আপনার ছেলের বয়েসীদের সংগে মারপিট করেছেন। আপনারই সাজা হওয়া উচিত।" বলাবাহুল্য, সে যাত্রা মামলা দু'টিই মিটে গিয়েছিল।

তারপর থেকে বাঁড়ুজ্যে মশাই লেগে রইলেন কি করে মুখুজ্যে মশাই ও তাঁর ভায়েদের জব্দ করবেন এই চেষ্টায়। সুযোগও জুটে গেল। দোলের দিন কেষ্ট তার সমবয়সীদের সংগে ঐ গলির মধ্যে হোলি খেলছিল। বাঁড়ুজ্যে মশাই এমনভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন যাতে কেষ্টর পিচ্কিরির রঙ্ তাঁর গায়ে লাগে। গায়ে ও কাপড়-চোপড়ে রঙ্ লাগতেই বাঁড়ুজ্যে মশাই চিৎকার করে পাড়া ফাটিয়ে ফেললেন। সংগে সংগে—মনে হয় আগের বন্দোবস্ত মত—বাঁড়ুজ্যে মশাইয়ের ঘরের ভেতর থেকে দু'জন লোক লাঠি নিয়ে কেষ্টকে মারতে তেড়ে এল। কেষ্টর দল তাদের হাতের লাঠি কেড়ে নিয়ে তাদেরই কজনকে উত্তম-মধ্যম প্রহার লাগিয়ে দিল। ফলে জোড়াবাগান কোর্টে নালিশ রুজু হল এবং মুখুজ্যে মশাই, কেষ্ট এবং তার ভাইয়ের নামে সমন হল। আসলে যারা মেরেছিল, তাদের কারও নামে নালিশ ছিল না। আমি তখন Orr Dignam কোম্পানীর অফিসে কাজ করি। মুখুজ্যে মশাইয়ের তরফে মামলার দিন জোড়াবাগান কোর্টে হাজির ছিলাম। মামলা ডাক হতেই বাঁড়ুজ্যে মশাইকে ফরিয়াদী ও কেষ্টকে আসামীদের মধ্যে দেখে হাকিম চিনতে পারলেন। তিনি বাঁড়ুজ্যে মশাইকে বললেন,—"আপনি আবার এই ছেলেদের সংগে মারপিট করেছেন?" বাঁড়ুজ্যে মশাই জোড হাতে জবাব দিলেন—"হুজুর, ধর্মাবতার, আমার কোনও দোষ নেই। দোলের দিন আমায় রঙ্ দিয়ে ভূত সাজিয়ে ত দিয়েছিলই, উপরন্তু ঐ কেষ্টা ব্যাটা আমাকে মেরে মেরে ওর নিজেরই এক জোড়া ঠন্ঠনের চটি ছিঁড়ে ফেলেছে।" হাকিম খুব রেগে উঠে বললেন,—"সে সব আমি শুনতে চাইনা। আপনি বুড়ো মানুষ, যদি মামলা না মেটান, আমি উভয় পক্ষের নামেই ১০৭ ধারা করব।" ১০৭ ধারা করা মানে শান্তিরক্ষার জন্যে জামীন-মুচলেকায় আবদ্ধ করা। ভয় পেয়ে গিয়ে বাঁড়ুজ্যে মশাই তখনই

কেষ্টকে বললেন—"কেষ্ট, মামলাটা মিটিয়ে নে, বাবা।" কেষ্ট সঙ্গে সঙ্গে আসামীর কাঠগড়া থেকেই অম্লানবদনে জবাব দিল—"নতুন চটির দাম দিয়ে দাও, এক্ষুনি মিটে যাবে।" বাঁড়ুজ্যে মশাইয়ের ইংরেজী-জ্ঞান দেখলাম একটু অদ্ভুত রকমের। কেষ্টর কথা শেষ হওয়া মাত্রই তিনি হাকিমের দিকে ফিরে জোড় হাতে বলে উঠলেন,—**Your Honour, the witness is refractory**। বোধহয় কোন কোর্টে কোন উকীলবাবুকে এরকম কথা বলতে শুনে থাকবেন। ভাল লেগেছিল বলে মনে করে রেখেছিলেন—মানে-বোঝবার চেষ্টাও করেন নি। সে যাই হোক, হাকিমের কিন্তু এর পর গাম্ভীর্য রাখা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠল। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর খাস-কামরায় উঠে গিয়ে উভয়পক্ষের উকিলবাবুদের ডেকে বলেদিলেন যে দশ মিনিটের মধ্যে মামলাটি যদি না মেটে, তা হলে তিনি নিজে থেকেই উভযপক্ষের নামে ১০৭ ধারার proceedings আরম্ভ করবেন। ফলে সেদিনই মামলাটি মিটে গেল। বাঁড়ুজ্যে মশাই আর কোন দিন পুলিশ-কোর্টে নালিশ করেন নি। হাইকোর্টে অন্য খেলা খেলেছিলেন।

কার্যসূত্রে কলকাতা সহরের এবং মফঃস্বলের অনেক আদালতেই ঘুরেছি এবং তখনকার প্রায় সকল বড় বড় উকিল-কৌঁসুলীর সঙ্গে সহকারিতা করেছি। একটি মোকদ্দমায় আমার senior ছিলেন খুব নামকরা একজন উকিল। তাঁর অভিজ্ঞতা, আইনের জ্ঞান, স্মরণশক্তি ও সহজ-বুদ্ধির খ্যাতি অনেকদিন ধরেই শুনেছিলাম। কার্যক্ষেত্রে দেখলাম যে যদি অল্পকথায় তাঁকে কোন মামলার বিবরণ মোটামুটি বুঝিয়ে দেওয়া যায় তাহলে নথীপত্র না দেখেও তিনি আদালতে দাঁড়িয়ে এমনভাবে বক্তৃতা করতে পারেন যে কেউ বুঝতে পারবেন না যে তিনি একখানি কাগজও চোখে দেখেন নি। ঐ মোকদ্দমায় সাক্ষীর জবানবন্দী ইত্যাদি সব আমিই করেছিলাম। তিনি একখানি কাগজও দেখেন নি। মিনিট দশ বার আমার কাছ থেকে মামলার বিবরণটি শুনে তিনি বক্তৃতা সুরু করে দিলেন। মাঝে মাঝে প্রয়োজনমত কাগজপত্র তাঁর হাতে এগিয়ে দিচ্ছিলাম, তখন তিনি হাকিমকে সেইটুকু পড়ে শুনিয়ে দিচ্ছিলেন এবং তা শেষহবামাত্র আবার তাঁর নিজের মতে পুরোদমে বক্তৃতা সুরু করছিলেন। এই অবস্থায় আমি একবার

তাঁকে চুপি চুপি বলি,—Then we notified our intention to take charge of the goods. তিনি আমার কথাগুলির পুনরাবৃত্তি না করে একটু রঙ্ ফলিয়ে বলে উঠলেন—Then we gave written notice of our intention to take charge of the goods. তাঁকে আর বেশীদূর এগোতে না দিয়ে তাঁর জামা ধরে টেনে তাঁকে থামিয়ে দিয়ে তাঁর কাণে কাণে বললাম—Notice-টা written ছিল না, verbally দেওয়া হয়েছিল। তিনি তখনও written notice-এর ভাবে বিভোর। আমার কথাগুলো সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম না করে অনায়াসে বলে গেলেন—Written Notice was given verbally, Sir.

•

১৯৩১-৩২ সালে রাজদ্রোহ (sedition) প্রচারের অভিযোগে অসংখ্য মামলা হয়েছিল। সেই সব মামলায় অনেক সময়ে মফঃস্বল থেকে বড় বড় উকিল এসে আসামীদের পক্ষ-সমর্থন করতেন। একদিন একটি মামলায় তারকবাবু আর আমি সরকার পক্ষে হাজির হয়েছি—আসামী-পক্ষে আছেন মফঃস্বলের এক প্রবীণ উকিল। সেই মামলায় আইনের সূক্ষ্ম-বিচারের প্রয়োজন ছিল। তারকবাবু একটি একটি করে কতকগুলি নজীর দেখালেন। যেমনি একটি নজীর খুলে তার নাম ও বিবরণ বলা হচ্ছিল অমনি বেশ অবজ্ঞার ভাব দেখিয়ে আসামীর উকিলবাবু বলে উঠছিলেন,—Oh! I carry that law in my pocket. দু'তিনবার এরকমভাবে বলার পরে তারকবাবু বেশ একটু রেগে গিয়েই বললেন—I find, my friend carries more law in his pocket than in his head! তবে ওপক্ষ একটু নিরস্ত হল।

•

সাক্ষীদের জবানবন্দীতে অনেক সময় অনেক রকমের মজার কথা শুনতে পাওয়া যায়। Tutored witness (শেখান সাক্ষী) খুব বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ না হলে অনেক সময় ধরা পড়ে যায় যে, সে তার জবানবন্দী মুখস্ত করে এসেছে। যাঁরা প্রভাত মুখুজ্যের 'নবীন সন্ন্যাসী' পড়েছেন, তাঁদের মনে থাকবে যে চতুর-চূড়ামণি গদাই পাল মালীকে রমণ ঘোষের সম্বন্ধে মিথ্যে কথা বলতে শিখিয়েছিল এইভাবে যে রমণচন্দ্র ঘোষ, গলায় চাদর, বগলে ছাতি…ইত্যাদি। কিন্তু বলবার সময় এই শেখান সাক্ষী গুলিয়ে ফেলে

অম্লান বদনে বলে গিয়েছিল,—রামচন্দ্র ঘোষ, বগলে চাদর···ইত্যাদি। মুখস্থ করা জিনিষ পরে ওপরাতে গেলে ও জাতীয় সাক্ষীর কথাগুলো অনেক সময়েই ওলট্ পালট্ হয়ে যায়। সাক্ষী একটু বোকা হলে দেখা গেছে যে একই কথা বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করলে প্রায়ই সে উল্টো-পাল্টা জবাব দিয়ে ফেলে।

আদালতে সাক্ষী দেওয়া ছাড়াও অনেক সময় কোন কারণে ঘাবড়ে গেলে মুখস্থ করা কথাগুলো বলতে গিয়ে ওলট পালট হয়ে যায়। পাঠশালায় বা ইস্কুলে পড়া বলতে গিয়ে ছেলেদের অনেক সময় এরকম হতে দেখা গেছে। প্রথমবার স্টেজে নামতে গিয়েও অনেকের এরকম হতে শোনা গেছে। একবার পাড়াগাঁয়ে এক সখের দলের থিয়েটার হবে—কিন্তু গদাইকে কেউ কোন 'পার্ট' দিতে চায় না। শেষে অনেক কাকুতি-মিনতি করে এবং নগদ ১০৲ চাঁদা দিয়ে রাজগুরুর ৪।৫ লাইনের 'পার্ট' সে পেল। ঐ পাঁচ লাইন সে পাঁচ-পাঁচে পঁচিশ দিন ধরে মুখস্থ করল। অভিনয়ের দিন রাত্রে—দর্শকদের মতে জোর অভিনয় হচ্ছে—শত্রু দেশ আক্রমণ করেছে. রাণী রাজাকে বীর-বেশে সাজিয়ে দিয়ে হাসিমুখে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু রাজা চলে যাবার পর তিনি একেবারে ভেঙে পড়ে, ধুলায়—অর্থাৎ স্টেজে—শুয়ে পড়েছেন। এই সময় 'রাজগুরু'র 'প্রবেশ' করে বলবার কথা—"রাণী, রাণী, শুয়েছ ধুলায়? ধর বৎসে বিল্বদল শিবের প্রসাদ।" কিন্তু রাজগুরু'র প্রবেশ আর হয় না! গদাই একবার Stage-এর wings-এর পাশ দিয়ে পাঁচখানা গাঁয়ের লোককে একসঙ্গে Stage-এর দিকে হাঁ-করে তাকিয়ে থাকতে দেখে এমনই ঘাবড়ে গিয়েছিল যে wings-এর পাশে সেজেগুজে কমণ্ডলু-হাতে দাঁড়িয়ে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছিল—কিছুতেই Stage-এ 'appear' হতে পারছিল না। শেষে ম্যানেজার তাকে সেখানথেকে অত্যন্ত অসম্মানজনক-ভাবে Stage-এর মধ্যে ঠেলে দেওয়াতে সে ধরা ও কাঁপা গলায় বলে ফেলল—"রাণী, রাণী, ধুয়েছ শুলায়? ধর বৎসে শিবদল বিল্বের প্রসাদ।"—বলেই কমণ্ডলুটা রাণীর মাথায় আছড়ে ফেলে দিয়ে উল্টো দিক দিয়ে স্টেজ থেকে বেরিয়েই ভোঁ-দৌড়—একেবারে পুকুরের পাড়ে।

এরকম ঘাবড়ে যাওয়ার এক মজার গল্প আমরা ছেলেবেলায় শুনেছিলাম। ইংরেজ রাজত্বের সময় ইংলণ্ডের যুবরাজ অর্থাৎ **Prince of Wales** তিনবার ভারতবর্ষে আসেন। প্রথম আসেন—**Queen Victoria**-র রাজত্বের সময়কার যুবরাজ, যিনি পরে সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড হয়েছিলেন। সপ্তম এডওয়ার্ডের রাজত্বকালে সম্রাট পঞ্চম জর্জ তখনকার যুবরাজ হিসেবে এদেশে এসেছিলেন ; এবং পঞ্চম জর্জের রাজত্বকালে এখনকার **Duke of Windsor** তখনকার ইংলণ্ডের যুবরাজ হিসেবে ভারতবর্ষে এসেছিলেন।

সপ্তম এডওয়ার্ড যখন যুবরাজ হিসেবে এদেশে এসেছিলেন, তখন তিনি অনেক জায়গায় ঘুরেছিলেন এবং অনেক কিছুই দেখেছিলেন। এমন কি কলকাতার কোনও এক সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী ভদ্রলোক তাঁকে বাড়ীতে নেমন্তন্ন করেছিলেন। সেখানে তাঁকে পর্দানশীন মেয়েদের পক্ষ থেকে এক অভিনন্দন দেওয়া হয়েছিল। সেই ঘটনা কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর "বাজী মাৎ" কবিতায় স্মরণীয় করে রেখে গেছেন। আধুনিক পাঠক পাঠিকা মহলে হেমচন্দ্রের কবিতার কদর কম বলেই মনে হয়। আমি সাহিত্যিকও নই, সাহিত্য-সমালোচকও নই ; তাই আজকাল ওসব জিনিসের **"Appeal"** আছে কি নেই কিম্বা যদি না থাকে ত' কেন নেই—এ সব কথার জবাব আমি দিতে পারব না। শুধু লোভ সামলাতে না পেরে "বাজী মাৎ" কবিতাটি থেকে কয়েকটি লাইন নীচে তুলে দিলাম :—

"ধন্য হে মুখুজ্যে ভায়া বলিহারি যাই।
বড় সাপটা দরে মাৎ করিলে খেতাপ "সি, এস, আই"॥
হেদে ও সহরবাসী, আর কি হাসি হাসবে "রেড়ো" বলে
দেখনা চেয়ে বকুল তলায় দাঁড়িয়ে রাণীর ছেলে॥
চৌঘুড়িতে সঙ্গে ক'রে সাদা মো-সাহেব।
নাড়ীটেপা ফেয়ার সাহেব বারলেট নায়েব।
আর কেন লো ঘোমটা খোল কবির কথা রাখো।
"লাইট" পেয়ে "রাইট" হয়ে পার হওলো সাঁকো।
ভয় কি তাতে, লজ্জা কি তায়, কাল বদন-খানি।
দেখবে খালি চক্ষে চেয়ে যুবা নৃপমনি।
কব্জা তুলে দেখবে বাজু দেখবে কাণের দুল,
দেখবে কণ্ঠী, কণ্ঠহার পিঠের ঝাঁপাফুল॥

আয় এয়োগণ করবি বরণ পরে চরণ চাপ—
শিবের বিয়া নয়লো ইহা ধরবে নাকো সাপ ॥
এগিয়ে এস বড়ঠাকরুণ, সাত পোয়াতীর মা।
তক্ত পাবেন তোমার তিনি তাও কি জান না ?

ভয় করো না এক্‌লা আমি দেখতে নাহি চাই।
রাজার ছেলের আবডালেতে উঁকি মার্‌ব ভাই ॥
আমি—স্বদেশবাসী আমায় দেখে লজ্জা হতে পারে।
বিদেশবাসী রাজার ছেলে লজ্জা কি লো তারে ॥
বলতে কথা বাছা বাছা কদম ফুলের ঝাড়।
যেন্নে আসি রাজকুমারে ভাঙ্‌লো কবির ঘাড় !
হীরার ঝলস, সোনার কলস, হাত ঝুমকার বোল।
হুলু হুলু উলুর ধ্বনি শাঁখের গণ্ডগোল ॥
বারাণসীর খস্‌খসানি উঠলো মহাধুমে।
মারবেলেতে মলের ঠমক্‌ বাজলো রুমে রুমে ॥
কবি হৈল হতভোম্বা হিঁদুর পর্দ্দা ফাঁক।
পালিয়ে যেতে পথ পায় না ঘোরে কলুর চাক ॥
বাঙ্গালায় বিশে পৌষ বড় পুণ্য দিন।
বাঙ্গালী কুলকামিনী হইল স্বাধীন।”

এই “২০শে পৌষ” ছিল ইংরেজী ১৮৭৬ সালের জানুয়ারী মাসে। উপরের কবিতা পড়ে কারও যদি bad taste বলে মনে হয়, তাহলে আমি পুরণো আমলের কবির দোষ-ত্রুটির জন্যে আধুনিক পাঠক-পাঠিকার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেব।

এই হেমবাবুই আবার আর এক জায়গায় লিখেছেন—

“আসিছে ভারতে বৃটন-কুমার,
শুন হে উঠিছে গভীর বাণী,
গগন ভেদিয়া, “জয় ভিক্টোরিয়া
রাজরাজেশ্বরী ভারত-রাণী।”

—এবং সেই প্রসঙ্গেই ভারত মাতার মুখ দিয়ে বলিয়েছেন :—

"কি হেন পাতক করেছি তোমায় ?
বল ওরে বিধি বলরে আমায়
চিরকাল এই ভগ্নদণ্ড ধরি,
চিরকাল এই ভগ্ন চূড়া পরি,
দাস-মাতা বলি বিখ্যাত হ'ব।"

সে সময় কোন রকম স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হয় নি। সে কারণ তখন যুবরাজের অবাধ গতিবিধির জন্যে কোনও সাবধানতার প্রয়োজন হয় নি। দেশের এই রকম নিরাপদ আবহাওয়ায় যুবরাজ নিঃশঙ্কচিত্তে ছাত্র-মহলেও ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। এই সূত্রে তিনি শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজেও গিয়েছিলেন। কলেজের কর্তৃপক্ষ যুবরাজের অভ্যর্থনার উপযুক্ত বন্দোবস্ত করেছিলেন। ঐ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে যত যন্ত্রপাতি ছিল তার প্রত্যেকটির হেফাজতে একজন করে ছাত্র মোতায়েন করা হয়েছিল। ছাত্রদের শিখিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে যুবরাজ কোন প্রশ্ন করলে জবাবে যুবরাজকে **"Your Royal Highness"** বলে সম্বোধন করতে হবে। **Prismatic Compass** নামে যন্ত্রটির কাছে যে ছাত্রটিকে রাখা হয়েছিল, সে সবে **Ist. year**-এ ভর্তি হয়েছে। বেচারা সাতদিন ধরে মন্ত্রের মত কেবল মুখস্থ করেছে—"**Prismatic Compass, Your Royal Highness**।" কিন্তু যখন যুবরাজ এসে পড়লেন, বেচারার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল, বুক ঢিপ ঢিপ করতে লাগল। তার কাছাকাছি এসে যুবরাজ যেমন জিজ্ঞাসা করলেন "**What is this ?**" অমনি বেচারা কাঁপতে কাঁপতে একটু তোতলামির ভঙ্গিতে বলে বসল—"**Royal Compass, Your P-P-Prismatic Highness !**"

সাক্ষী শেখানর ব্যাপার আদালতে কতবার কত রকম ভাবে যে ধরা পড়ে গেছে তার ইয়ত্তা নেই। একবার এক মুখ্যু অল্পবুদ্ধি লোককে সাক্ষ্য দেবার জন্যে খুব করে শেখানর চেষ্টা হয়েছিল। শেখাবার ভার নিয়েছিল

তদ্বির-কারক নিজে, এবং তার মাস্টারির গুণে ১নং ২নং ইত্যাদি প্রশ্নের জবাবে তাকে কি বলতে হবে তা পর্যন্ত সে বেচারাকে মুখস্থ করতে হয়েছিল। তার বক্তব্য ছিল যে সে দুধের কেঁড়ে হাতে গোয়ালা-বাড়ী যাচ্ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে প্রশ্ন করবার সময় সে-পক্ষের উকিলবাবু—"হাতে কি ছিল?" প্রশ্নটি প্রথমে জিজ্ঞাসা না করে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—"যাচ্ছিলে কোথায়?" সাক্ষী সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিয়েছিল "দুধের কেঁড়ে"—কারণ ঐটিই ছিল তার মুখস্থ হিসেবে প্রথম উত্তর। উকিলবাবু ত ঘাবড়ে গেলেন, কিন্তু তদ্বির-কারক 'নাছোড়বান্দা'। সে চুপিচুপি উকিলবাবুকে বললে—"এবার 'হাতে কি ছিল' জিজ্ঞাসা করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি একেবারে আচ্ছা করে তালিম দিয়ে দিয়েছি; আপনি নির্ভয়ে জিজ্ঞাসা করুন। দেখবেন আর কোন গোলমাল হবে না।" উকিলবাবু তখন আশ্বস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"হাতে কি ছিল?" সাক্ষী নির্বিকার ভাবে জবাব দিল—"গয়লা বাড়ী"—অর্থাৎ তার মুখস্থ করা দ্বিতীয় উত্তর। হাকিম হাসতে হাসতে সাক্ষীকে কাটরা থেকে নেমে যেতে নির্দেশ দিয়ে উকিলবাবুকে বললেন—"আপনার অন্য সাক্ষী থাকে ত ডাকুন।"

তবে আবার এমন সাক্ষীও আছে যে ঘটনার সম্বন্ধে কোন কিছু না জেনেও এমনভাবে জবাব দিয়ে যেতে পারে যে কিছুতেই তাকে ঠকান যায় না। এক সময় পুলিশের এক জমাদার নানারকমের অপরাধের জন্যে চাকরি থেকে বরখাস্ত হয়। তারপরে সে নিজের গ্রামে গিয়ে খুব মুরুব্বীয়ানা সুরু করে। ক্রমশঃ স্থানীয় থানায় বেশ প্রতিপত্তি জমিয়ে নেয়। কিছুকাল বাদে দেখা গেল যে সেই থানা থেকে যত মামলা হয় তার কোন মামলাতে "corroborative evidence" অর্থাৎ 'সমর্থক সাক্ষ্যর' প্রয়োজন হলেই এই লোকটির ডাক পড়ে।

একদিন সকালবেলা লোকটি নিজের বাড়ীর সামনে একটা গাছ কাটছিল। এমন সময় দেখে যে গাঁয়ের মোড়ল ৩।৪ জন লোক সঙ্গে নিয়ে সেই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। দেখেই ডেকে বলল,—

"কিগো মোড়ল মশায়, দলবল নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কোথায়?"

মোড়ল উত্তর দিল—"কেন? আজ যে আমার মামলার দিন। তাই সাক্ষীদের নিয়ে সদরে যাচ্ছি।"

লোকটি যেন আশ্চর্য হয়ে বলল—"তোমার মামলা? আমায় ত বল নি।"

মোড়ল ব্যস্ত হয়ে ভয়ে ভয়ে উত্তর দিল,—"আরে, তুমি ত ঘরের লোক, তোমায় আবার বলব কি? তুমি ছাড়া কি এ জেলায় কোন মামলা হয়? তাই ভেবেছিলাম যে যাবার পথে তোমায় ডেকে নিয়ে যাব।"

শুনে লোকটি বলল—"দাঁড়াও তবে। জামাটা গায়ে দিয়ে আসি।" এই বলে সে তার বাড়ীর ভিতর ঢুকে গেল এবং একটু পরেই ফতুয়া গায়ে, চটি পায়ে, গামছা ও ছাতা হাতে বেরিয়ে এসে মোড়লের দলে ভিড়ে গেল।

পথে চলতে চলতে কবে কোন মামলায় সে কি রকম ভাল সাক্ষ্য দিয়েছে, কোন উকিল তাকে জেরা করতে গিয়ে কি রকম বোকা বনে গেছে, অনর্গল এই সব গল্প বক্ বক্ করে বলে যেতে লাগল। মোড়লের মামলাটা যে কি নিয়ে এবং কার সংগে মামলা সে সব কিছু জানবার তার দরকারও হল না এবং তার বক্‌বকানির ঠ্যালায় মোড়লও তাকে সে সব কথা বলবার ফুরসুৎ পেল না। এইভাবে তারা সহরে এসে পৌঁছে গেল। তখন সে লোকটি মোড়লকে বলল,—"কিছু পয়সা দাও ত ভাই, চারটি চিঁড়ে মুড়ি কিছু খেয়ে আসি।" মোড়ল বলল—"আরে যাবেই ত। চল, আগে উকিল বাবুর কাছে গিয়ে তাঁর সংগে ৫।১০ মিনিট কথা বলে তারপর একেবারে হোটেলে গিয়ে ভাত খাওয়া যাবে'খন।" লোকটি বলল—"আরে আমি ১৮ বছর পুলিশে চাকরি করেছি; তাছাড়া কত বড় বড় মামলার তদ্বির আমি নিজে করেছি, কত উকিলকে হাতে ধরে শেখালাম—আর আজ কিনা তোমার উকিলের কাছে শিখতে যেতে হবে। ওসব কিস্যু দরকার নাই। তোমরা আদালতে গিয়ে 'হাজ্‌রেতে' স্রেফ্ আমার নামটা দিয়ে দাওগে, আমি ঠিক সময়ে গিয়ে কোর্টে হাজির হব। হ্যাঁ, এখন দুটো টাকা দাও ত—বাজার থেকে ঘুরে আসি।" এই বলে মোড়লের কাছ থেকে দুটো টাকা আদায় করে সে সেখান থেকে চলে গেল।

যথাসময়ে কোর্টে মামলার ডাক হল। মোড়লের সাক্ষ্য ও তার পক্ষের অন্য ২।১ জন সাক্ষীর জবানবন্দী শেষ হয়েছে, এমন সময় লোকটি পরিতোষ সহকারে তার ভোজনপর্ব সমাধা করে বিড়ি টানতে টানতে আদালতে উপস্থিত হল। সে এসেই শুনতে পেল যে সাক্ষী হিসেবে তার নাম ডাকা হচ্ছে। বিড়িটা জোরে একটা শেষ টান দিয়ে ফেলে দিয়ে নিতান্তই সপ্রতিভ ভাবে সে এজলাসে ঢুকে পড়ল এবং সটান সাক্ষীর কাট্‌রায় উঠে হাকিমকে খুব ভক্তিভরে নমস্কার করল।

মোড়লের পক্ষের উকিলবাবুটি বেশীদিন তখনও ওকালতি করেন নি, তার ওপর সাক্ষী যে কি বলবে সে বিষয়ে তাঁর কোন ধারণাই ছিল না। কাজে কাজেই বড় বিব্রত বোধ করছিলেন। এদিকে সাক্ষীর নাম ধাম, লেখা হয়ে গেল, তার হলফ নেওয়া হয়ে গেল—তখন উকিলবাবুটি সাক্ষীকে সাধারণভাবেই জিজ্ঞাসা করলেন,—আপনি দেখেছিলেন কি ?

সাক্ষী উত্তর দিল—হ্যাঁ, দেখেছিলুম বৈ কি।

উকিলবাবু তখন জিজ্ঞাসা করলেন,—কত বড় ছিল ?

—তার জবাবে সাক্ষী কাটরায় যে রেলিং থাকে তার হাতখানেক উঁচুতে বাঁ হাতটা ধরে বলল—এত বড় ছিল।

তখন হাকিম ধমকে উঠলেন,—মুরগি কখনও অত বড় হয় ?

লোকটি এতক্ষণে বুঝতে পারল যে তাকে মুরগি সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতে হচ্ছে। সে দমে যাবার পাত্র নয়! তার বাঁ হাতটি ঠিক আগের মত রেখে ডান হাতটি তার একটু নীচে ধরে একটি মাঝারিগোছের মুরগির মাপ দেখিয়ে বিজ্ঞের মত মুখখানা হাসি হাসি করে বললে—হুজুর কি তবে মাত্তর একখানা হাতই দেখলেন ?

এটি আমার সামনে ঘটে নি, তবে এটি আদালত-মহলে খুবই প্রচলিত গল্প। এজাতীয় hardened এবং professional সাক্ষীকে জেরায় ঘায়েল করা খুবই শক্ত।

কলকাতা পুলিশ-কোর্টে একজন খুব রসিক উকিল ছিলেন। সব সময়েই বক্তৃতা-প্রসঙ্গে তাঁর অপর পক্ষের মামলা বা উকিলবাবু সম্বন্ধে কিছু না কিছু নতুন কথা বলতেন। একবার অন্য কোর্টের একজন উকিল তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কতকগুলি অবান্তর কথা বলেছিলেন। তার জবাবে আমাদের রসিক উকিলবাবুটি দাঁড়িয়ে উঠে বলেছিলেন—

"My friend is suffering from Diarrhoea of words, but Constipation of thoughts."

অর্থাৎ প্রকারান্তরে Shakespeare-এর—"Tale told by an idiot,—full of

sound and fury, signifying nothing"—এই উক্তিটির পুনরাবৃত্তি করলেন।

যাদের আদালতের সঙ্গে পরিচয় নাই, তাদের পক্ষে সব সময় বিচক্ষণ উকিল-কৌঁসুলীর জেরায় টিকে থাকা সহজ বা সম্ভব নয়। ব্যাপারটি নির্ভর করে যিনি জেরা করছেন তাঁর ওপরে। ফৌজদারী মামলায় সাধারণতঃ আসামীর পক্ষের সাক্ষ্য-প্রমাণ দেওয়ার কোন প্রয়োজন নাই। আসামী যদি জেরা করে দেখিয়ে দিতে পারে যে ফরিয়াদীর সাক্ষীরা সত্যি কথা বলছে না, তাহলেই তার কাজ হয়ে গেল। সেই জন্যেই আসামীর পক্ষ থেকে ফরিয়াদী-পক্ষের সাক্ষীরা যে নির্ভরযোগ্য নয় এইটাই তাদের জেরা করে দেখিয়ে দেবার চেষ্টা হয়। যে সব সাক্ষী কখনও মিথ্যে কথা বলে না, তাদের মিথ্যেবাদী প্রমাণ করা ত আর সহজ কথা নয়। তবে একই বিষয় নানারকম ভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দীর্ঘকাল ধরে জিজ্ঞাসা করতে থাকলে অনেক সময় সাক্ষীর মেজাজ বিগড়ে যায় ত বটেই, কখনও কখনও একটা মানসিক জড়তা—যাকে ইংরেজীতে বলে 'mental inertia' তাই এসে পড়ে। তখন মূল জিনিষটা বাদ দিয়ে কতকগুলো বাজে জিনিষ সম্বন্ধে সাক্ষীকে দিয়ে যা খুসী বলান যেতে পারে। এইখানেই বিচক্ষণ আইনজীবীর কৃতিত্ব প্রকাশ পায়। তাঁরা আসল ঘটনা বা 'মূল জিনিষ নিয়ে বেশী নাড়াচাড়া করেন না, কারণ তাঁরা জানেন যে সেটি সাক্ষীর মগজে ঢুকে আছে এবং সে সম্বন্ধে সে কোন বাজে বা অবান্তর কথা বলবে না। এজাতীয় সাক্ষীর প্রতি তাঁদের আক্রমনটা হয় সামান্য এবং অপ্রয়োজনীয় ব্যাপার নিয়ে।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ যে একজন বড় ব্যারিষ্টার ছিলেন, একথা সকলেই জানেন। তিনি Non-Co-operation আন্দোলনে যোগ দিয়ে ব্যারিষ্টারি ছেড়ে দেন, কিন্তু তার আগে তিনি অনেক বড় বড় মামলাই করেছিলেন। খুব অল্প বয়সেই তাঁর প্রতিভার খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। একবার

এক খুনের মামলায় তিনি জেরার কৌশলে আসামীকে কিভাবে বাঁচিয়েছিলেন, সেই গল্পই বলছি।

এক গ্রামে সেখানকার জমিদারের ছেলে কুসঙ্গে পড়ে অধঃপাতে যায়, এবং শেষ পর্যন্ত এক নীচজাতীয়া স্ত্রীলোককে খুন করে। এই মোকদ্দমার সাক্ষীদের মধ্যে 'শিরোমণি মশাই' নামে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ছিলেন। বহু দূর দেশ থেকেও অনেক ছাত্র তাঁর টোলে সাংখ্য, বেদান্ত, ন্যায়, মীমাংসা ইত্যাদি পড়বার জন্যে আসত। এককথায় যাকে বলে সর্বশাস্ত্রবিদ্‌ তিনি তাই ছিলেন। তাঁর পাণ্ডিত্য, ন্যায়পরায়ণতা, সত্যানুরাগ প্রভৃতির খ্যাতি দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। 'শিরোমণি মশাই' নাম শুনলেই লোকের মনে সম্ভ্রম জাগত। গ্রামের অল্প দূরেই গঙ্গা। প্রত্যহ সূর্যোদয়ের আগে শিরোমণি মশাই গঙ্গাস্নান করে সেইখানেই প্রাতঃসন্ধ্যা, জপ ইত্যাদি সেরে নিজ হাতে করে এক কলসী গঙ্গাজল নিয়ে ফিরতেন। ঘটনার সময় ছিল ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি, শীত অনেকটা কমে গেছে, শিরোমণি মশাই গঙ্গাস্নান ইত্যাদি সেরে যখন ফিরছেন, তখন সবে সূর্যোদয় হয়েছে। একটি জামগাছের তলা দিয়ে তাঁর গ্রামে ফেরার পথ। জামগাছের কাছে একটা ঘরে সেই স্ত্রীলোকটি থাকত। শিরোমণি মশাই দূর থেকে একটা চিৎকার শুনতে পেলেন। জামগাছের কাছাকাছি আসতেই দেখতে পেলেন যে ঐ জমিদারের ছেলে সেই মেয়েটির ঘর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে আসছে—তার গায়ে ও জামা-কাপড়ে রক্তের দাগ। শিরোমণি মশাই তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন—কি হয়েছে? সে কোন জবাব না দিয়েই দৌড়ে পালিয়ে গেল। এদিকে চিৎকার শুনে যারা দূর থেকে এসেছিল, শিরোমণি মশাই-এর কথা শুনে তারা সেই ঘরের কাছে গিয়ে দেখতে পেল যে মেয়েটির রক্তাক্ত দেহ পড়ে আছে—পাশে একখানা নতুন কাটারি। যথাসময়ে পুলিশ এল; তদন্ত করে জমিদারের ছেলেকে গ্রেপ্তার করল এবং তাকে বিচারের জন্যে চালান দিল।

বলা বাহুল্য যে এ মামলায় শিরোমণি মশাই ছিলেন প্রধান সাক্ষী। আসামীর তরফ থেকে দেশবন্ধু দাশ মশাই চারদিন ধরে শিরোমণি মশাইকে জেরা করেন। জেরার প্রথম দিকে এই রকম একটা আভাস দিয়েছিলেন যে ছেলেটির দুরন্তপনার জন্যে গ্রামের লোক তার উপর বিরক্ত ছিল, শিরোমণি মশাই-এরও বাগানে পেয়ারা, আম ইত্যাদি চুরিকরার জন্যে

শিরোমণি মশাই কয়েকবার ছেলেটির উপর রাগ করেছেন। শিরোমণি মশাই সরলভাবে এ সব কথা কবুল দিলেন। আরও জেরায় শিরোমণি মশাই স্বীকার করলেন যে ঐ আসামীর চরিত্র-দোষের কথা সকলেই জানতেন এবং শিরোমণি মশাই তাঁর টোলের ছাত্রদিগকে আসামীর সঙ্গে মেলামেশা দূরের কথা—কথাবার্তা পর্যন্ত বলতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন। নানা বাজে জিনিষ নিয়ে জেরা করতে করতে তিনদিন কেটে গেল। চারদিনের দিন জেরার মুখে শিরোমণি মশাই বলে ফেললেন যে ঘটনার দিন তিনি জামগাছের কাছে পৌঁছাবার আগেই কয়েকটি ছেলে সেই গাছের তলায় কি কুড়োচ্ছিল। সঙ্গে সঙ্গে দাশমশাই প্রশ্ন করলেন—পাকা পাকা জাম রাত্রে গাছ থেকে তলায় পড়েছিল, ছেলেরা ভোরে উঠে সেই জাম কুড়োচ্ছিল কি? শিরোমণি মশাইয়ের তখনকার অবস্থা—'ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি' গোছের। চিন্তাশক্তির সম্পূর্ণ জড়তা এসে গেছে। ব্যাপারটা যে ফাল্গুন মাসে ঘটেছিল, সে হুঁশ আর তাঁর তখন ছিল না। তাঁর জবানবন্দী এবং জেরা যখন হচ্ছিল, তখন জ্যৈষ্ঠ মাস। অতএব ছেলেদের ঐ গাছের তলা থেকে জাম-কুড়োনটা তাঁর কাছে তখনকার দৈনন্দিন ব্যাপার। তিনি কোনরূপ সম্ভব অসম্ভব চিন্তা না করেই দাশমশাই-এর প্রশ্নের জবাবে বললেন—হ্যাঁ। তৎক্ষণাৎ দাশমশাই পরের প্রশ্ন করলেন—কতগুলো ছেলে ঐ গাছতলায় জাম কুড়োচ্ছিল ঠিক করে বলুন। শিরোমণি মশাই জবাব দিলেন ঠিক ক'জন ছেলে ছিল তা বলতে পারি না; তবে ৪।৫ জন হবে। দাশমশাই এইখানেই তাঁর জেরা শেষ করলেন।

পরে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে দাশমশাই বললেন যে শিরোমণি মশাই আগে থেকে ছেলেটির উপর বিরূপ ছিলেন, এমন কি তাঁর টোলের ছাত্রদের পর্যন্ত তার সঙ্গে কথাবার্তা কইতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন। তিনি ছোকরার উপর এত বেশী বিরক্ত হয়েছিলেন যে ফাল্গুন মাসে গাছ থেকে জাম পেকে তলায় পড়ছে আর ছেলেরা তাই কুড়িয়ে খাচ্ছে এরকম অসম্ভব কথা হলফ নিয়ে বলতেও তাঁর সংকোচ বা দ্বিধা হয় নি। এরকম লোকের কথায় বিশ্বাস করে কি ভদ্রলোকের ছেলেকে ফাঁসি দেওয়া যায়? বলা বাহুল্য যে জমিদারের পয়সায় ও তদ্বিরে অন্য সাক্ষী বন্দোবস্ত হয়ে গিয়েছিল; শুধু শিরোমণি মশাইকে জমিদারের পয়সাও প্রলুব্ধ করতে পারে নি বা তার প্রতাপও কাবু করতে পারে নি। তিনি কাবু হয়েছিলেন দাশমশাই-এর

জেরায়। ইংরেজ জজ সাহেব কি এইরকম সাক্ষীর কথা বিশ্বাস করবার নির্দেশ জুরীদের দিতে পারেন?—ফলে ঐ আসামী বে-কসুর খালাস হয়েছিল।

আমি যখন প্রথম পুলিশ-কোর্টে যোগ দিই, তখন 'Senior' বলতে যে কয়জন ছিলেন তার মধ্যে একমাত্র কেশব গুপ্ত মশায়ই বেঁচে আছেন। বাঙ্গালী শিক্ষিত সমাজে কেশব গুপ্তের নাম জানেন না এমন লোক খুব কম। কিন্তু যাঁরা বেঁচে নেই তাঁদের মধ্যেও অনেক নাম-করা উকিল ছিলেন। তাঁদেরই একজনের সম্বন্ধে একটি গল্প বলছি। ভদ্রলোককে আমরা 'দাদা' বলতুম। এককথায় দাদা আমাদের সর্বগুণসম্পন্ন সুরসিক ও মহানুভব লোক ছিলেন। তিনি যখন ইংরেজীতে বক্তৃতা করতেন বা সাক্ষীকে জেরা করতেন, তখন শোনবার জন্যে আদালতে ভীড় জমে যেত। দাদার দেহটি একটু মেদ-বহুল ছিল এবং তাঁর একটি মুদ্রা-দোষও ছিল। তিনি যখন দাঁড়িয়ে নিজে কথা বলতেন অর্থাৎ বক্তৃতা করতেন কিম্বা সাক্ষীকে প্রশ্ন করতেন তখন বেশ সহজভাবেই চোখ মেলে থাকতেন। কিন্তু যখনই অন্য কারও কথা শোনবার দরকার হত—যেমন হয়ত হাকিম কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছেন, কিম্বা সাক্ষী তাঁর প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে এই রকম অবস্থায়—সঙ্গে সঙ্গে দাদার চোখ দুটি বুজে যেত, মাথাটা একটু সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ত, এবং তাঁর গলার থেকে নাক-ডাকার মত একটি মৃদু ঘড়্ ঘড়্ আওয়াজ বের হত। তাতে করে, যাঁরা দাদাকে না চিনতেন তাঁরা মনে করতেন যে দাদা বুঝি জেরা বা বক্তৃতার মাঝে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছেন।

একবার দাদার গাড়ীর সঙ্গে এক Taxi-র ধাক্কা লাগে। Taxi-ওয়ালা মদ খেয়ে রাস্তার wrong side দিয়ে বে-আইনি ভাবে তার Taxi চালাচ্ছিল। ধাক্কার ফলে দাদার গাড়ীখানার যথেষ্ট জখম ও ক্ষতি হয়েছিল কিন্তু ভগবানের দয়ায় গাড়ীর ভেতরের কারও কোন গুরুতর আঘাত লাগেনি। সে সময় দাদা Taxi-ওয়ালার কাছে তার নাম, ঠিকানা, License Number ইত্যাদি চেয়ে ছিলেন, কিন্তু Taxi-ওয়ালা ওসব কিছুই না দিয়ে নিতান্ত উদ্ধতভাবে

দাদাকে গালাগালি করে Taxi নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। থানায় সব কথা জানিয়ে নালিশ লেখান হল। পুলিশ Taxi-ওয়ালাকে ধরে এনে মোকদ্দমা চালান দিল। শুনানী আরম্ভ হল। মামলার প্রধান সাক্ষী দাদা নিজে। তিনি যা ঘটেছিল সব সঠিক বলে তাঁর জবানবন্দী দিলেন, কিন্তু তাঁর বরাবরকার অভ্যাসের কোনই ব্যতিক্রম এবারেও হল না। অর্থাৎ আসামী পক্ষের উকিল যখন কোন প্রশ্ন করছেন, দাদা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঠিক নাক ডাকাচ্ছেন, কিন্তু প্রশ্ন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নাক-ডাকা থেমে গিয়ে আসছে দাদার সপ্রতিভ জবাব।

Taxi-ওয়ালার তরফ থেকে দাদাকে জেরা করতে আরম্ভ করলেন একটি নতুন বেহারী উকিল। তিনি একথা সেকথার পর দাদাকে প্রশ্ন করলেন,—"Were you dishonoured when the Taxi-Driver abused you?" যতক্ষণ প্রশ্নটি হচ্ছিল ততক্ষণ দাদার নাসিকা-ধ্বনি শোনা যাচ্ছিল। যেমন প্রশ্নটি শেষ হল, সঙ্গে সঙ্গেই নাসিকার ধ্বনি থেমে গেল এবং দাদার মুখের আওয়াজ শোনা গেল—

"I am neither a cheque nor a woman that I shall be dishonoured."

এবার যে ঘটনাটির কথা বলছি তা থেকে বোঝা যাবে যে মানুষের কাজ-কর্মের উপর তার দৈহিক অবস্থার প্রভাব বড় কম নয়। অনেক সময়েই দৈহিক বিকৃতির কিম্বা অস্বাভাবিকতার উপযুক্ত চিকিৎসা করাতে পারলে কার্যকলাপের, জীবন-ধারার—এমন কি চরিত্রের পর্যন্ত—বিশেষ পরিবর্তন ঘটে। এমনও দেখা গেছে যে যে বিকৃতি বা অস্বাভাবিকতা কোনও গুরুতর অনিষ্টের মূলে রয়েছে, সেটা সহজে চোখে পড়ে না, বা সেটা চোখে পড়া একেবারেই অসম্ভব; কেবলমাত্র উপযুক্ত ডাক্তারের দ্বারা পরীক্ষা করালে তা ধরা পড়ে এবং তখনই তার প্রতিবিধান সম্ভবপর হয়।

তালতলা অঞ্চলে এক শিক্ষক সপরিবারে থাকতেন। তাঁর বাসাটি বড় রাস্তার ওপরে ছিল। তাঁর অনেকগুলি ছেলেমেয়ে। তিনি যে বাড়ীতে

থাকতেন সে বাড়ীর ঠিক উল্টো দিকে রাস্তার অপর পারে রকের ওপর এক বিড়িওয়ালার দোকান ছিল। ঐ দোকানে দুটো মুসলমান ছোকরা বসে সারাদিন বিড়ি পাকাত, শিষ্ দিত ও গান করত। মাস্টার ভদ্রলোকের বড় মেয়েটির বয়স তখনও ১৬ বছর হয় নি, ইস্কুলে পড়তে যেত। একদিন সকালবেলা দেখা গেল যে মেয়েটি বাড়ীতে নেই। ভদ্রলোক নিজে সকাল সন্ধ্যে **Private Tution** করতেন। ভোরবেলা উঠে স্নান সেরে ঝিকে সংগে নিয়ে বেরিয়ে যেতেন এবং তার হাত দিয়েই মাছ-তরকারীর বাজার পাঠিয়ে দিয়ে নিজে পরপর দুটি ছেলেকে **private** পড়াতে যেতেন। বেলা ১০টা নাগাদ বাড়ী ফিরে কোনমতে দু'থাবা ভাত গিলে তাড়াতাড়ি তাঁর ইস্কুলে ছুটতেন। বিকেলে ইস্কুলে বসেই দু-চার পয়সার জলখাবার কিনে খেয়েই আবার ছেলে পড়াতে যেতেন—শেষ করে বাড়ী ফিরতে রাত্রি ১০টা। অতএব বাড়ীর সংগে সম্পর্ক তাঁর বিশেষ ছিল না। তাঁর স্ত্রী প্রায় চির-রুগ্নাই ছিলেন, তার ওপর আবার অনেকগুলি ছেলেমেয়ের মা। সুতরাং মেয়ে বড় হলে তার ওপর যেরকম নজর রাখা দরকার সেরকম নজর রাখার মতন অভিভাবক বাড়ীতে কেউই ছিল না।

ঘটনার দিন সকালবেলা ভদ্রলোক নিজের অভ্যাসমত বাজার যাবেন বলে বড় মেয়ের নাম ধরে ডাকলেন বাজারের পয়সা দেবার জন্যে। তাঁর স্ত্রী তখন সবে প্রসব করেছেন—আঁতুড়-ঘর থেকে বেরোন নি। অনেক ডাকাডাকিতেও মেয়েকে পাওয়া গেল না—একটা গোলমাল হল। শুনতে পেয়ে বিড়িওয়ালা দোকানদার বললে যে তার দোকানের ছোকরা দুজনও কাজে আসে নি। সে আরও বললে যে দু-তিনদিন আগে ঐ ছোকরা দুজনের একজন ঐ মেয়েটির দিকে তাকিয়ে অশ্লীল ইংগিত করেছিল—মেয়েটি তাতে কোনরকম আপত্তির ভাব না দেখিয়ে বরং একটু হেসেছিল। দোকানদার এইসব দেখতে পেয়ে ঐ ছোকরার কাণ মলে দিয়েছিল। দোকানদারটির মতে ঐ ছোকরা দুটির সংগেই নিশ্চিত মেয়েটি রাতারাতি পালিয়েছে। ভদ্রলোক তখনই ঐ দোকানদারকে সংগে নিয়ে থানায় গিয়ে নালিশ লেখালেন। যে রাত্রে মেয়েটি পালিয়েছিল—তার দিন দুই আগে ভদ্রলোক তাঁর ইস্কুলের গত মাসের মাইনে ও দুটো টিউশনির টাকা মেয়েটির হাতে দিয়ে বাক্সে তুলে রাখতে বলেছিলেন। দেখা গেল যে মেয়েটি বাড়ী থেকে চলে যাবার সময় তার থেকে গুটি পঞ্চাশেক টাকা

এবং মার বাক্স থেকে কয়েকখানা গয়না আর খানকতক ভাল শাড়ী ও জামা নিয়ে গিয়েছে।

এইসব খবর থানায় জানান হলে থানা থেকে পুলিশ-গেজেটে সব বিবরণ ছাপিয়ে বের করা হল। ফলে সব থানাতেই ঘটনাটি জানতে পারল। চার পাঁচ দিন বাদে মাণিকতলা থানায় এক মুসলমান-বস্তির বাড়ীওয়ালা এসে খবর দিল যে দুটি ছোকরা ও একটি বোরখা-পরা মেয়ে এসে তার বস্তিতে উঠেছে। তারা যখন ঘরভাড়া নেয় তখন ছোকরা দুজন দুই ভাই বলে পরিচয় দিয়েছিল এবং আরও বলেছিল যে বড় ভাইয়ের সঙ্গে ঐ বোরখাপরা মেয়েটির সাদী হয়েছে; তাদের ঘরে সাদী-করা বিবিকে নিয়ে থাকবার জায়গা নেই বলে তারা এই ঘরটি ভাড়া নিচ্ছে। ঐ বাড়ীওয়ালা আরও বলল যে পরে সে দেখতে পেয়েছে যে ওরা তিনজনেই একঘরে রাতদিন থাকে এবং ওদের এইসব চাল-চলন দেখে তার ধারণা হয়েছে যে সাদী-করার গল্পটি মিথ্যে এবং ছোকরা দুটো মেয়েটিকে ফুসলিয়ে এনেছে কোন জায়গা থেকে।

এই সংবাদ পেয়ে মাণিকতলা থানার Inspector তৎক্ষণাৎ ছোকরা দুটিকে আর মেয়েটিকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে এলেন। মেয়েটির কথাবার্তা শুনে তিনি বুঝলেন যে মেয়েটি বাঙ্গালী ভদ্রলোকের মেয়ে এবং তার কথাবার্তায় কোন মুসলমানী টান বা শব্দের ব্যবহার নেই। পুলিশ-গেজেটে বিজ্ঞপ্তির কথা তাঁর মনে ছিল—সবে দু-তিনদিন আগেই সেটা দেখেছেন। তিনি গেজেটখানি আর একবার দেখে তার থেকে মাস্টার মশায়ের নামটি জেনে নিয়ে মেয়েটিকে সোজা প্রশ্ন করলেন—"তুমি তালতলার অমুকবাবুর মেয়ে ত? আর ছোঁড়া দুটো ত তোমাদের বাড়ীর সামনের বিড়ির দোকানে কাজ করে?" মেয়েটি কেঁদে ফেলে বলল—"আপনি যখন সবই জানেন, তখন আমাকে আমার বাপ-মার কাছে পাঠিয়ে দিন।" ছোকরা দুজনও সব কথা স্বীকার করল।

যথাসময়ে মামলা চালান হল। নিয়মিত প্রথা অনুসারে কলকাতার Police Surgeon মেয়েটিকে পরীক্ষা করে Report দিলেন। মামলার কাগজের সঙ্গে সেই Report-ও আমার হাতে এল। সেই Report-এ দেখতে পেলাম যে মেয়েটির দেহের গুপ্তস্থানে একটি অস্বাভাবিক জিনিষ আছে। তখন Police Surgeon প্রায় প্রত্যেক দিনই আমাদের কোর্টে

সাক্ষী দিতে আসছেন। আমি একদিন তাঁকে আমার আফিস-কামরায় ডেকে তাঁর ঐ Report-টা দেখিয়ে তাঁর সংগে ঐ বিষয়ে আলোচনা করলাম। তিনি আমাকে পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিলেন যে গুহ্যস্থানের ঐ অস্বাভাবিক জিনিষটাই হল মেয়েটির চরিত্রগত দোষের মূল, এবং Operation করলেই ও রোগ একেবারে সেরে যাবে। তিনি আরও বললেন যে এ Operation অতি সহজ ব্যাপার এবং অবিলম্বে এই Operation-টি করে ফেললে মেয়েটির চরিত্র শুধরে যাবে এবং সে সব বিষয়েই স্বাভাবিক হয়ে যাবে। Police Surgeon বেশ জোর করেই বললেন যে মেয়েটি আসলে খারাপ নয়; রোগ বাসা বেঁধেছে মেয়েটির দেহে—মনে বা প্রবৃত্তিতে নয়।

মেয়ের বাপ যখন সাক্ষী দিতে আমাদের কোর্টে আসেন, আমি তখন তাঁকে এ ব্যাপারটি জানিয়ে মেয়েটিকে ডাক্তার দেখিয়ে Operation করিয়ে নেবার পরামর্শ দিই। শুনে মেয়ের বাপ যেন ঘোর অন্ধকারে অপ্রত্যাশিত আলোর সন্ধান পেলেন। কথা দিলেন যে মামলাটি শেষ হয়ে গেলেই তিনি আমার পরামর্শমত কাজ করবেন।

High Court-এ জুরীরা একমত হয়ে আসামী ছোকরা দুজনকে দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন এবং তাদের দুজনেরই জেল হয়ে গিয়েছিল।

এর বছর তিন চার পরে গ্রীষ্মের সময় ছুটি নিয়ে পুরী গিয়েছি—একদিন বাজারে দেখি সেই মাষ্টার মশাই সপরিবারে যাচ্ছেন। আমাকে দেখে চিনতে তাঁর বিশেষ কষ্ট হয় নি। কিন্তু কেবলমাত্র আমি কোথায় থাকি এই ঠিকানাটুকু জেনে নিয়েই যাকে বলে abruptly চলে গেলেন। মনে মনে সামান্য একটু ক্ষুণ্ণ হলাম এই ভেবে যে আগের ঘটনার কথা মনে থাকলে হয়ত খাতিরেও আমার সংগে আরও দু-চারটে কথা বলতেন।

সেদিন দিবা-নিদ্রার পরে বারান্দায় বসে চা খাচ্ছি, এমন সময় মাষ্টার মশাই আমার কাছে এসে হাজির। আমার প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাস উথলে উঠল। তিনি বললেন যে আমার পরামর্শমত মামলা শেষ হবার সংগে সংগেই 'তিনি তাঁর এক ডাক্তার-বন্ধুর সহায়তায় মেয়েটির Operation করান। Operation-এর পরের থেকেই মেয়েটির চরিত্র একেবারেই বদলে গেছে। তিনি তালতলা ছেড়ে অন্য পাড়ায় বাড়ী নিয়ে পরে মেয়েটির বিয়ে দেন। মেয়েটি সুখে-শান্তিতে এখন স্বামীর ঘর করছে—কয়েকমাস

হল মেয়েটির একটি ছেলেও হয়েছে। এবারে মেয়ে, জামাই ও নাতিকে সঙ্গে নিয়ে গ্রীষ্মের ছুটিতে শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দর্শন করতে এসেছেন। সকালে সকলকে নিয়ে শ্রীমন্দিরে গিয়েছিলেন—সঙ্গে মেয়ে-জামাইও ছিল। আমার সঙ্গে আলাপ করলে পাছে মামলার কথা উঠে পড়ে এবং জামাই ব্যাপারটি জানতে পারে সেই ভয়েই তিনি সকালবেলা আমার সঙ্গে ভালভাবে কথা বলতে পারেন নি এবং সেই অপরাধের জন্যে ক্ষমা চাইতেই আমার কাছে এসেছেন। আমি তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললাম যে আমি এ সংবাদে অত্যন্ত সুখী হয়েছি, কোন কিছুই মনে করি নি এবং তাঁর সঙ্গে দেখা করবার কোন চেষ্টাই আমি করব না, এবং এমন কোন কিছুই আমার দ্বারা বা আমার তরফ থেকে হবে না যাতে তাঁর মেয়ে-জামাই-যের শান্তিভঙ্গের কোন কারণ হয়।

আমি Public Prosecutor থাকার সময় একদিন বেলা সাড়ে দশটা থেকে দুটো পর্যন্ত কোর্টে মোকদ্দমা করে সবে আমার নিজের আফিসে এসে বসেছি এমন সময় আমার এক বন্ধু হন্তদন্ত হয়ে আমার কামরায় ঢুকেই "যাক, বাঁচা গেল" বলেই একখানা চেয়ারের ওপর বসে পড়লেন। তিনি যে গল্পটি বললেন তাতে বোঝা গেল যে তিনি সকাল থেকে আলিপুর কোর্টে মামলা করছিলেন। সেইখানেই শুনতে পেলেন যে ব্যাঙ্কশাল কোর্টের Public Prosecutor বি. সি. সেন Chief Presidency Magistrate-এর ঘরে মামলা করতে করতে হঠাৎ বসে পড়েন এবং তৎক্ষণাৎ Heart fail করে মারা যান। পুলিশ থেকে Lorry নিয়ে আসা হয়েছে, সেই Lorry-তে করে মৃতদেহ বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। যিনি মৃতদেহ Lorry-তে তুলতে দেখেছেন তিনি আলিপুরেরই একজন উকিল এবং তিনি আলিপুরে ফিরে গিয়েই সেখানকার Bar Library-তে এই গল্পটি করেন। সেখান থেকেই B. C. Sen-এর কোনও এক বন্ধু তাঁর বাড়ীতে টেলিফোনে খবরটি দিয়েছেন।

এমন মুখরোচক সংবাদ সব সময় পাওয়া যায় না—বিশেষতঃ সেদিন ১লা এপ্রিল ছিল না—তাই বন্ধুবরকে আদর করে বসিয়ে চা খাওয়াবার

বন্দোবস্ত করলাম। ইতিমধ্যে আলিপুরের খবর আমাদের ব্যাঙ্কশাল কোর্টের লাইব্রেরীতেও এসে পৌঁছেচে। তাঁরা অবিশ্যি খবরটি হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিলেন। তবে তাঁদের মধ্যে দু-একজন এই মজার ব্যাপারটি আমার কান পর্যন্ত পৌঁছেচে কিনা সেই খবর নেবার জন্যে আমার আফিসে এলেন। সকলে মিলে চা খাচ্ছি, এমন সময় আমার **Telephone** বেজে উঠল। টেলিফোনে যে কথাবার্তা হল, সেটা যতটা মনে আছে নীচে দিলাম—কেবল পরের নাম কটি ছদ্ম-নাম। **Telephone**-এর **Receiver**-টি তুলে নিয়ে ডাকলাম—**Hallo !**

উত্তর—**May I speak to Mr. Sen ?**

আমি—**Speaking.**

উত্তর—আমি **Public Prosecutor Mr. B. C. Sen**-কে চাই।

আমি—আমিই **Public Prosecutor B. C. Sen** কথা বলছি। কোন রকম সন্দেহ হচ্ছে কি ?

উত্তর—না, **Sir**—আমি 'বিশ্ববন্ধু' কাগজের **Editor**—আমার নাম অসীমচন্দ্র সরকার।

এখানে বলা দরকার যে এই কাগজে রাজদ্রোহমূলক সংবাদ প্রকাশের জন্যে তার **Editor** অসীমচন্দ্র সরকারের নামে **Sedition**-এর মামলা চলছিল সে সময়ে। এই ঘটনার আগের দিন ঐ মামলার একদফা শুনানী হয়ে আবার সাত আট দিন পরে তারিখ পড়েছিল। বেশ নাম-করা উকিল দিয়েই এঁরা মামলা লড়ছিলেন। আমার সঙ্গে কথা বলার কোন প্রয়োজনই এ ভদ্রলোকের ছিল না। তাঁর নিজের তরফ থেকে তাঁর মামলার তদ্বির খুব ভালভাবেই হচ্ছিল। সুতরাং বুঝতে কষ্ট হল না যে ইনি সাংবাদিক হিসেবে আলিপুর থেকে **B. C. Sen**-এর মৃত্যুর খবরটি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই **from the mouth** খবরটি যাচাই করে নিয়ে তাঁর কাগজে ছাপতে চান। আমি আমার মনোভাব প্রকাশ না করে জিজ্ঞাসা করলাম—হ্যাঁ, বলুন—আপনি কি বলতে চান।

উত্তর—আমার কালকে যে মামলাটির দিন ছিল, সেটির তারিখ কবে পড়ল **Sir**, আমি ঠিক বুঝতে পারি নি।

আমি—আপনার মামলার যখন কাল তারিখ পড়ছিল, তখন আপনার উকিলবাবু হাকিমকে জানিয়েছিলেন যে হাকিমের মনোমত

দিনে পরের তারিখ দিলে আপনার নিজের বিশেষ অসুবিধা হবে। আপনি তখন আপনার উকিলের পাশে দাঁড়িয়ে এবং আপনার অনুরোধ রক্ষা করেই হাকিম পরের দিন স্থির করলেন।

উত্তর—না Sir, আমি ঠিক করে জানতে চাই যে আমরা যে দিন suggest করেছিলাম, সেই দিনই হাকিম শেষ পর্যন্ত দিলেন কিনা। তখন তাড়াতাড়িতে আমি ঠিক বুঝতে পারি নি।

আমি—আপনার নিজের ত তিনজন উকিল আছেন। তাঁদের বাদ দিয়ে আমাকে Telephone-করার বিশেষ কোনও কারণ আছে কি? ব্যাপারটা খুলেই বলুন না। কোন মজার খবর শুনতে পেয়েছেন না কি?

উত্তর—হ্যাঁ Sir, আপনিও তাহলে শুনেছেন দেখছি। জানেনই ত আমাদের Evening paper.

আমি—তাই বুঝি সবার আগে খবরটি ছাপাবার জন্যে নিজে থেকে verify করে নিতে চাইছিলেন?

উত্তর—না r, আপনি ত সবই বুঝতে পেরেছেন। এতবড় একটা সাংঘাতিক খবর—একদিকে সবার আগে publish করতে পারাটাও যেমন important, তেমনই খালি Reporter-এর ওপর নির্ভর না করে নিজেই সেটাকে verify করে নেওয়াটা তার চেয়ে অনেক বেশী প্রয়োজন। আমার অপরাধ হয়েছে Sir, আমায় মাফ করবেন।

আমি—আমার কাছে মাফ চাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই, অসীম বাবু, কারণ অপরাধ মোটেই আপনি করেন নি। সাংবাদিক হিসেবে কোন খবর পেয়ে সেটা verify করে নেওয়া ত আপনার কর্তব্য। কিন্তু তবু বলি—I am so sorry to disappoint you and your paper; ব্যাপারটা নিতান্তই tragedy না হয়ে একটা Comedy Errors হয়ে দাঁড়াল। আপনি যদি publish করবার জন্যে আমার photograph চান, তাহলে আপনার একজন staff-photographer পাঠিয়ে দিন, আমি তাঁকে sitting দিতে প্রস্তুত আছি খনও যথেষ্ট বেলা আছে।

উত্তর—না Sir, আর লজ্জা দেবেন না। নমস্কার।

আমি 'নমস্কার' বলে Telephone ছেড়ে দিলাম। একটু পরে বাড়ীতে Telephone করে জানতে পারলাম যে বাস্তবিকই আলিপুর-কোর্ট থেকে আমার বাড়ীতে phone করা হয়েছিল এবং আমার বাড়ী থেকে তাঁদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে সেরকম কোনও ব্যাপার হলে সকলের আগেই আমার আফিস থেকে বাড়ীতে খবর দিত।

সেদিন সন্ধ্যার পর আমার একটু বাইরে যাবার দরকার ছিল। গাড়ীতে উঠতে যাচ্ছি, দেখি আমার এক প্রতিবেশী ও বন্ধু আমার গাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে আমার Driver-এর সঙ্গে কি কথা বলছেন। তিনি আজ বেঁচে নেই—তিনি আলিপুরের উকিল ছিলেন। সেদিন তাঁকে দিনের বেলা ব্যারাকপুর যেতে হয়েছিল। সাড়ে পাঁচটার পর আলিপুরে ফিরে এসে এই গল্পটি শোনেন। সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরেই পাড়ায় এসম্বন্ধে খোঁজ খবর নেন। সঠিক কিছুই জানতে না পেরে নিজেই আমার বাড়ীতে আসছিলেন—দোরের সামনে Driver-এর সঙ্গে দেখা। আমাকে দেখেই এগিয়ে এলেন। আমি বললাম—কি হে, অসময়ে যে? তিনি বললেন—বিনোদ-দা, বড়ই একটা দুঃসংবাদ শুনে বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করতে করতে আপনার এখানে খবর নিতে এসেছি। যেরকম vivid description আমাদের কোর্টে শুনে এলাম, তাতে আপনি যে নিজে এসে গাড়ীতে উঠবেন, এটা কল্পনাও করতে পারি নি। আমি হাসতে হাসতে বললাম—একটু চিমটি কেটে কি খোঁচা মেরে দেখত রক্ত বেরোয় কিনা—না একেবারে ভূতের সঙ্গেই কথা কইছ!

এপর্যন্ত যে ঘটনাগুলি বলা হয়েছে তা থেকে বোঝা যায় না যে পরের বোঝা বয়ে বেড়ান ছাড়া আইন-ব্যবসায়ীদের চরিত্রের আর অন্য কোনও দিক আছে। অবিশ্যি রাজনীতি-ক্ষেত্রে বা দেশের ও দশের হিতকর কাজে আইনজীবীদের অবদান বড় কম নয়। কিন্তু যেসব লোক দিনের পর দিন আদালতে দাঁড়িয়ে আইনের চুল-চেরা বিচার করে নিজেদের বিদ্যা, বুদ্ধি, অধ্যবসায়, জ্ঞান এবং পাণ্ডিত্যের অজস্র প্রমাণ দেন, তাঁরাই আবার অবসর

সময়ে দল বেঁধে যে ভাবে হৈ-হুল্লোড় করে থাকেন তা দেখলে কোন অপরিচিত লোক বুঝতেই পারবেন না যে এঁরাই এত লেখাপড়া শিখেছেন কিম্বা কোন দায়িত্বপূর্ণ কাজ করতে পারেন। এই রকম অবস্থায় কোন বাইরের লোক যদি Bar Library-তে ঢোকেন, তাহলে বইয়ের আলমারীগুলি তাঁর চোখের সামনে থেকে সরিয়ে নিলে তিনি ধরে নেবেন যে তিনি কোন একটা ক্লাব-ঘরে এসে উঠেছেন। এখানে অতি তুচ্ছ খুঁটিনাটির ভেতর থেকেও আনন্দ উপভোগ করবার জন্যে সবাই যেন প্রস্তুত হয়ে রয়েছেন; তা ছাড়া তাঁদের যেন আর কোন কাজ বা উদ্দেশ্য নাই।

আইন-আদালতে Cause of action বলে একটি কথা প্রচলিত আছে। এটি আইনের কথা—যার মোটামুটি মানে মোকদ্দমার দাবীর হেতু বা কারণ বা অজুহাত। আমরা উকিল জাত—নিজেদের মধ্যেও সব সময়েই সতর্ক থাকি, কি জানি কখন কার বিরুদ্ধে কি cause action খুঁজে পাওয়া যায়। কখন যে কি অজুহাতে কার ওপর কি ভাবে দাবী করা যাবে সেটা কেউই জানেন না। তবে এসব ক্ষেত্রে যাঁর ওপর দাবী করা হয়, তিনি প্রায়ই স্বেচ্ছায় স্বচ্ছন্দচিত্তে সে দাবী মেনে নেন। সে দাবী পূরণের জন্যে কোর্টেও যেতে হয় না বা—আমাদের দাবী মানতে হবে, নইলে গদী ছাড়তে হবে—বলে Slogan-ও দিতে হয় না। অধিকাংশ সময়েই—This calls for a celebration—এইটুকু বললেই যথেষ্ট।

এইরকম বিনা অপরাধে cause of action-এর সৃষ্টি করে সেই দাবীকে কাজে পরিণত করার একটি গল্প বলে এই বইটি শেষ করব।

অনেকদিন আগে হাইকোর্টে একটি দেওয়ানী মামলা চলতে চলতে দেখা গেল যে মামলার প্রতিবাদী একখানা জাল দলিল ব্যবহার করেছে। এরকমভাবে জাল দলিল ব্যবহারকরা আইনতঃ দণ্ডনীয় অপরাধ। এই অপরাধের জন্যে প্রথমে হাইকোর্টের নির্দেশমত পুলিশ-কোর্টে ঐ লোকটির বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চলে এবং পরে তা দায়রা-সোপর্দ হয়। High Court Sessions-এ তখন ঐ মামলার বিচার হয়। সে মামলার circumstantial evidence বা পরোক্ষ প্রমাণ থেকে বোঝা যায় যে ঐ প্রতিবাদী আগের দেওয়ানী মামলাতে যখন তার জবাব দাখিল করে সেসময় তার এ্যাটর্নি ও ব্যারিস্টারকে

ঐ জাতীয় কোন দলিল দেখাতে পারে নি। এরকম দলিল তখন হাতে থাকলে প্রতিবাদী তার এ্যাটর্নি ও ব্যারিস্টারকে নিশ্চয়ই তা দেখাত এবং তা দেখালে তার জবাবের বিবৃতিও অন্যরকম হত। অতএব জাল দলিলটি তারও পরে তৈরী। কিন্তু দায়রার বিচারের সময় আসামী জোর-গলায় জুরীকে জানাচ্ছিল যে সে নিজে হাতে করে ঐ দলিলখানা তার এ্যাটর্নি ও কৌঁসুলী-সাহেবকে দেখিয়েছিল। তার এ্যাটর্নি ছিলেন—Mr. B. K. Sen (৺বিজনকুমার সেন) এবং কৌঁসুলী ছিলেন—সুপ্রীম কোর্টের এ্যাড্‌ভোকেট বিখ্যাত দেশ-নেতা Mr. N. C. Chatterjee। আসামী বারংবার একথা বলাতে জজসাহেবের হুকুম হল যে শ্রী বি. কে. সেন এবং শ্রী এন. সি. চ্যাটার্জির সাক্ষ্য নেওয়া হবে। আদালতের ইচ্ছা তাঁদের জানান হলে তাঁরা দুজনাই সাক্ষ্য দিতে এলেন।

প্রতিবাদীর জবাব মুসাবিদা করবার জন্যে প্রথম যখন শ্রী এন. সি. চ্যাটার্জির কাছে কাগজপত্র পাঠান হয়, তখন যে যে কাগজপত্র দেওয়া হয়েছিল তার একটি তালিকা শ্রী চ্যাটার্জির Brief-এর সঙ্গেই ছিল। সে সব দেখে শ্রী বি. কে. সেন প্রমাণ করলেন যে ঐ দলিল তাঁদের হাতে আসে নি এবং আসামীর উক্তি মিথ্যা। শ্রী এন. সি. চ্যাটার্জিও সেই কথাই সমর্থন করে সাক্ষ্য দিলেন। আসামীর জেল হয়ে গেল।

হাইকোর্টের নিয়ম অনুসারে আইন-ব্যবসায়ী, ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, প্রভৃতি পেশাদার লোক সাক্ষ্য দিতে এলে তাঁদের প্রত্যেকের সাফল্য ও বিচক্ষণতা অনুসারে বিশেষ বিশেষ হারে 'Fee' দেবার ব্যবস্থা আছে। ঐ মামলায় সরকারী তরফে ও আসামী-তরফে এ্যাটর্নি ও কৌঁসুলী মিলে আমরা ৬।৭ জন ছিলাম। আমরা সকলে মিলে চাটুজ্যে মশাইকে সাক্ষ্য দেওয়ার Fee-র জন্যে এক Bill দাখিল করতে অনুরোধ করলাম। তিনি প্রথমে সাক্ষ্য দিয়ে Fee দাবী করতে রাজী হন নি। পরে একরকম জোর করেই তাঁকে দিয়ে Bill সই করান হল। তাঁর মুহুরী যখন টাকাটা নিয়ে এল, তখন মুহুরীর হাত থেকেই টাকাটা কেড়ে নিয়ে চাটুজ্যে মশাইকে বলা হল যে এইরকম সাক্ষ্য দিয়ে সরকার থেকে Fee আদায় করাটাই একটা বিশেষ "cause of action" এবং এই টাকাতে তাঁর কোন অধিকার বা দাবী নেই; ঐ মামলায় উভয়-পক্ষের আমাদের ৬।৭ জন সৎ-ব্রাহ্মণকে 'Firpo' নামক হোটেলে ভূরি-ভোজন করান ছাড়া অপর কোন প্রকারেই ঐ

টাকা খরচ করা যেতে পারে না। তৎক্ষণাৎ দিন-স্থির হয়ে গেল এবং আরও গুটিকতক ভোজন-বিলাসী আমাদের দলে ভিড়ে গেলেন। সবশুদ্ধ ১৪।১৫ জন মিলে চাটুজ্যে মশাইয়ের ঘাড়-ভাঙ্গা গেল। বলা বাহুল্য যে সেই সাক্ষ্য দেওয়ার Fee-র টাকা ছাড়াও চাটুজ্যে মশাইকে বেশ কিছু খরচ করতে হয়েছিল।

কথায় আছে—"নৃত্যন্তি ভোজনে বিপ্রাঃ।" আমাদের দলের মধ্যে বিপ্রের সংখ্যা কম ছিল—তবে চাটুজ্যে মশাই যে নিজে "বিপ্র" ছিলেন সে বিষয়ে ত কোন সন্দেহ নাই। এই ভোজন-ব্যাপারটিতে তিনি নৃত্য করেছিলেন কিনা সে বিষয়ে আমার নিজেরই বিশেষ সন্দেহ আছে। এ বিষয়ে চাটুজ্যে মশাইয়ের যদি কোন দোষ বা ত্রুটি হয়ে থাকে, সেটা আমরা 'অ-বিপ্রের' দলে যে কজন ছিলাম, "হৈ-হুল্লোড়" নামক নৃত্য করে সে ত্রুটি সেরে নিয়েছিলাম।

আমরা হচ্ছি ভারতবাসী। মায়ের পেট থেকে পড়েই বেদ-উপনিষদের কথা আমরা শুনে থাকি। বেদ-উপনিষদ্ আমাদের মুখে মুখে—এই হল আমাদের আর্য ভারতের কৃষ্টি এবং সংস্কার। যাঁরা বিদেশী, কিম্বা অনার্য, কিম্বা মুখ্যু, তাঁদের এসব জিনিষ শিখতে হলে অনেক পড়াশুনো করতে হয়। পণ্ডিতই হোন বা মুখ্যুই হোন, আর্যই হোন বা অনার্যই হোন, সকলেই জানেন যে বেদে "ব্রাহ্মণ" আর "সূক্ত"-র ছড়াছড়ি। খাদক এবং খাদ্য ছাড়া ঐ দুটির মধ্যে আর কি সম্পর্ক থাকতে পারে? ঐ দুটিকে পাশাপাশি রেখে যেন বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে বেদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে—ভোজন অর্থাৎ খাওয়া। আরও বোঝা যাচ্ছে যে বেদে যে অগ্নির কথা উল্লেখ আছে সেটি 'বৃক' অর্থাৎ জীব-দেহের জঠরাগ্নি ছাড়া আর কিছুই নয়। এ মতের সমর্থনে আমি নীচের প্রমাণটি দিচ্ছি:

সকলেই জানেন যে সূর্যদেব বার মাসে বারটি ভিন্ন ভিন্ন রাশিতে থাকেন। শীতের সময় অত্যন্ত হীনবল হয়ে পড়েন, তারপর শীত কেটে গেলে ফাল্গুন মাসে কুম্ভ-রাশিতে গিয়ে কলসী কলসী জল খান। কিন্তু শুধু জল খেলেই ত আর শরীর সারে না। সেকারণ চৈত্র মাসে মীন-রাশিতে গিয়ে মীন অর্থাৎ মাছ খেয়ে থাকেন। সবাই জানেন যে মাছ-মাংস খাওয়া বিশেষ